চরিত-চিত্র

বিপিনচন্দ্র পাল

যুগযাত্রী

চরিত-চিত্র

চরিত-চিত্রগুলি
বিভিন্ন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল
এগুলির কোনোটি মনীষী
বিপিনচন্দ্র পালের ইংরেজীতে লেখা
Character Sketches-এর
অনুবাদ নয়; তাঁহার নিজেরই লেখা

ব্রাহ্মসমাজ ও রাজা রামমোহন

ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা

ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ প্রতি বৎসর মাঘোৎসবের সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হ্রাস হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, লোকে শাস্ত্রবাদী ও গুরুবাদী হইয়া পড়িতেছে বলিয়া ব্রাহ্মমত গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। কেহ বা বলেন, বৈদান্তিক বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবী ভাবুকতা আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ রোধ করিয়া বসিয়াছে। সকলেই ভাবিতেছেন, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির অন্তরায় ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের ভিতরে নয়, বাহিরে। কিন্তু শাস্ত্রবাদ বা গুরুবাদ এদেশে নূতন নহে। বৈদান্তিক বৈরাগ্য বা বৈষ্ণবী ভাবুকতাও আজিকার বস্তু নয়। ব্রাহ্মসমাজের জন্মের পূর্ব্বেও এসকল এদেশে ছিল। যখন শিক্ষিত সমাজের উপরে ব্রাহ্মসমাজের অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব ছিল, তখনও এদেশ হইতে এসকল নির্ব্বাসিত হয় নাই। তবে সে সময়ে নব্যশিক্ষিত সমাজে এই শাস্ত্রবাদ বা গুরুবাদ, এই বৈরাগ্যের বা ভক্তির আদর্শের কোন প্রভাব ছিল না; আজ সে প্রভাব যদি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তারই বা কারণ কি? ব্রাহ্ম-সমাজ এখন যেমন তখনও সেইরূপই এগুলিকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন; এখন যেমন তখনও সেইরূপ এগুলির ভ্রান্তি দেখাইয়াছিলেন। তখন লোকে ব্রাহ্মসমাজের কথা শুনিত; ব্রাহ্মসমাজের মতবাদকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল; আজই বা তাহা করে না কেন? তখন এবং এখনের মাঝখানে অবশ্যই এমন কোন না কোন কিছু ঘটিয়াছে, —এমন কোন না কোন প্রশ্ন উঠিয়াছে যার সন্তোষকর উত্তর এখনও ব্রাহ্মসমাজ দিয়া উঠিতে পারেন নাই; এমন কোন নূতন

অভাব জন্মিয়াছে যাহা ব্রাহ্মসমাজ পূরণ করিতে পারিতেছেন না। এ যদি না হইবে, তাহা হইলে যে শিক্ষিত সমাজের চিন্তার ও আদর্শের উপরে একদিন ব্রাহ্মসমাজের অমন অনন্ত-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব ছিল, সেই শিক্ষিত সমাজের লোকে আজ শাস্ত্রবাদী ও গুরুবাদী, বৈদান্তিক মতের বা বৈষ্ণব আদর্শের অমন অনুরাগী হইয়া উঠিবে কেন?

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতে হইলে যে ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইত, আজ ত তাহা হয় না। তখন হিন্দু সমাজের যে শাসন ছিল, আজ তাহা নাই। তখন সমাজ-চ্যুতির যে অর্থ ও যে বিভীষিকা ছিল, আজ তার কিছুই নাই। একদিন ব্রাহ্ম হইলে লোকের ধোপা-নাপিত বন্ধ হইত; আজ ব্রাহ্মগণের ঘরে ঘরে ব্রাহ্মণ পাচক দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং প্রাচীন সমাজ হইতে তাড়িত হইবার যে ভয় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ছিল, আজ তার কিছুই নাই। সমাজের শাসন-ভয়ে লোকে ব্রাহ্ম হয় না, এখন আর একথা বলা চলে না। শাস্ত্র না মানিলে বা গুরু গ্রহণ না করিলে, কেহ হিন্দুসমাজে নিন্দনীয় হয় না। সন্ন্যাসী-বৈরাগীর বা বৈষ্ণবের সম্মানই যে সমাজে হঠাৎ বাড়িয়া পড়িয়াছে, তাহাও ত নয়। তথাপি লোকে এখন কেন শাস্ত্রবাদ, গুরুবাদ, বৈদান্তিক বৈরাগ্যের বা বৈষ্ণবী ভাবুকতার প্রতি অমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে বা পড়িতেছে, ইহা কি ধীরভাবে ভাবিবার কথা নয়? নব্যশিক্ষিত সমাজ হইতে যাহা একদিন চলিয়া গিয়াছিল, আজ আবার তাহা ফিরিয়া আসিয়াছে বা আসিতেছে কেন? দণ্ডের বিভীষিকা বা পুরস্কারের প্রলোভন, দু'এর কিছুরই ত প্রভাব এখানে খুঁজিয়া পাই না। তবে এ প্রত্যাবর্ত্তন হইল কেন? অন্ধ-বিশ্বাসী বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন, স্বার্থপর বা ভাবুক বলিয়া বিরোধীদলকে গালি-গালাজ করিলেই এ প্রত্যাবর্ত্তনের নিদান নির্ণয় হইবে না। নিজের দোষ না দেখিয়া, পরের ঘাড়ে এ দায় চাপাইলে ক্ষণিক আত্ম-

প্রসাদ লাভ হইতে পারে, কিন্তু রোগের প্রতীকার হইবে না। এসম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজ নিজের দায়িত্ব কতটা, ইহা আগে ধীর-চিত্তে নিরপেক্ষভাবে, আত্মপরীক্ষার দ্বারা ঠিক করুন। তার পরে দেশের লোকের ত্রুটিদুর্ব্বলতা কোথায়, কতটুকু, তাহার বিচার সহজে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিপত্তি হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে রামমোহনের প্রতিপত্তি-বৃদ্ধি

রাজা রামমোহনই বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হ্রাস হইলেও, রাজার প্রতি দেশের শিক্ষিত লোকের শ্রদ্ধা দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে, দেখিতে পাই। ফলতঃ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব যখন হইতে কমিতে আরম্ভ করিয়াছে, একরূপ তখন হইতেই আমাদের শিক্ষিত সমাজ রাজাকে আধুনিক ভারতের নবজীবনের ও নবীন সাধনার আদিগুরুরূপে বরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। যে হিন্দু-পুনরুত্থান ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের প্রতিরোধ করিতে দণ্ডায়মান হয়, বলিতে গেলে তাহারই, একরূপ তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই, ও দেশের লোকে, হিন্দু-ব্রাহ্ম-খৃষ্টীয়ান্-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে, সকলে মিলিয়া রাজাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। আর তার পর হইতে প্রতি বৎসরই রাজার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি যেন বাড়িয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কি? অতীতের অপরাধ লোকে ভুলিয়া যায় বলিয়াই যে এরূপ হইতেছে, তাহাও বলিতে পারি না। কিয়ৎপরিমাণে এ কথা সত্য হইলেও, এ ক্ষেত্রে কেবল এই একই কারণে যে দেশে রাজার প্রভাব বাড়িতেছে এমন বলা যায় না। ইহার আরও নিগূঢ় কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। রামমোহনের ব্রহ্মসভাতে আর বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজে অনেক প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে

ভিন্ন

রামমোহনের প্রভাব যে বাড়িতেছে, এই প্রভেদও ইহার একটা কারণ নয় কি ?

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ ও রাজা রামমোহন

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ কেবলই বিরোধ জাগাইয়াছে, কিন্তু সন্ধি ও সমন্বয়ের সূত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। রাজা রামমোহন এক দিকে যেমন বিরোধ বাধাইয়াছিলেন, অন্যদিকে, তারই সঙ্গে সঙ্গে, আবার সেই বিরোধ-ভঞ্জন কোথায় এবং কিরূপে হইবে, তারও পথ দেখাইয়াছিলেন। এই জন্যই আজ লোকে তাঁর সন্ধি ও সমন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তাঁর প্রতিবাদকে হয় সত্য বলিয়া গ্রহণ, কিম্বা সাময়িক ভাবিয়া উপেক্ষা করিতেছে। আধুনিক কালে ভারতবর্ষের পক্ষে যে কাজটি অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য্য ছিল, রামমোহন তাহা করিতে গিয়াছিলেন। তারই জন্য আজ রামমোহনের প্রতিপত্তি এত বেশী।

রামমোহনের সমসাময়িক সমাজের অবস্থা

রাজা রামমোহন হইতে বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের আরম্ভ; আর রাজার সমকালে দেশের চিন্তা ও সাধনার অবস্থা কি ছিল, লোকের তখন কিরূপ মতিগতি, সমাজে তখন কি অভাব জাগিয়াছিল, তারই দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ কোন্ অভীষ্টসাধনের জন্য জন্মগ্রহণ করে, ইহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। রাজার সময়ের কথা সাক্ষাৎভাবে সম্যক্‌রূপে আমরা কিছুই জানি না বলিলেও হয়। তবে রাজার নিজের পুস্তকাদি হইতেই সেকালের অবস্থার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। রাজার পুস্তকাদি পড়িয়া মনে হয় যে সে-সময়ে আমাদের হিন্দুসমাজ ঘোরতর তামস অবস্থায় পড়িয়াছিল। এখন যেমন ইংরাজি-শিক্ষার প্রভাবে লোকের প্রাচীন মত ও সংস্কার

বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে, সে-সময়ে পারসী ও আরবী শিক্ষার প্রভাবে, অতটা পরিমাণে না হইলেও, শিক্ষিত লোকের মন যে স্বল্পবিস্তর সন্দেহাচ্ছন্ন হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। রাজা নিজেই তার সাক্ষী। প্রচলিত হিন্দুদেববাদে রাজার অনাস্থা জন্মে বেদান্ত বা বাইবেল পড়িয়া নহে, কিন্তু পাটনায় পারসী ও আরবী শিখিতে শিখিতে মোতাজেলা প্রভৃতি মোহম্মদীয় যুক্তিবাদী দার্শনিকদিগের গ্রন্থাদি পড়িয়া। রাজার প্রথম প্রচারিত পুস্তক—তোহফাতুলই তার প্রমাণ। পারসী ও আরবী পড়িয়া রাজার মনে যে সকল জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, অপরের মনে বিদ্যাপ্রভাবে যে তাহা জাগে নাই, এরূপ মনে করা অসম্ভব। পারসী ও আরবী শিক্ষার ফলে, তখনকার ইল্‌ম্‌দার লোকের মনে যে নূতন নূতন জিজ্ঞাসার উদয় হইয়াছিল, ইহা স্বচ্ছন্দেই ধরিয়া লইতে পারি। তবে রাজার চিত্তকে এই মোহম্মদীয় যুক্তিবাদ যে পরিমাণে অধিকার করিয়াছিল, অপরের চিত্তকে সেপরিমাণে অধিকার করিতে পারে নাই, ইহাও সত্য। তাঁহারা মনে মনে অতি সন্তর্পণে যেসকল সন্দেহ ও অনাস্থা পোষণ করিয়াছিলেন, রাজা তাহাকেই সর্ব্বসমক্ষে অকুতোভয়ে ব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। যুগ-প্রবর্ত্তক মহাজনেরা সকলেই এরূপ করিয়া থাকেন। তাঁহারা সকলেই জনমণ্ডলীর নিগূঢ় চিন্তা ভাব ও ভাবনাকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া, যাহা অসম্বদ্ধ ছিল তাহাকে সুসম্বদ্ধ করেন, যাহা কেবল আবছায়ার মতন ছিল তাহাকে সর্ব্বাঙ্গে প্রকট করিয়া তুলেন, যাহা অন্তঃসলিলার মতন ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত ছিল তাহার জন্য প্রত্যক্ষ খাদ কাটিয়া দেন। লোকের মনে যাহা ছিল না, মহাপুরুষদের মনে তাহা শূন্য হইতে আসিয়া গজাইয়া উঠে না। ইহারাও নিজ নিজ কাল-শক্তিকেই আশ্রয় করিয়া জগতে নব নব মত ও সিদ্ধান্ত, সাধন ও আদর্শের প্রচার করেন। বৈদিক যাগযজ্ঞাদি সম্বন্ধে প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তে

লোকের মনে যে সকল ভাব বিন্দু বিন্দু করিয়া ফুটিতেছিল, তাহাই যেন একীভূত ও ঘনীভূত হইয়া বুদ্ধদেবের মধ্যে মূর্ত্তিমান হইয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতে ইহুদায়, গ্রীসে ও রোমে খৃষ্টশতাব্দীর প্রারম্ভে ও অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল ভাব লোকের মনে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাকেই কেন্দ্রীভূত ও প্রত্যক্ষ করিয়া যীশুখৃষ্টের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয়। অধুনাতন কালে আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে বহু-লোকের অন্তরে যে বৈষ্ণবী ভাব অতি মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাকে ঘনীভূত করিয়াই মহাপ্রভুর অবতার হয়। দেশে যাহা প্রস্ফুট নাই মহাপুরুষদিগের মধ্যে তাহা প্রস্ফুট, দেশে যাহা মূক মহাপুরুষদিগের মধ্যে তাহা মুখর, দেশে যাহা নিরাকার ও অমূর্ত্ত ভাবরূপে বিদ্যমান থাকে মহাপুরুষগণের মধ্যে তাহাই সাকার ও মূর্ত্তিমান হয়।

রাজা রামমোহনের সময়ে এবং তাঁর জন্মের পূর্ব্ব হইতেই দেশে একটা নূতন জিজ্ঞাসা যে জাগিয়াছিল, রাজার নিজের জীবন ও প্রচারই তার সাক্ষী। আর এই জিজ্ঞাসার আশ্রয়েই রাজার তত্ত্বা-ন্বেষণের সূচনা ও ক্রমে তাঁর ধর্ম্মপ্রচারের প্রতিষ্ঠা হয়। রাজার পুস্তকাদি পড়িয়া বেশ বুঝা যায় যে সে-সময়ে লোকের মনে পুরাতন কিম্বদন্তী ও প্রচলিত ক্রিয়াকর্ম্মের প্রতি স্বল্পবিস্তর অনাস্থা জন্মিয়া-ছিল। কিন্তু এই অনাস্থাতে তখনও লোকের ধর্ম্মসাধনে বহিরঙ্গের ক্রিয়াকলাপাদিতে কোন বিশেষ পার্থক্য জন্মাইতে পারে নাই। এদেশে বহুকাল হইতেই ধর্ম্মের দুইটা দিক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একটা সামাজিক, একটা ব্যক্তিগত; একটা বাহিরের আচার-আচরণের দিক, আর একটা ভিতরের সাধনভজনের দিক। বাহিরে যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের অনুসরণ ও আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিতেন, ভিতরে তাঁহারাও অনেকে প্রকৃতপক্ষে বৈদান্তিক সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া, নির্গুণ ব্রহ্মেরই সাধনা করিতেন। বহুতর তান্ত্রিক সাধকেরা এইরূপে

বাহিরের প্রতীকোপাসনাতেও যোগদান করিতেন, আবার ভিতরে, নিজেদের অন্তরঙ্গ সাধনেতে "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা" মন্ত্রের সাধন এবং "সচ্চিদেকং ব্রহ্ম" "সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম" প্রভৃতি নামও জপ করিতেন। কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক সাধুমহান্ত ব্যতীত, আর কেহই প্রায় এই অন্তরঙ্গ সাধনের মর্ম্ম ও মাহাত্ম্য ভাল করিয়া বুঝিতেন না; যন্ত্রারূঢ়ের মতন এসকল নামজপাদি করিতেন মাত্র। এই সকল কারণে ধর্ম্ম প্রাণহীন, কর্ম্ম অর্থহীন, আচার শ্রদ্ধাহীন ও সিদ্ধান্ত বিচারহীন হইয়া পড়িয়াছিল। সংসার পরমার্থশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। পণ্ডিতেরা শাস্ত্রের দোহাই দিতেন, কিন্তু শাস্ত্র জানিতেন না। সাধারণ লোকে গড্ডলিকা-প্রবাহের মতন তাঁহাদের অনুশাসন মানিয়া চলিত, কিন্তু কোন কিছুরই অর্থ বুঝিত না। লোকের অন্তর্দৃষ্টি ও অতীন্দ্রিয়ানুভূতির পথ বাহ্যক্রিয়াকলাপাদির বাহুল্যে একেবারে বন্ধ হইয়াছিল। রাজার পুস্তকাদি পড়িয়া আমরা সে-কালের সমাজের এই চিত্রই প্রাপ্ত হই। আর এই ঘোরতর তামসিকতা ইহসর্ব্বস্বতা অজ্ঞানতা ও নির্জীবতা হইতে দেশের লোককে উদ্ধার করিবার জন্যই রাজা একদিকে প্রাচীন শাস্ত্রের প্রচার, অন্যদিকে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ লইয়া প্রতিপক্ষীয়দিগের সঙ্গে বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং ক্রমে বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের বীজ-স্বরূপ ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক নহেন, ধর্ম্মব্যাখ্যাতা মাত্র

রাজাকে যীশু বা মোহাম্মদ, বুদ্ধদেব বা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মতন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকরূপে দেখিলে চলিবে না। রাজা কোন নূতন সাধন প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন নাই। রাজা নিজে তান্ত্রিক সাধক ছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তান্ত্রিক সাধনের মূল ব্রহ্ম-জ্ঞান। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রাদিতে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসকল তন্ত্র অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধান্তের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। আমাদের বাঙ্গালা দেশে যাঁহারা এপর্য্যন্ত তান্ত্রিক সাধনে কোন প্রকারের উৎকর্ষ বা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে অদ্বৈত-ব্রহ্মাত্মবুদ্ধিকেই চরম মুক্তি বলিয়া গিয়াছেন। রাজার নিজের সাধন এই তান্ত্রিক ব্রহ্মজ্ঞানেরই সাধন ছিল। তাঁর পুস্তকাদি পড়িয়া ও তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কিম্বদন্তীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তই করিতে হয়। আর যেমন সাধন-বিষয়ে রাজা কোন নূতন পন্থার আবিষ্কার বা প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তত্ত্বসিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও সেইরূপ কোন একান্ত নূতন মত প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। এইজন্যই রাজাকে একটা নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, করিলে তাঁর কার্য্যের সত্যতা ও গুরুত্ব উভয়ই নষ্ট করা হয়।

কিন্তু রাজা নূতন সাধন বা সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া একটা নূতন ধর্ম্ম প্রবর্তন না করিলেও, তিনি যে কাজটি করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার গুরুত্ব বা মর্য্যাদা সামান্য নহে। রাজা ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক নহেন, কিন্তু ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাতা। তিনি নূতনের প্রতিষ্ঠা করেন নাই কিন্তু পুরাতনের সময়োপযোগী সংস্কার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋষি ও মনীষিগণ যেমন নিজ নিজ যুগসম্মত ব্যাখ্যার দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, রাজাও তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেই কাজই করিয়াছেন। সনাতন ধর্ম্মের খাত বহুবিধ সংস্কারে ভরিয়া উঠিয়াছিল, বহুবিধ কল্পনাজালে সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। রাজা সেই খাতের পঙ্কোদ্ধার করিয়া তাহাকে গভীর ও প্রশস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক ধর্ম্মের বিকাশ-প্রণালী ও হিন্দুধর্ম্মের গতিশীলতা

এইভাবে প্রাচীন শাস্ত্রাদির নূতন নূতন ব্যাখ্যার সাহায্যে সর্ব্বত্রই

প্রাচীন ঐতিহাসিক ধর্ম্মসকল আপন আপন বৈশিষ্ট্য ও ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, যুগে যুগে তৎ তৎ যুগের যুগসমস্থার মীমাংসা ও নব নব যুগপ্রয়োজন সাধন করিতে সক্ষম হয়। এইরূপ ভাবে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সমন্বয় ও সঙ্গতি না হইলে জগতের কোন প্রাচীন ধর্ম্ম আজ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিতে পারিত না। ফলতঃ আমরা স্থূলদৃষ্টিতে এসকল প্রাচীন ধর্ম্মকে যতটা স্থবির মনে করি, তাহার কোনটিই ততটা স্থবির নহে। আমরা বৈদিক ধর্ম্মকেই আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্মের মূল মনে করিয়া থাকি; কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ঋগ্বেদের ধর্ম্মের আর আজিকার হিন্দুধর্ম্মে যে আকাশ-পাতাল-প্রভেদ তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। বেদের পরে উপনিষদ। এই উপনিষদের ধর্ম্মই কি আজিকার হিন্দুধর্ম্ম? উপনিষদের পরে পুরাণ। প্রাচীন পুরাণের ধর্ম্মই কি আজ অক্ষুণ্ণ আছে? যে মনুস্মৃতির দোহাই দেই, সেই স্মৃতিও ত সকল বিষয়ে আজ আর চলে না। অথচ সকলেই বেদ স্মৃতি সদাচারকে ধর্ম্মের প্রামাণ্য বলিয়া প্রচার করেন। ইহার অর্থ এই নয় কি যে, বেদের অর্থ আজ আমরা আর সাক্ষাৎভাবে বেদের শব্দেতে অন্বেষণ করি না, বেদের আধুনিক ভাষ্যেই তাহা খুঁজিয়া থাকি। এই বেদভাষ্যেও বেদের সকল মর্ম্ম প্রকাশিত হয় নাই। উপনিষদে, উপনিষদের ভাষ্যে; মহাভারতে ও ভাগবদ্গীতাতে; মনু প্রভৃতি প্রাচীন স্মৃতি ও এই সকল প্রাচীন স্মৃতির আধুনিক ব্যাখ্যাতেই আমরা এখন বৈদিকধর্ম্মের মর্ম্ম অন্বেষণ করিয়া থাকি। এই বৈদিকধর্ম্ম একান্ত স্থবির ও অপরিবর্ত্তিত থাকিলে, আজিও আমরা ইন্দ্রবরুণাদিরই পূজা করিতাম। আজিও যজ্ঞধূমে দেশ ছাইয়া থাকিত। আজিও নিয়োগাদি হীন-আচার সমাজে প্রচলিত থাকিত। উপনয়নাদি শ্রেষ্ঠতর সংস্কারও রঘুনন্দন-উদ্ধৃত বৃহন্নারদীয় পুরাণের নজীরে ত্রিরাত্রের ব্রহ্মচর্য্যের অভিনয়ে আসিয়া

শেষ হইত না এবং কেবলমাত্র বারকয়েক গায়ত্রীমন্ত্র আবৃত্তি করিয়া, অষ্টমবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমার সমাবর্ত্তনপূর্ব্বক বিবাহের যোগ্যতা লাভ করিতে পারিত না। ফলতঃ শাস্ত্রানুগত্য ধর্ম্মের গতিকে কোথাও রোধ করে নাই বা করিতে পারে নাই, কেবল যোগ্যাযোগ্যনির্ব্বিশেষে প্রকৃত-পুঞ্জের প্রাকৃত বুদ্ধির অরাজকতা হইতেই ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মনীতিকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মকে আমরা স্থূলদৃষ্টিতে যতই গতানুগতিক কিম্বা স্থবির মনে করি না কেন, শাস্ত্রগুরু মানিয়াও এই ধর্ম্ম বৈদিক সময় হইতে আমাদের বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত হাজার হাজার যুগ ধরিয়া যে একই আকারে ছিল, তাহা নহে। যুগে যুগে ইহার বহুতর পরিবর্ত্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন ঘটিয়াছে। প্রত্যেক সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষ আপনাপন প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাহায্যে ইহার নূতন নূতন অর্থ করিয়াছেন, নব নব পন্থার আবিষ্কার করিয়াছেন, অনেক অনুপযোগী প্রাচীন মতবাদ ও সাধন ও সংস্কারাদি বর্জ্জন করিয়াছেন, অপর ধর্ম্মের নিকট হইতেও বহুতর নূতন সিদ্ধান্ত ও সাধন গ্রহণ করিয়া এই প্রাচীন ধর্ম্মের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। প্রথমে যাহা একজন সাধক বা সিদ্ধ মহাপুরুষ নিজের অপরোক্ষ অনুভূতিতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ক্রমে তাহা দশজনে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার আবার নূতন শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। এই সকল নূতন শাস্ত্র কালে সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়া প্রাচীনের ন্যায় প্রামাণ্য-মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। এইরূপে শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি বহুতর সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্ত সাধারণ হিন্দুশাস্ত্রের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। এসকল দেখিয়া শুনিয়া হিন্দুধর্ম্মকে স্থবির বলা যায় কি ?

খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মে গতিশীলতা

কেবল হিন্দুধর্ম্ম নহে, জগতের কোন প্রাচীন ধর্ম্মই বস্তুতঃ

স্থবির ও গতিহীন হইয়া পড়িয়া নাই। খৃষ্টীয়ানেরা বাইবেলকে অতি-প্রাকৃত ও অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া মানেন ও যীশুখৃষ্টকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার-জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রথম খৃষ্টশতাব্দীতে এই বাইবেলের প্রতিষ্ঠাই হয় নাই; যাহাকে পুরাতন ধর্ম্মপুস্তক বলে, তাহা যীশুর জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই ইহুদা-সমাজে আপ্তবাক্যরূপে গৃহীত হবলেও, তখন পর্য্যন্ত খৃষ্টীয়ানেরা তাহাকে নিজের করিয়া লয়েন নাই। তারপরে যখন বর্ত্তমান বাইবেল গড়িয়া উঠিল, তখন হইতেই কি খৃষ্টধর্ম্ম একভাবে পড়িয়া আছে? এই বাইবেলের উপরেই খৃষ্টীয়ান সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষেরা আপনাপন প্রত্যক্ষ সাধনাভিজ্ঞতার দ্বারা নূতন নূতন মতবাদ এবং সাধন-পন্থার প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিজ নিজ অভিমত-অনুযায়ী বাইবেলের অর্থ করিয়া, খৃষ্টীয়ান-ধর্ম্মে কত কত সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে। আর এসকল কি খৃষ্টধর্ম্মের একান্ত স্থবিরতার পরিচয় দিয়া থাকে? অন্যদিকে সকল খৃষ্টীয়ানই যীশুখৃষ্টকে আপনার একমাত্র উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করেন। কিন্তু সকলের প্রাণগত সাধনের যীশু কি একই বস্তু? প্রাচীনকালে এলেক্‌জেণ্ড্রিয়ায় যে যীশুতত্ত্বের প্রচার হইয়াছিল, রোমের যীশুতত্ত্ব কি ঠিক তাহাই? আর তার পরে এই সতের-আঠার শত বৎসর ধরিয়া খৃষ্টীয়ান সাধকদিগের ভিতরকার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিতে যে যীশু বাড়িয়া উঠিয়াছেন, তিনি কি প্রথম খৃষ্টশতাব্দীর সাধকদিগের যীশু? যীশু নাম রহিয়াছে, যীশুর ইতিহাস এবং কিম্বদন্তীও এই আঠার-উনিশ-শত বৎসরকাল প্রায় একই রহিয়াছে। কিন্তু যুগে যুগে খৃষ্টীয়ান সাধকদিগের ভিতরে এক এক নূতন যীশু-মূর্ত্তি ও যীশু-প্রকৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছে ও উঠিতেছে। একথা কি অস্বীকার করা যায়? আর এসকল বিচার করিলে খৃষ্টধর্ম্মকে কি একান্ত পরিবর্ত্তনবিমুখ ও স্থবির বলা যাইতে পারে?

সূক্ষ্ম বিচারে জগতের কোন প্রাচীন ধর্ম্মকেই স্থবির বলিয়া প্রমাণ করা সম্ভব নব। এসকল ধর্ম্মের নাম একই আছে। কিন্তু রূপ বদলাইয়া গিয়াছে ও প্রতিদিনই বদলাইয়া যাইতেছে। শব্দ ঠিক তাহাই আছে। কিন্তু শব্দার্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। আর এইভাবেই ধর্ম্মের নিত্যত্বের সঙ্গে তার অবশ্য-প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনাদির সঙ্গতি রক্ষা পাইয়াছে। সাধকেরা ও সিদ্ধ মহাপুরুষেরা বা যুগ-প্রবর্ত্তক মনীষী ও চিন্তানায়কগণ যুগে যুগে প্রাচীন শাস্ত্র ও সংস্কারাদির নব নব ব্যাখ্যা এবং পুরাতন শব্দে নূতন মর্ম্ম ও পুরাতন কর্ম্মে নূতন উদ্দেশ্য সন্নিবিষ্ট করিয়া একই সঙ্গে ধর্ম্মধারাকে অপ্রতিহত রাখিয়া ধর্ম্মের বিকাশকে পরিচালিত করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় আধুনিক ভারতে ঠিক এই কাজটিই করিয়াছিলেন। তিনি নূতন সিদ্ধান্তের বা সাধনের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, কিন্তু পুরাতন সিদ্ধান্ত ও সাধনকেই বর্ত্তমানের উপযোগী করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইজন্যই তিনি হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র, হিন্দুধর্ম্মের বা অন্য কোন ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একটা নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের সনাতন সার্ব্বভৌমিকতাকে আকারিত করিয়াই যেন সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের, সকল মতবাদীর ও সকল সাধনাবলম্বীর একটা সাধারণ সম্মেলন-ভূমিরূপে ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

রামমোহনের কর্ম্মের মূল লক্ষ্য ও প্রকৃতি

ইংরেজি ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে এই ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ইহার পূর্ব্ব হইতেই রাজা বেদান্ত ও উপনিষয়াদির মূল ও অনুবাদ প্রচার করিয়া এই ব্রহ্মসভার জমি প্রস্তুত করিতেছিলেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর "বেদান্তগ্রন্থ" প্রচারিত হয়। আর এই বৎসর হইতে ১৮২৭-২৮

পর্য্যন্ত রাজা যে সকল শাস্ত্র প্রচার করেন, তাহার দ্বারাই তাঁর কার্য্যের লক্ষ্য ও মূল প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই সকল প্রচার কার্য্যের দ্বারাই ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠাতে তিনি কোন্ লক্ষ্য লাভ করিবার আশা করিয়াছিলেন তার নিদর্শন প্রাপ্ত হই। আর এখানে প্রশ্ন উঠে—(১) রাজা পুরাতন শাস্ত্র প্রচার করিতে গেলেন কেন? জগতে যাঁহারা এ পর্য্যন্ত কোন নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ত এরূপভাবে প্রাচীন শাস্ত্রের প্রচার করেন নাই। তাঁহারা নিজেদের আদেশ ও উপদেশই প্রচার করিয়াছেন, কখনও বা প্রাচীন প্রবক্তাদের মতামতের উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার করিতে যান নাই। রাজা জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে মন্‌কিউর ডি কনওয়ে সাহেবের মতন আপনার মনোমত শ্লোকাদি সংগ্রহ করিয়া একটা Sacred Anthology, কিম্বা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মতন উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়া একটা নূতন ব্রাহ্মধর্ম্ম, কিম্বা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মত একখানা নূতন শ্লোকসংগ্রহ প্রচার না করিয়া, গোটা বেদান্ত ও উপনিষদাদি প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রের প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? (২) রাজা হিন্দুশাস্ত্রের আর সকল গ্রন্থ ছাড়িয়া বেদান্ত ও উপনিষদ প্রচার করিতে গেলেন কেন? তিনি নিজে তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তাঁর গুরু তান্ত্রিক মহাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু এ সত্ত্বেও রাজা প্রথমে তন্ত্রের প্রচার ও ব্যাখ্যা না করিয়া বেদান্তের ও উপনিষদের প্রচার ও ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন কেন? আর উপনিষদের মধ্যেও তিনি ছান্দোগ্য, বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, কৌষিতকী প্রভৃতিকে বাদ দিয়া, সকলের আগে কেন, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক এই পাঁচখানির প্রচারে ও অনুবাদে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? কুলার্ণব-তন্ত্রের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম উল্লাসের মূল রাজার গ্রন্থাবলীর মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি এই তন্ত্র কোন্ সময়ে প্রচার করেন, তাহা জানা নাই।

আর যে সময়েই প্রচার করুন না কেন, এই তন্ত্র ব্রহ্মজ্ঞান বা আত্ম-জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়াছে; রাজার প্রকাশিত গ্রন্থে ইহার যে অংশ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতেও বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধনের দ্বারা আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভেরই উপদেশ আছে। এই তন্ত্রের সঙ্গে কেন, কঠ প্রভৃতি উপনিষদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। যে কারণে রাজা বেদান্ত ও কেন, কঠ প্রভৃতি উপনিষদের প্রচারে প্রবৃত্ত হন, সেই কারণেই কুলার্ণব-তন্ত্রের এই অংশেরও প্রচার করেন। প্রশ্ন এই—এই কারণটি কি ?

শাস্ত্রপ্রামাণ্য বিষয়ে রাজার মত ও তাঁহার মীমাংসা-প্রণালী

রাজার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ শাস্ত্রপ্রামাণ্য অস্বীকার করেন। কিন্তু রাজা শাস্ত্র মানিতেন। আর তিনি কেবল বেদকেই একমাত্র প্রামাণ্য শাস্ত্র বলিয়া মানিতেন, এমনও বলা যায় না; পুরাণ তন্ত্র প্রভৃতিকেও প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রতিপক্ষীয়দের সঙ্গে বিচারে তিনি বেদবাক্যের সঙ্গে সঙ্গে পুরাণ তন্ত্রাদি হইতেও প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁর প্রতিপক্ষীয়েরা যে সকল পৌরাণিক প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছিলেন, রাজা কোথাও তাহার মর্য্যাদা অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু আপনি স্বপক্ষীয় বহুবিধ শ্লোক উদ্ধার করিয়া শাস্ত্রের দ্বারাই শাস্ত্রকে খণ্ডন করিয়াছেন। অথবা খণ্ডন করিয়াছেনও বলা সঙ্গত হয় না। এরূপ খণ্ডনের দ্বারা শাস্ত্রের স্ববিরোধিতার প্রতিষ্ঠা হয়। আর যাহার মধ্যে এইরূপ সাংঘাতিক স্ববিরোধিতা আছে, যাহা একবার এক বস্তুকে 'হাঁ' ও আরবার তাহাকেই 'না' বলিয়াছে, এমন শাস্ত্রের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নহে। এই জন্য রাজা প্রতিপক্ষীয়দের শাস্ত্র-প্রামাণের বিরোধী শাস্ত্র-প্রমাণ উপস্থিত করিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই। কিন্তু এই আপাত

বিরোধের মীমাংসা কোথায়, তাহাও সর্ব্বদা দেখাইয়া দিয়াছেন। রাজা যদি কেবল শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা শাস্ত্র-প্রমাণ কাটিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলে তিনি ওকালতি করিয়াছেন, এরূপ মনে করিতে পরিতাম। কারণ ইহাতেই তাঁর নিজের পক্ষ সমর্থিত হইত। আত্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য এদতিরিক্ত কিছু বলা বা স্বীকার বা প্রতিষ্ঠা করা তাঁর পক্ষে আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আত্মমত-প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা সত্য-প্রতিষ্ঠার দিকে তাঁর বেশী দৃষ্টি ছিল। এইজন্যই শাস্ত্রের বিরুদ্ধে শাস্ত্র-প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া, তারই সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র কিরূপে এই বিরোধ ভঞ্জন করিয়াছেন, অধিকারীভেধে, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট সর্ব্ববিধ উপাসনাই প্রচার করিয়াছেন, কোন্ অনুশাসন বা নিম্ন অধিকারীর কোন্টি বা উচ্চতর অধিকারীর জন্য বিহিত হইয়াছে, এই ভাবে রাজা প্রতিপক্ষীদের মত গ্রহণ করিয়াও সর্ব্বদাই তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেন এবং এই পথেই শাস্ত্র-বাক্যের আপাত স্ববিরোধিতা-দোষ খণ্ডন করিতেন। যে শাস্ত্র মানে না, তার পক্ষে এতটা শ্রমস্বীকার স্বাভাবিক নহে। রাজা শাস্ত্র-প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন। আর এইজন্যই শাস্ত্র-প্রচারে এরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রপ্রামাণ্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজা অধিকারীভেদও মানিতেন। অধিকারীভেদে শাস্ত্রানুগত্যের তারতম্য হইয়া থাকে। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে রাজা কহিয়াছেন—

> শাস্ত্রপ্রমাণ যে লিখিয়াছেন তাহার বিবরণ এই, শাস্ত্রে—নানা-প্রকার বিধি আছে, বামাচারের বিধি, বৈষ্ণবাচারের বিধি, অঘোরাচারের এবং তেত্রিশ কোটি দেবতা এবং তাঁহাদিগের প্রতিমা পূজার বিধিতে যে সকল শাস্ত্রের পর্য্যবসান হইয়াছে এমত নহে বরঞ্চ নানাবিধ পশু যেমন গো শৃগাল প্রভৃতি এবং নানাবিধ পক্ষী যেমন শঙ্খচীল নীলকণ্ঠ প্রভৃতি এবং নানাবিধ স্থাবর যেমন অশ্বত্থ বট বিল্ব তুলসি প্রভৃতি যাহা সর্ব্বদা দৃষ্টিগোচরে এবং ব্যবহারে আইসে

তাহাদিগেরও পূজার নিমিত্ত অধিকারীবিশেষে বিধি আছে—যে যাহার অধিকারী সে তাহাই অবলম্বন করে, তথাহি—

অধিকারিবিশেষেণ শাস্ত্রাণ্যুক্তাণ্যশেষতঃ ॥

অতএব শাস্ত্রে প্রতিমা-পূজার বিধি আছে কিন্তু ঐ শাস্ত্রেই কহেন যে, যে সকল অজ্ঞানী ব্যক্তি পরমেশ্বরের উপাসনাতে সমর্থ নহেন, তাঁহাদিগের নিমিত্তে প্রতিমাদি পূজার অধিকার হয়।

রাজার সিদ্ধান্তে শাস্ত্র, বিচার ও স্বানুভূতি

রাজা শাস্ত্র মানিতেন, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণে বিচারের পূর্ণ অধিকার আছে, ইহাও কহিতেন। হিন্দুর শাস্ত্র-বিচারে একথা বলা অনাবশ্যক ছিল। কারণ হিন্দুর শাস্ত্রপ্রামাণ্য অতি প্রাচীনকাল হইতেই মীমাংসার উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর মীমাংসামাত্রেই বিচারের আশ্রয়ে আপনাপন সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। শাস্ত্র, সন্দেহ, বিচার, সঙ্গতি, সমন্বয় এই পাঁচটি সোপানের উপরেই মীমাংসা গড়িয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টীয়ান শাস্ত্রে এরূপভাবে বিচারের মর্য্যাদা প্রকাশ্যভাবে স্থাপিত না হইলেও, তারও মীমাংসা আছে। খৃষ্টীয়ান মীমাংসার নাম Exegetics ও Apologetics; তাহাতেও বিস্তর বিচার আছে। রামমোহন খৃষ্টীয়ান শাস্ত্রের বিচারেও এই মীমাংসার পথই অবলম্বন করিয়াছিলেন। সেখানেও তিনি শাস্ত্রের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া, শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ে স্বানুভূতির বা private judgmentএর দাবী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু বহুতর প্রোটেষ্ট্যাণ্ট্ খৃষ্টীয়ান যেভাবে এই স্বানুভূতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন, রাজা ঠিক সেভাবে করেন নাই। ইহারা শাস্ত্রের উপরে নিজের অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ মনোমত করিয়া শাস্ত্রার্থ নির্ণয় ও গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাহা নিজের নিকট সত্য বা সঙ্গত হইল না,

তাহাকেই বর্জ্জন করিয়া থাকেন। রাজা ঠিক তাহা করেন নাই। রাজা আমাদের প্রাচীন মীমাংসার পথ অবলম্বন করিয়া, একদিকে যেমন শাস্ত্রার্থ-নির্ণয়ে বিচার ও স্বাভিমতের আশ্রয় লইয়াছিলেন, অন্য-দিকে সেইরূপ স্বাভিমতের প্রামাণ্য-নির্ণয়েও তিনি শাস্ত্রের অর্থাৎ প্রাচীনকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যের এবং যুক্তির অর্থাৎ সার্ব্ব-জনীন মনস্তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজার সিদ্ধান্তে শাস্ত্র গুরু এবং স্বাভিমতের একবাক্যতার উপরেই সমুদায় সত্যের ও প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইউরোপীয় যুক্তিবাদীগণের মতন রাজা সত্য-নির্ণয়ে একান্তভাবে স্বাভিমতের উপর নির্ভর করিয়া চলেন নাই। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণ ইহা করিতে যাইয়াই রাজার পথ হইতে সরিয়া পড়েন।

রাজার শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে বেদ ও পুরাণাদির প্রামাণ্য

রাজা আধুনিক আর্য্যসমাজের মতন কেবলমাত্র বেদকেই প্রামাণ্য শাস্ত্র বলিয়াও গ্রহণ করেন নাই; পুরাণ, তন্ত্র, এমন কি ইহুদার ধর্ম্ম-পুস্তক ও খৃষ্টীয়ানের বাইবেল প্রভৃতি অন্যান্য দেশের ও সম্প্রদায়ের শাস্ত্রকে পর্য্যন্ত প্রামাণ্য-মর্য্যাদা দান করিয়াছেন। বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞান-সাধকেরা উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং ভগবদ্গীতাকেই ব্রহ্মজ্ঞানের তিনটি প্রস্থানরূপে সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু শাস্ত্রপ্রামাণ্য হিসাবে রাজা এই প্রস্থানত্রয়কে পুরাণতন্ত্রাদির উপরে স্থাপন করিয়া-ছিলেন কি না, সন্দেহ। মনুর মত আশ্রয় করিয়া রাজা একথা কহিয়াছেন সত্য যে "যে সকল গ্রন্থ বেদবিরুদ্ধ অর্থ কহে তাহা অপ্রমাণ"; কিন্তু ইহা "গ্রন্থের মান্যামান্যের সাধারণ নিয়ম মাত্র।" অন্য পক্ষে হিন্দুদিগের পুরাণতন্ত্রাদিগকে সাক্ষাৎ বেদ না হইলেও "বেদের অঙ্গ" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু—

"ইহাও বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য যে তন্ত্রশাস্ত্রের অন্ত নাই,

সেইরূপ মহাপুরাণ ও পুরাণ ও উপ-পুরাণ এবং রামায়ণাদি গ্রন্থ অতি বিস্তার এ নিমিত্ত শিষ্টপরম্পরা নিয়ম এই যে, যে পুরাণ ও তন্ত্রাদির টীকা আছে ও যে, যে পুরাণাদির বচন মহাজনধৃত হয় তাহারি প্রামাণ্য অন্যথা পুরাণের অথবা তন্ত্রের নাম করিয়া বচন কহিলে প্রামাণ্য হয় এমত নহে। অনেক পুরাণ ও তন্ত্রাদি যাহার টীকা নাই ও সংগ্রহকারের ধৃত নহে তাহা আধুনিক হইবার সম্ভব আছে....অতএব সটীক মহাজনধৃত পুরাণ তন্ত্রাদির বচন মান্য হয়েন।”

আর এইখানেই আমরা রাজা প্রামাণ্য-শাস্ত্র বলিতে কি বুঝিতেন, এবং এই প্রামাণ্যের প্রতিষ্ঠাই বা কোথায়, ইহা অতি পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাই। প্রথমে যে শাস্ত্রের টীকা আছে, রাজা তাহাকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। এখানে তিনি পুরাণ ও তন্ত্রাদির সম্বন্ধেই এই টীকার কথা কহিতেছেন; বেদ উপনিষদ সম্বন্ধে কহেন নাই। কারণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই মীমাংসা দর্শনের দ্বারা বেদার্থ-নির্ণয়ের পন্থার আবিষ্কার হইয়াছে। এখন বেদের অর্থ কেবল বেদের শব্দেতে কেহ খোঁজে না, লোকে মীমাংসার সাহায্যেই বেদার্থ-নির্ণয় করিতে চেষ্টা করে। জৈমিনি-সূত্র বেদের কর্ম্মকাণ্ডের এবং বাদরায়ণ-সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র বেদের জ্ঞানকাণ্ডের বা উপনিষদের অর্থ কি করিয়া নির্ণয় করিতে হয়, তার পথ দেখাইয়াছেন। এই পথ ধরিয়া, এই সকল সূত্র প্রয়োগ করিয়াই এখন লোকে বেদার্থের বিচার করে। আর এই সকল মীমাংসার সূত্রও যুক্তি এবং স্বানুভূতির আশ্রয়েই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরাণতন্ত্রাদির মীমাংসা-শাস্ত্র নাই, কিন্তু টীকা আছে। আর এসকল শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ কি, টীকাকারেরা যুক্তি ও বিচার অবলম্বনে, পূর্ব্বাপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহাই নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে সকল পুরাণ-তন্ত্রের টীকা আছে অর্থাৎ যাহার অর্থ-

নির্ণয়ে পণ্ডিতেরা যুক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া, পূর্ব্বাপরের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, রাজা কেবল সেই সকলকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; যুক্তি ও বিচারের কষ্টিতে যার পরীক্ষা হয় নাই, তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। এসকল ছাড়া, টীকা না থাকিলেও মহাজনেরা যে শাস্ত্র উদ্ধার করিয়াছেন, রাজা তাহারও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। নিজের অপরোক্ষ-অনুভূতিতে সত্যের সাক্ষাৎকার যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, নিজের সাধনের দ্বারা যাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাই মহাজন। মহাজনেরা পুরাণ-তন্ত্রাদির যে বচন উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের সাধনা-ভিজ্ঞতার দ্বারা তাহার সত্যতার প্রমাণ পাইয়াছেন, ইহা সহজেই মানিয়া লইতে পারা যায়। অতএব মহাজনদিগের সাধনাভিজ্ঞতার দ্বারা সমর্থিত বলিয়া তাঁহাদের উদ্ধৃত বচনও প্রামাণ্য। শাস্ত্রপ্রামাণ্য সম্বন্ধে রাজার ইহাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ এই বিষয়টি এইরূপে তলাইয়া দেখিলে, একান্তভাবে সকল শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জ্জন করিয়া, শুদ্ধ ব্যক্তিগত অনুভূতির উপরে ধর্ম্মবস্তুকে গড়িয়া তুলিতে যাইতেন বলিয়া বোধ হয় না। এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ রাজার সিদ্ধান্ত ও মতবাদ হইতে কতটা যে সরিয়া পড়িয়াছেন, পরবর্ত্তীকালের ইতিহাসে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

রাজা বেদ, উপনিষদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র প্রাচীন সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও, কেন পুরাণ তন্ত্রাদির প্রচার না করিয়া বেদান্ত ও উপনিষদের প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? আবার উপনিষদও অনেক; এ সকল উপনিষদের মধ্যেই বা রাজা কেবল পাঁচখানি মাত্রই প্রকাশ করিলেন কেন? ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক বৃহৎ গ্রন্থ, কিন্তু কেবল আয়তনের বিস্তৃতি দেখিয়া যে রাজা এ দু'খানির প্রচার ও অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই, এমন কল্পনা করা যায় না।

অন্যদিকে, প্রশ্ন-উপনিষদ, তৈত্তিরীয়-উপনিষদ, ঐতরেয় বা শ্বেতাশ্বতর কিম্বা কৈষতকী-ব্রাহ্মণোপনিষদ প্রভৃতি ত তেমন বড় নহে। কিন্তু রাজা এগুলির প্রচারে ও অনুবাদে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহার কি কোনও নিগূঢ় কারণ ছিল?

রাজার বেদান্ত ও উপনিষদ প্রচারের মূল উদ্দেশ্য

রাজার পুস্তকাদি পড়িয়া, আর তাঁর সমসময়ে দেশের অবস্থার আলোচনা করিয়া মনে হয় যে রাজা যে কাজটি করিতে গিয়াছিলেন তাহার জন্য বেদান্ত-সূত্র এবং কেন, কঠ, ঈশ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পঞ্চ উপনিষদের প্রচারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় ছিল। ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্ম্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করাই রাজার শাস্ত্র-প্রচারের মূল লক্ষ্য ছিল বলিয়া মনে হয়। সকল দিক দিয়াই দেশে এই প্রত্যক্ষ অনুভূতির অত্যন্ত অভাব হইয়াছিল। প্রচলিত প্রতিমা-পূজাতে যে লোকের মনে কোনও ভক্তির উদয় হইত না, এমন নহে। কিন্তু এই ভক্তি প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিতে পারিত না, কল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই জন্মিত ও বাড়িত। এই কল্পনাশ্রিত ভক্তিও সকলে লাভ করিত না; সাধারণে এ সকল পূজা-পার্ব্বণের নিতান্ত বাহ্য রং তামাসাই দেখিত ও সম্ভোগ করিত। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে এগুলিকে রূপক-রূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মূল বস্তুজ্ঞান যার নাই, রূপকের মর্ম্ম ও মর্য্যাদাই বা সে বুঝিবে কিসে? এই জন্য দেবদেবীগণ কেবল অতিপ্রাকৃত কল্পনারূপেই লোকের চিত্তকে অধিকার করিয়া বসিয়া-ছিলেন। লোকে ভোগলীপ্সার দ্বারা প্রেরিত হইয়া এ সকল দেব-দেবীর পূজা করিত। এরূপ অবস্থায় ঈশ্বরতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনকে, যে কোনও উপায়ে হউক, মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত ও এই অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাবশ্যক ছিল। আর এই

প্রয়োজনের প্রেরণাতেই রাজা সর্ব্বপ্রথমে বেদান্তসূত্র, বেদান্তসার এবং কেন, ঈশ, কঠ, মণ্ডুক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচখানি উপনিষদের মূল ও অনুবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হন।

বেদান্তের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম—প্রত্যক্ষ-ও-অনুমান প্রতিষ্ঠা

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—বলিয়া বেদান্ত ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। অস্য—এই জগতের, জন্মাদি—জন্ম স্থিতি ও লয়, যতঃ -যাঁহা হইতে, তিনিই ব্রহ্ম। এখানে বেদান্ত, জন্ম স্থিতি লয় এই সর্ব্বজন-প্রত্যক্ষ যে জাগতিক ব্যাপার তাহারই উপরে, তাহারই সঙ্গে যুক্ত করিয়া, ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছেন। যাহা ছিলনা তাহা হইল, ইহাই জন্ম। যাহা হইল তাহা থাকিয়া গেল, ইহাই স্থিতি। যাহা হইয়াছিল তাহা চলিয়া গেল, ইহাই মৃত্যু বা লয়। এই তিনটি ব্যাপার সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে। আর যাহা ছিল না, তাহা কোথা হইতে আসিল? যাহা আসিল তাহাই বা কিসের জোরে রহিল? যাহা আসিয়াছিল তাহাই বা আবার কোথায় চলিয়া গেল? জগতের প্রত্যক্ষ জন্মাদি ব্যাপার দেখিয়া সকলেরই মনে এই প্রশ্ন আপনা হইতেই উদিত হয়। ইহার জন্য কোন বিস্তৃত জ্ঞান, মার্জ্জিত বুদ্ধি কিম্বা গভীর ধ্যানের আবশ্যক হয় না। অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেরই জন্মাদি ব্যাপার যেমন প্রত্যক্ষ হয়, এই সকল ব্যাপার দেখিয়া সেইরূপ সকলের মনেই এই প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, হইয়া থাকে; না হইলেও বলা মাত্রই সকলের মনেই ইহা সহজে জাগিয়া উঠে। আর বেদান্ত বলিতেছেন যে এই যে প্রত্যক্ষ জন্মাদি ব্যাপার, ইহার দ্বারা মনে স্বভাবতঃই যে জিজ্ঞাসার বা জানিবার ইচ্ছার উদয় হয়, সেই জানিবার ইচ্ছার নিবৃত্তি যাহা জানিলে হয়, তাহাই ব্রহ্ম। অর্থাৎ বেদান্ত জগৎ-কারণরূপে ব্রহ্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কার্য্য দেখিলেই মন আপনার

স্বভাববশে তাহার যথাযথ কারণ অন্বেষণ করে। জগৎ-রূপ কার্য্য দেখিয়া মন ইহার অন্তরালে, আপনার স্বভাবে বা স্বতঃসিদ্ধ-প্রত্যয়বশে যে কারণের প্রতিষ্ঠা করে, তাহাই ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মই জগতের লোকের একমাত্র উপাস্য। কারণ যে যাহারই উপাসনা করুক না কেন, তাহার আপনার উপাস্যকে সর্ব্বদাই জগৎ-কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে।

কেনোপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব

বেদান্ত আরও গভীরতর তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহা সত্য। কিন্তু সে সকল তত্ত্বও প্রত্যক্ষেরই উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর তারও বুনিয়াদ এই বহির্জগৎ ও এই মানুষ ভিন্ন আর কিছু নহে। এই যে ব্রহ্মতত্ত্ব, যাহা হইতে জগতের জন্ম-আদি হয়, তলবকার বা কেন উপনিষদে তাহাকেই মানুষের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রেরয়িতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বহির্জগৎ দেখিয়া যেমন আমরা তাহার কারণ ও প্রতিষ্ঠা কোথায়, ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই; সেইরূপ এই যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ইহাদের কার্য্য ও প্রকৃতি যখন একটু তলাইয়া দেখি, তখন এগুলি যে স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া, ইহাদেরও প্রতিষ্ঠাই বা কোথায়, তাহা খুঁজিতে আরম্ভ করি। চক্ষু রূপ দেখে, কাণ শব্দ শোনে, ত্বক স্পর্শ অনুভব করে, নাসিকা গন্ধ গ্রহণ করে, রসনা রস আস্বাদন করে। এ সকল নিয়তই দেখি। কিন্তু কি করিয়া করে? ইহা ত বুঝি না। রূপ সম্মুখে থাকিলেই যে চক্ষু সকল সময় তাহা দেখে, তাহা ত নয়। সেইরূপ এই সকল যন্ত্রের সঙ্গে তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ের যোগ হইলেই যে শব্দ-স্পর্শাদির অনুভূতি হয়, এমনও ত নয়। এরা যন্ত্র; এদের পশ্চাতে কে যেন যন্ত্রী হইয়া আছেন। সেই যন্ত্রী যখন যে যন্ত্রকে চালিত করেন, তখনই সেই যন্ত্র আপনার কর্ম্ম করে। এইটিও ত প্রত্যক্ষ কথা।

তবে জন্মাদি ব্যাপার যতটা সহজে প্রত্যক্ষ হয়, এসকল ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি ও কর্ম্ম ততটা সহজে ও অনায়াসে অনুভবগম্য হয় না। এইজন্য একটু ধ্যান, একটু ভাবনা, সামান্য একটু অন্তর্মুখীনতার প্রয়োজন। কিন্তু ইহা অনুভব করা সামান্য আয়াসসাধ্য মাত্র, দুঃসাধ্য বা অসাধ্য নহে। আর এই ভাবনা মুখে করিয়াই তলবকার উপনিষৎ প্রকাশিত হইয়াছে:—

কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুশ্রোত্রঃ কউ দেবো যুনক্তি ॥

রাজা ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—

"কোন্ কর্ত্তার ইচ্ছামাত্রের দ্বারা মন নিযুক্ত হইয়া আপনার বিষয়ের প্রতি গমন করেন, অর্থাৎ আপন বিষয়ের চিন্তা করেন। আর কোন্ কর্ত্তার আজ্ঞার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের প্রধান যে প্রাণবায়ু তিনি আপনার ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হয়েন। আর কার প্রেরিত হইয়া শব্দরূপ বাক্য নিঃসরণ হয়েন, যে বাক্যকে লোকে কহিয়া থাকেন। আর কোন্ দীপ্তিমান কর্ত্তা চক্ষু ও কর্ণকে উহাদের আপন আপন বিষয়েতে নিয়োগ করেন। শিষ্য এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে গুরু উত্তর করিতেছেন—

শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসোমনোযদ্বাচোহ বাচং
সউ প্রাণস্য প্রাণঃ চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য
ধীরাঃ প্রেত্যাস্মাল্লোকামৃতা ভবন্তি।

তুমি যাঁহার প্রশ্ন করিতেছ তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র হয়েন এবং অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ বাক্যের বাক্য প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু হয়েন অর্থাৎ যাঁহার অধিষ্ঠানে এই সকল ইন্দ্রিয় আপন আপন কার্য্যেতে প্রবর্ত্ত হয় তিনি ব্রহ্ম হয়েন। এই হেতু শ্রোত্রাদির স্বতন্ত্র চৈতন্য আছে এমত জ্ঞান করিবে না। এইরূপে ব্রহ্মকে জানিয়া আর

শ্রোত্রাদিতে আত্মভাব ত্যাগ করিয়া জ্ঞানীসকল এসংসার হইতে মৃত্যু হইলে পর মুক্ত হয়েন।”

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের মূলে, ইহাদের প্রেরয়িতা হইয়াও কিন্তু এই ব্রহ্ম এসকল ইন্দ্রিয়ের অতীত হইয়া আছেন। চক্ষে যাহা দেখা যায়, কাণে যাহা শোনা যায়, মন দিয়া যাহা মনন করিয়া জানিতে পারা যায়, তাহার কিছুই ব্রহ্ম নহেন। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়-রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া, ইহা নয়, ইহা নয়, “নেতি” “নেতি” বলিয়া ব্রহ্মের কথা ভাবিতে হয়। এই “নেতি” “নেতি”র পথই ব্যতিরেকী পথ। এই পথে ব্রহ্মবস্তুকে বিশ্বাতীত, অজ্ঞেয় কিম্বা সত্তামাত্রজ্ঞেয় তত্ত্বরূপে সামান্যভাবে ধারনা করিতে পারা যায়। কেনোপনিষদে প্রথমে এই ব্যতিরেকী পন্থার উপরেই বেশী ঝোঁক দিয়াছেন। যাহারা নিতান্ত ইন্দ্রিয়রাজ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে, অতীন্দ্রিয়ের অনুভূতিলাভ যাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে, তাহাদিগকে প্রথমে এই ব্যতিরেকী পন্থাই ধরিতে হয়। ইহাতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। আর দেশের অবস্থা-বোধে রাজা এই জন্যই প্রথমে কেনোপনিষদের মূল ও অনুবাদ প্রচার করেন। কেনোপনিষদ তৃতীয় খণ্ডে এক আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম যে দেবতাদিগেরও অজ্ঞেয়, অথচ তাঁহার শক্তিতেই অগ্নি-বায়ু-বরুণ প্রভৃতি দেবগণ শক্তিশালী হইয়াছিলেন, এই কথা প্রচার করিয়াছেন। এই ভাবে কেনোপনিষদ দেবতাদিগের ঈশ্বরত্ব বা ব্রহ্মত্ব নিরস্ত করিয়াছেন। এই জন্যও রাজা এই উপনিষদখানি প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

মুণ্ডকোপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব

মুণ্ডকোপনিষদেও ব্রহ্মতত্ত্বকে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের উপরেই

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তবে কেনোপনিষদে ব্রহ্মের জগদাতীত ভাবটি যতটা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার জগদ্ব্যাপ্তি ভাব ততটা ব্যক্ত করেন নাই। মুণ্ডকোপনিষদে এটি করিয়াছেন।

ব্রহ্ম চক্ষুশ্রোত্রাদির অগোচর, নিত্য, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম, অব্যয়। কিন্তু এই ব্রহ্মকেই পণ্ডিতেরা "ভূতযোনি"রূপে প্রত্যক্ষ করেন। এইভাবে মুণ্ডকোপনিষদ ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে যুক্ত করিয়া বলিলেন—"মাকড়সা যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তুসকল বাহির করিয়া জাল নির্ম্মাণ করে এবং পুনরায় এসকল তন্তুকে আপনার মধ্যে টানিয়া লয়, সেইরূপ এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয়। প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন সহস্র সহস্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম বা অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় ও তাঁহাতেই বিলীন হয়।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

আর এই পুরুষই কর্ম্ম, তপ ও পরামৃত। তিনি সকলের বাহিরে ও সকলের হৃদয়াভ্যন্তরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। তিনি প্রাণ, তিনিই বাক্য ও মন। এইরূপে জগৎকে ও জীবকে, বিষয়রাজ্যকে ও আপনার প্রাণমনাদিকে ব্রহ্মময় দেখিবে। তিনি ওতপ্রোতভাবে জীবে ও জড়ে বিদ্যমান রহিয়াছেন। এই ভাবে তাঁহাতে মন সমাধান করিবে। কেনোপনিষদ ব্যতিরেকী পন্থার উপরে ঝোঁক দিয়াছেন। মুণ্ডকোপনিষদ অন্বয়ী পন্থার উপরে ঝোঁক দিয়াছেন। আর উভয় পন্থাতেই আদিতে ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে।

ঈশোপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব

ঈশোপনিষদেও এই অন্বয়ী-পথ ধরিতেই বিশেষভাবে উপদেশ

দিয়াছেন। এই জগতের যাবতীয় চঞ্চল বিষয়কে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদন করিবে অর্থাৎ সকলের মধ্যেই অদৃশ্য হইয়া ঈশ্বর রহিয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিবে। ইহাতে জড়ের জড়ত্ব, জীবের জীবত্ব, সকলই ব্রহ্মের স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াতে এবং শিবের শিবত্বে পরিপূর্ণ ও প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে।

কঠোপনিষদের আত্মতত্ত্ব

কঠোপনিষদেও এই প্রত্যক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বেরই প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তবে এই উপনিষদ আমাদের যে বস্তুকে আমরা "আমি" "আমি" বলি, এই অস্মদপ্রত্যয়বাচক অহংবস্তু বা আত্মবস্তুর উপরেই ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই অহংবস্তু বা আত্মবস্তু শরীরে মধ্যে অশরীরী, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হইয়া বাস করিয়াও অতীন্দ্রিয়, মরজগতে থাকিয়াও অমর। ইহা অজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ। এই অজ, নিত্য, শাশ্বত বস্তুই ত ব্রহ্ম। ওঁকার বা প্রণব এই বস্তুকেই নির্দেশ করে। এই ব্রহ্মই জীবের আত্মা। আপনাদের আত্মাতে আত্মারূপে এই ব্রহ্মের উপাসনা করিবে—ইহাই কঠ-শ্রুতির মুখ্য কথা। কঠোপনিষদ ব্রহ্মের অন্বয়ী উপাসনাও প্রচার করিয়াছেন। ব্রহ্ম প্রতি পদার্থের মধ্যে তত্তৎ পদার্থ-রূপে ও তাহার বাহিরে এবং অতীতে সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছেন। বাহিরের ভূতগ্রামের মধ্যে ও নিজের আত্মাতে তাঁহার ধ্যান করিবে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের প্রণব-তত্ত্ব

মাণ্ডুক্যোপনিষদে এই ব্রহ্মের সাধনতত্ত্ব বিশেষভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রণব বা ওঁকার এই সাধনের বীজমন্ত্র। এই উপনিষদ বিশেষভাবে এই প্রণবমন্ত্রেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ওঁকারের তিনটি পদ বা অংশ। প্রথম পাদে ইহা বিশ্বরূপ। দ্বিতীয় পাদে এই ওঁকার প্রত্যেক

জীবের মধ্যে বিষয়ীরূপে বর্ত্তমান আছেন। তৃতীয় পাদে এই ওঁকার সর্ব্বজ্ঞানের মূলাধার আনন্দময় ও আনন্দভুক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ বিশ্বরূপ, বিষয়ীরূপ এবং বিশ্ব ও বিষয়ীর মিলন ও প্রতিষ্ঠাস্বরূপ প্রজ্ঞাঘন ও আনন্দঘন রূপ—এই তিন রূপেতে ব্রহ্মপ্রতিপাদক প্রণব বা ওঁকার শব্দ পরিপূর্ণ হইয়াছে। প্রণব সহায়ে এই তিন রূপেতে ব্রহ্মের মনন ও চিন্তনাদি করিতে হয়।

উপনিষদ প্রচারে রাজার লক্ষ্য

অতএব রাজা যে ক'খানি উপনিষদ প্রচার করিয়াছিলেন তার সকলেরই মূল সাধ্য ব্রহ্ম। কেনোপনিষদের ভূমিকায় রাজা কহিতেছেন—"এসকল শ্রুতি ব্রহ্মপর হয়েন কর্ম্মপর নহেন।" ঈশোপনিষদের ভূমিকায় কহিতেছেন—"এই সকল উপনিষদাদির দ্বারা ব্যক্ত হইবে যে পরমেশ্বর একমাত্র সর্ব্বত্রব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাঁহারি উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয়।...আর ব্রহ্মোপাসনাতে কার্য্য দেখিয়া কারণে বিশ্বাস করা এবং নানাপ্রকার নিয়ম দেখিয়া নিয়মকর্ত্তাকে নিশ্চয় করিতে হয় তাহা মনবুদ্ধির চালনের অপেক্ষা রাখে।" কঠোপনিষদের ভূমিকায় প্রার্থনা করিতেছেন—"হে অন্তর্যামিন্ পরমেশ্বর, আমাদিগ্যে আত্মার অন্বেষণ হইতে বহির্ম্মুখ না রাখিয়া যাহাতে তোমাকে এক অদ্বিতীয় অতীন্দ্রিয় সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বনিয়ন্তা করিয়া দৃঢ়রূপে আমরণান্ত জানি এমত অনুগ্রহ কর।" মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় বলিতেছেন :—

> যে কোন ব্যক্তির ব্রহ্মতত্ত্বকে জানিতে ইচ্ছা হয়, তাঁহার কর্ত্তব্য এই যে বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও তাহার অর্থের মনন প্রত্যহ করেন এবং তদনুসারে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ভঙ্গকে দেখিয়া তাহার কারণ যে পরব্রহ্ম তাহাতে দৃঢ়তর বিশ্বাস

করেন যে এক নিত্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ কারণ বিনা জগতের এরূপ নানা প্রকার আশ্চর্য্য রচনার সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপে জগতের কারণ এবং ব্রহ্মাণ্ডের ও তাবৎ শরীরের চেষ্টার কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার চিন্তন পুনঃ পুনঃ করিলে এই ব্যক্তির অবশ্য নিশ্চয় হইবেক এই নামরূপময় জগৎ কেবল সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার সত্তা অর্থাৎ তেঁহ আছেন এইমাত্র জানা যায় কিন্তু তাঁহার স্বরূপ কোনোমতে জানা যায় না। যেমন এই শরীরে জীব সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আছেন ইহাতে সকলের বিশ্বাস আছে কিন্তু জীবের স্বরূপ কি প্রকার হয় ইহা কেহ জানে না এই প্রকারে মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্তের অধিষ্ঠাতা এবং সর্ব্বব্যাপী অথচ ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরব্রহ্ম হয়েন ইহাই নিত্য ধারণা করিবেন।...পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের কর্ত্তা-রূপেই কেবল বোধগম্য হয়েন ইহাই বেদান্ত সর্ব্বত্র কহেন.. এবং পরমেশ্বরের স্বরূপ কোনোমতে জানা যায় না ইহা সকল উপনিষদে দৃঢ় করিয়াছেন।....আর যে ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হইয়া থাকে কিন্তু কোনো এক অবলম্বন বিনা কেবল বেদান্তের শ্রবণ মননের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অগোচর পরমাত্মার অনুশীলনেতে আপনাকে অসমর্থ দেখেন সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য এই যে প্রণবের অধিষ্ঠাতা কিম্বা হৃদয়ের অধিষ্ঠাতা ইত্যাদি অবলম্বনের দ্বারা সর্ব্বগত পর-ব্রহ্মের উপাসনাতে অনুরক্ত হয়েন।”

কেন, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য—রাজা যে পাঁচখানি উপনিষদ প্রচার করেন তাহাতে এই ইন্দ্রিয়াতীত, জগৎ-কারণ, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরেরই উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। এই বহির্জগৎ ও আমাদের নিজ নিজ জীবনের ভিতরকার অভিজ্ঞতার চিন্তা ও ধ্যান

করিয়াই, আমরা এই ব্রহ্মতত্ত্বের সন্ধান পাইতে পারি। আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা ইহা গ্রহণ করিতে পারা যায়। এখানে কোন প্রকারের কল্পনার আশ্রয় লইতে হয় না। আর ধর্ম্মকে ও ব্রহ্মকে সাধকের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত করিবার জন্যই রাজা এই পঞ্চোপনিষদের প্রচার করেন। এইরূপেই তিনি কল্পিত দেবোপাসনা নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

দেবোপাসনা ও ব্রহ্মোপাসনা

কিন্তু পুরাণ তন্ত্রাদিতে যে সকল দেবদেবীর বর্ণনা আছে, রাজা কোথাও তাহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। বাইবেলে যে এঞ্জেল্‌দিগের কথা আছে, তাহাদের অস্তিত্বও রাজা অস্বীকার করেন নাই। আর কোন যুক্তিবলেই যে এসকলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়, ইহাও কল্পনা করিতে পারা যায় না। আমরা এ সকল দেবদেবীর বা এঞ্জেলের সাক্ষাৎকার লাভ করি নাই, এ মাত্রই বলিতে পারি। কিন্তু যাহা দেখি নাই তাহাই যে নাই এমন কথা বলিতে পারি কি? আর মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠতর জীব যে জগতে নাই, এমন কল্পনাই বা করিব কিরূপে? তবে দেবদেবী বা এঞ্জেল্‌ আছেন বা থাকিতে পারেন, এই কথা মানিয়াই ইহারা যে জগতের কর্ত্তা নহেন, ইহারাও যে ব্রহ্মের বা জিহোভার পূজা করেন, ইহারাও যে মুক্তির প্রয়াসী, শাস্ত্রযুক্তিপ্রমাণে রাজা ইহা দেখাইয়াছেন। আর এইভাবেই দেবদেবীর উপাসনা নিরসন করিয়াছেন। এই সকল দেবদেবীকে যখন আমাদের কোন প্রকারের প্রত্যক্ষ অনুভবের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে পারা যায় না; "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—সূত্র কিম্বা "কেনেষিতং পততি প্রেষিতং"—শ্রুতির ধ্যানে যখন ইহাদিগকে পরোক্ষ-ভাবে, তটস্থ লক্ষণের দ্বারাও আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের বা অন্তরিন্দ্রিয়ের

প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত করিতে পারা যায় না, তখন এসকল দেব-দেবীর ধ্যানে ও চিন্তাতে কেবল মানস-কল্পনারই আশ্রয় লইতে হয়। প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে এরূপ উপাসনার কোন জীবন্ত ও অপরোক্ষ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অথবা এইরূপ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, এসকল দেবদেবীকেই ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করা আবশ্যক হয়। আর কোন বস্তুর জ্ঞান না থাকিলে, তার সম্বন্ধে কোনও সত্য কল্পনাও করা যায় না। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে এরূপই হইয়াছে। পুরাণতন্ত্রাদি এই সকল দেবদেবীতে ব্রহ্মের অধ্যাস করিয়া, দেবোপাসনার আশ্রয়ে ব্রহ্মোপাসনারই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এইরূপ অধ্যাস অর্থই—অন্তত্রদৃষ্টঃ পরত্রাবভাসঃ—অর্থাৎ অন্যত্র যেবস্তু পূর্ব্বে দেখা গিয়াছিল, এখন এখানে তাহা না থাকিলেও আছে বলিয়া অনুমান বা অনুভব করা,—যাহাতে যে-বস্তু সহজে ও সত্যভাবে প্রত্যক্ষ নাই, তাহাতে সেই বস্তু আছে, এরূপ কল্পনা করা। এরূপ কল্পনা মানসক্রিয়া মাত্র ; ইহার সঙ্গে বস্তুসম্বন্ধ থাকে না। এইরূপ কল্পিত উপাসনাতে প্রত্যক্ষ জগতের সঙ্গে উপাস্যের বা উপাসকের জীবন্ত সম্বন্ধের জ্ঞান ও উপলব্ধি ক্ষীণ হইয়া যায়। মানুষের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম বস্তু-আশ্রয়হীন হইয়া, প্রাণহীন ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। ইহাতে মানুষকে তামসাচ্ছন্ন করিয়া তুলে। অন্যদিকে এই কল্পিত উপাসনাকে সজীব ও সরস করিবার জন্যই দেবদেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া, তাহাদিগকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিবার চেষ্টা করিতে হয়। যাঁহারা নিজেদের অপরোক্ষ অনুভূতিতে অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মতত্ত্বের বা ঈশ্বরতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে আপনাদের অন্তরের ভাবাঙ্গ অবলম্বনে বাহিরে প্রতিমার সাহায্যে ভাবমূর্ত্তিরূপে গড়িয়া তুলিতে পারেন এবং এইরূপে যে প্রতীকোপসনা হয়, তার একটা সার্থকতাও আছে। কিন্তু কেবল

শ্রেষ্ঠতম সাধকেরাই এরূপ প্রতিমাপূজার অধিকারী। সাধারণের এ অধিকার নাই। এই পূজাতে অনধিকারী উপাসকের সহজ অতীন্দ্রিয়ানুভূতির স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। উপাসক শব্দস্পর্শরূপরসাদিতে আবদ্ধ হইয়া পড়েন। এসকল দেবদেবীর উপাসনা ও প্রতিমার পূজা একদিকে যজমানকে একান্ত অন্তর্মুখীণ বা subjective, অথবা একান্ত বহির্মুখীণ বা objective জগতে বাঁধিয়া রাখে। এইরূপ দেবোপাসনাতে ইন্দ্রিয়ের ভিতরেই অতীন্দ্রিয়ের সাড়া পাইয়া ও অতীন্দ্রিয়ের উপরেই ইন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ব্রহ্মকে ও ব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডকে স্থাপন ও প্রত্যক্ষ করিয়া, দৃষ্ট ও অদৃষ্টের, সান্ত ও অনন্তের, সংসার ও পরমার্থের বিরোধ ও ব্যবধান নষ্ট করিয়া, জীবনকে পরিপূর্ণ সফলতার পথে পরিচালিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। আর জীবনকে সতেজ, কর্ম্মকে সার্থক এবং ধর্ম্মকে ও ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত করিয়া সত্য ও বস্তুগত করিবার জন্যই রাজা একদিকে বেদান্ত ও উপনিষদের প্রচার আর অন্যদিকে এদেশে যাহাতে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা-বিস্তার হয়, যুগপৎ তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইখানেই রাজার জীবনের ও কর্ম্মের মূল সূত্রটি প্রাপ্ত হই। রাজা দেশের ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এই পথেই ধর্ম্মের শক্তি ও কর্ম্মের সফলতা লাভের সম্ভাবনা। এই কাজটি করিবার জন্যই রাজা এদেশে আবার বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানের ও উপনিষদের ব্রহ্মোপাসনার প্রচার করেন। এইজন্যই তিনি লর্ড আমহার্ষ্টকে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লেখেন। এইজন্যই তিনি ব্রহ্মসভারও প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ কি এপথ ধরিয়া চলিয়াছেন? দেশের অপর কোন সম্প্রদায় বা মণ্ডলীই কি রাজার আদর্শের অনুসরণ করিতেছেন?

রাজার কাজটি কি শেষ হইয়াছে ? আমাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কি প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে ? এসকল দেশের হিতাকাঙ্খী মাত্রেরই ভাবিবার কথা।

রামমোহন ও ব্রহ্মসভা

রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মসভারই প্রতিষ্ঠা করেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একটী নূতন ধর্ম্মের কিম্বা ব্রাহ্মসমাজ নামে একটী নূতন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করতে চান নাই। একটী বিশেষ ধর্ম্ম বা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলে, তাহার সঙ্গে জগতের অপরাপর ধর্ম্মের ও সম্প্রদায়ের একটা বিরোধ বাধিয়া উঠিত। কারণ প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্মসকল যতক্ষণ না অসত্য বা অক্ষম বলিয়া বোধ হয়, ততক্ষণ কেহ কোন নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যায় না। প্রাচীনের অসত্যতা ও অপূর্ণতাকে দূর করিয়াই খৃষ্টীয়ান প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়। হিন্দু, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান প্রভৃতি প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্মসকল ভ্রান্তিপূর্ণ ও মুক্তির পথ প্রদর্শনে অক্ষম বলিয়া ভাবিলে রাজাও ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে একটী অভিনব সত্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ব্রতী হইতে পারিতেন। আর সে অবস্থায় সত্যাসত্য প্রামাণ্য-অপ্রামাণ্য লইয়া তাঁর প্রতিষ্ঠিত নূতন ধর্ম্মের ঐ সকল পুরাতন ও প্রচলিত ধর্ম্মের একটা নিত্য-বিরোধ জাগিয়া থাকিত। কিন্তু রামমোহন একেবারে কোন ধর্ম্মকেই অসত্য কহেন নাই। এমন কি, যে প্রচলিত প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে তিনি অমন খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, তাহাকে পর্য্যন্ত একান্ত অসত্য বা ধর্ম্ম-বিগর্হিত কহেন নাই। জগৎকার্য্য দেখিয়া জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ-কর্ত্তা যে ইন্দ্রিয়াতীত ও মন বুদ্ধির অগম্য পরমেশ্বর, তাঁহার চিন্তনে যাঁহারা অসমর্থ তাঁহাদের নিমিত্ত এ সকল কল্পিত রূপের পূজার ব্যবস্থা হইয়াছে, অপরের জন্য নহে; এই শাস্ত্র প্রমাণে রাজা বুদ্ধিমান শিক্ষাভিমানীদিগের পক্ষে এ সকল বাহ্যপূজা নিন্দনীয় ও সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়

বলিয়াছিলেন। নতুবা তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণের মধ্যে অনেকে যেমন এগুলিকে একান্ত ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, রাজা কদাপি তাহা করেন নাই। প্রত্যুত এ সকল প্রতিমার বা দেবদেবীর পূজা যাহারা করে, তাহারাও যে আপনাপন আরাধ্য দেবতাকে জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা বলিয়া মনে করে, রাজা বারম্বার একথাও স্বীকার করিয়াছেন। রাজা যেভাবে প্রত্যক্ষ জগতের বিচিত্র রচনার আলোচনা করিয়া এই জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তার চিন্তন ও ধ্যান-ধারণার প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রহ্মসভায় ব্রহ্মোপাসনার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে এসকল বাহ্য ও কল্পিত পূজা-অর্চ্চনা—শুষ্ক পত্র যেমন আপনি বৃক্ষশাখা হইতে ঝরিয়া পড়ে, সেইরূপ উপাসকের মন ও ব্যবহার হইতে চলিয়া যাইবে, ইহা তিনি জানিতেন। যতদিন না এইরূপ সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে এসকল বাহ্য ও কল্পিত পূজা-অর্চ্চনা আপনা হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছে, ততদিন এসকল হইতে লোককে প্রতিনিবৃত্ত করিতে তিনি চান নাই, বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার যত কিছু বিচার ও তর্ক-বিতর্ক কেবল বুদ্ধিমান, শাস্ত্রজ্ঞ, পাণ্ডিত্যাভিমানী লোকের সঙ্গেই হইয়াছিল। এসকল লোকের পক্ষে যে এই বাহ্য পূজা বিহিত হয় নাই, ইহারা শ্রেষ্ঠতর অধিকারী হইয়াও কেবল সাংসারিক স্বার্থ ও সুবিধার জন্যই নিজেরা এসকল পূজা করিতেন ও সাধারণ লোককে এসকলে প্রবৃত্ত করাইতেন, রাজা এই কথা বলিয়াই ইহাদিগের কর্ম্মের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন; নতুবা সাধারণ খৃষ্টীয়ান বা মুসলমানদিগের মতন রাজা কখনও এসকল বাহ্য পূজা-অর্চ্চনাকে অধর্ম্ম বা দুর্নীতি বা পাপ, এমন কি একান্ত অসত্য বলিয়াও প্রচার করেন নাই। যাহারা যে কোন কারণেই প্রতিমাদির পূজা করেন, তাঁহারা যে ব্রহ্মসভায় উপাসনা করিবার অনধিকারী বা ব্রহ্মসভার সভ্য হইতে পারেন না, কিম্বা ব্রহ্মসভার আচার্য্যের বা অন্য কোন কর্ম্মপদ পাইতে পারেন না, রাজা রামমোহন

কখনও একথা বলেন নাই। এ দেশের প্রতিমা পূজকেরাও যখন আপনার ইষ্টদেবতাকে জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করেন, যখন প্রতিমাদির প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকেও তাঁহারা সন্ধ্যা-বন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম সাধন করিবার সময় কেবল জগতের স্রষ্টা পাতা ও নিয়ন্তারূপে আপনাপন ইষ্টদেবতার চিন্তন ও ধ্যান করেন,—এবং প্রতিমাদিগকে দেবতার আবির্ভাব-স্থান ভাবিয়াই এসকলের ভোগ-আরতি করেন, তখন ইঁহারাও ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া থাকেন, প্রকৃতপক্ষে কাষ্ঠলোষ্ট্রের পূজা করেন না ; আর এজন্য ইঁহারাও ব্রহ্মসভায় যোগদান করিতে পারেন, রাজা ব্রহ্মসভায় যে উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন, ইঁহারাও তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী। হিন্দু, খৃষ্টীয়ান, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোককেই রাজা তাঁর ব্রহ্মসভাতে আহ্বান করিয়াছিলেন। আর তাঁহারা নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত ও সাধনাদি বর্জ্জন না করিয়াও ব্রহ্মসভাতে আসিতে পারেন, রাজা ইহাও বলিয়াছিলেন। এই জন্যই ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠাতে রাজা রামমোহন রায় যে কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন বা বিশিষ্ট সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চান নাই, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারা যায়। ব্রহ্মসভার ক্রমবিকাশে পরে এরূপ সম্প্রদায় গঠন অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল কিনা, সে প্রশ্ন উঠিতে পারে। ব্রাহ্মসমাজের পরবর্ত্তী ইতিহাসের আলোচনায় এ প্রশ্নের বিচার করাও আবশ্যক হইবে। কিন্তু সেই বিচারের দ্বারা রাজা রামমোহন যে কোন নূতন ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, একথা অপ্রমাণ হইবে না।

রাজা যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে কোনও নূতন ধর্ম্মের প্রচার ও প্রবর্ত্তনা না করিয়া থাকেন, তবে তিনি করিয়াছেন কি? এই প্রশ্ন উঠে। তাহা হইলে তাঁর কার্য্যের বিশেষত্বই বা কি, প্রয়োজনই বা কি ছিল, এই বিচার করিতে হয়। এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় এইমাত্র

বলা যাইতে পারে যে জগতের সকল ধর্ম্ম বিবিধ নামরূপাদির সঙ্গে যুক্ত করিয়া যে পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, রাজা এসকল নামরূপাদি হইতে বিযুক্ত করিয়া, সেই পরব্রহ্মের পূজাই প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই রাজার ব্রহ্মসভার বিশেষত্ব। এই ভাবে সকল প্রকারের সাম্প্রদায়িকতা ও বিশিষ্ট নামরূপাদি হইতে বিযুক্ত করিয়া, কেবল জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তারূপে পরমেশ্বরের ভজনাতে সকল ধর্ম্মের ও সকল সম্প্রদায়ের লোকেই সমভাবে যোগদান করিতে পারেন। আর এইরূপে সকল ধর্ম্মের ও সকল সম্প্রদায়ের একটা সাধারণ মিলন ক্ষেত্র রচনাই ব্রহ্মসভার লক্ষ্য ছিল। এই প্রয়োজন সাধনের জন্যই রাজা ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠায় যাঁহাকে উপাস্যরূপে বরণ করিয়াছিলেন, তিনি সম্প্রদায় বিশেষের বা ধর্ম্ম বিশেষের বিশিষ্ট উপাস্য নহেন, কিন্তু সকল ধর্ম্মের ও সকল সম্প্রদায়েরই উপাস্য। জগতের যে যেখানে যে নামে, যে ভাবে, যে উপায়ে বা উপকরণে, যাঁহারই উপাসনা করুক না কেন, রাজা বলিতেছেন, সে তাহার নিজের এই উপাস্যকে এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা মনে করে। ইহাকেই ত বেদান্ত ব্রহ্ম কহিয়াছেন। যাঁহা হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার মধ্যে ও যাঁহার শক্তিতে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বিশ্বের প্রবাহ অবিরাম গতিতে যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে ও অন্তিমে, প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করিতেছে ও যাঁহার মধ্যে বিলীন হইয়া যাইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম। এই ভাবে বেদান্ত ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জগতের কারণ ও নির্ব্বাহককেই শাস্ত্রে ব্রহ্ম কহিয়াছেন। এই ব্রহ্ম কোনও প্রকারের নামরূপের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হন নাই। তাঁর কেবল একনাম—তজ্জ ও তল্ল; অর্থাৎ যাঁহা হইতে বিশ্বের জন্ম ও যাঁহাতে বিশ্বের লয় হয়, তিনিই ব্রহ্ম। আর যে যাঁহারই উপাসনা

করুক না কেন, তাঁহাকেই বিশ্বের জন্ম-স্থিতি-লয়—হেতু বলিয়া মনে করে। অতএব জগতের একমাত্র উপাস্য ব্রহ্ম। "অনুষ্ঠান" নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে "কে উপাস্য?" এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলিয়াছেন :—

> অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি সম্বলিত অচিন্তনীয় রচনাবিশিষ্ট যে এই জগৎ ও ঘটিকাযন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত বেগে ধাবমান যন্ত্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যুক্ত যে এই জগৎ ও নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম শরীরে যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ, ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য হন।

রাজা এই উপাস্যেরই উপাসনা প্রচার করেন। আর জগতের সকল ধর্ম্ম ও সকল উপাসকই যখন আপন আপন উপাস্যকে জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়ের কারণ বলিয়া মনে করেন, তখন বিচারত কেহই এই উপাসনার বিরোধী হইতে পারেন না। রাজা বলিতেছেন :—

> এ উপাসনার বিরোধী বিচারত কেহ নাই, যেহেতু আমরা জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা এই উপলক্ষ করিয়া উপাসনা করি, অতএব এরূপ উপাসনায় বিরোধ সম্ভব হয় না; কেননা প্রত্যেক দেবতার উপাসকেরা সেই সেই দেবতাকে জগৎ-কারণ ও জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা এই বিশ্বাস পূর্ব্বক উপাসনা করেন, সুতরাং তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে তাহারা সেই সেই দেবতার উপাসনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন। এই প্রকারের যাঁহারা কাল কিম্বা স্বভাব অথবা বৃক্ষ কিম্বা অন্য কোন পদার্থকে জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তা কহিয়া থাকেন তাঁহারাও বিচারত এ উপাসনার, অর্থাৎ জগতের নির্ব্বাহকর্ত্তারূপে চিন্তনের, বিরোধী হইতে পারিবেন না এবং চীন ও তিব্বত ও ইউরোপ ও অন্য অন্য দেশে যে সকল নানাবিধ

> উপাসকেরা আছেন, তাঁহারাও আপন আপন বিশ্বাসানুসারে আমাদের এই উপাসনাকে সেই সেই উপাস্যের আরাধনারূপে অবশ্যই স্বীকার করিবেন।

বিচারত যদি অপর উপাসকেরা, রাজা যে উপাসনা প্রচার করেন, তাহার বিরোধী হইতে না পারেন, তাহা হইলে, রাজা বা রাজার অনুবর্ত্তীগণও অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী হইতে পারেন না। প্রশ্নকর্ত্তা এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া, "আপনারা অন্য অন্য উপাসকের বিরোধী ও দ্বেষ্টা হন কিনা?" এই প্রশ্ন করিলে, রাজা কহিতেছেন:—

> কদাপি না, যে কোন ব্যক্তি যাঁহার যাঁহার উপাসনা করেন সেই সেই উপাস্যকে পরমেশ্বর বোধে কিম্বা তাঁহার আবির্ভাব-স্থান বোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, সুতরাং আমাদের দ্বেষ ও বিরোধ ভাব তাঁহাদের প্রতি কেন হইবেক।

কিন্তু তাই যদি হয়, অর্থাৎ আপনারা যে পরমেশ্বরের উপাসনা করেন এবং অন্য অন্য উপাসকেরাও প্রকারান্তরে সেই পরমেশ্বরেরই উপাসনা করেন, তবে তাঁহাদের সহিত আপনাদের প্রভেদ কি? রাজা ইহার উত্তরে কহিতেছেন:—

> তাঁহাদের সহিত দুই প্রকারে আমাদের পার্থক্য হয়, প্রথমতঃ তাঁহারা পৃথক্ পৃথক্ অবয়ব ও স্থানাদি বিশেষণের দ্বারা পরমেশ্বরের নির্ণয় বোধে উপাসনা করেন, কিন্তু আমরা, যিনি জগৎকারণ তিনি উপাস্য ইহার অতিরিক্ত অবয়ব কি স্থানাদি বিশেষণ দ্বারা নিরূপণ করি না। দ্বিতীয়তঃ, এক প্রকার অবয়ব বিশিষ্টের যে উপাসক তাঁহার সহিত অন্য প্রকার অবয়ববিশিষ্টের উপাসকের বিবাদ দেখিতেছি, কিন্তু আমাদের সহিত কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভব নাই।

যে যাহারই উপাসনা করে, সে তাহাকেই জগতের কারণ ও

নির্ব্বাহক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে ; সুতরাং নানা নামে, নানাবিধ উপায়ে ও উপকরণসহায়ে জগতের সকল লোকেই যিনি জগতের কারণ ও কর্ত্তা, বিশ্বসংসার যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন, তাঁহারই উপাসনা করে, এই সর্ব্ববাদীসম্মত প্রত্যক্ষ সত্যকে অবলম্বন করিয়াই রাজা জগতের সকল ধর্ম্মের একটা সাধারণ মিলনভূমির প্রতিষ্ঠা করেন। রাজার এই ধর্ম্মসূত্র সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক। এই মূল বিষয়ে সকল ধর্ম্মের মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে। এই ঐক্যের উপরেই রাজা তাঁর ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

ফলতঃ রাজার সমস্ত কর্ম্মেরই এই একটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই যে তিনি সর্ব্বদা সকল বিষয়েই একটা সঙ্গতি ও সমন্বয়ের পথ খুঁজিয়া চলিতেন, অথচ সকল বিষয়েই আবার তিনি সময়োপযোগী সংস্কার এবং পুনর্গঠনেরও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সংস্কার করিতে যাইয়া প্রাচীন ও প্রচলিতের সঙ্গে তাঁর চারিদিকেই গুরুতর বিরোধ বাধিয়া উঠিয়াছিল কিন্তু এই বিরোধের কোলাহল এবং বিক্ষেপের মধ্যেও রাজা কখনও মিলন ও সামঞ্জস্যের সূত্রটি হারাইয়া ফেলেন নাই। আর তাঁর প্রত্যক্ষবাদই তাঁহাকে এই মিলনসূত্রটি দিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। রাজা দেখিলেন প্রত্যক্ষের ভূমিতে সত্য সত্য কোনও বিরোধ হয় না। এখানে অশেষ প্রকারের বিচিত্রতা আছে, কিন্তু কোথাও একটা কাল্পনিক ঐক্যের নামে অনর্থক ও সাংঘাতিক অনৈক্যের প্রতিষ্ঠা হয় না। জগতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে যত বিবাদ বিসম্বাদ তাহা সকলই অপ্রত্যক্ষ, অতিপ্রাকৃত বিষয় লইয়া। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জগতের আস্তিক-নাস্তিক সকলেই স্বীকার করেন। জগৎটা যে কার্য্য, ইহা যে জন্ম বস্তু, একথাও সকলেই মানেন। সুতরাং এই জগৎরূপ কার্য্যের একটা কারণও যে আছেই আছে, ইহাও সকলেই বিশ্বাস করেন। এই পর্য্যন্ত আস্তিকে-নাস্তিকে, ঈশ্বরবাদী ও নিরীশ্বর-

বাদীতে কোনও বিরোধ নাই। নিরীশ্বরবাদীদিগকে রাজা কহিতেছেন, "তোমরাও ত কালকে বা স্বভাবকে অথবা পরমাণুকে কিম্বা অন্য কোনও পদার্থকে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক বলিয়া স্বীকার কর। তোমরা যাঁহাকে কাল বা স্বভাব বা পরমাণু বা অন্য কিছু নামে অভিহিত করিতেছ, আমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলি। সুতরাং মূলে তোমাতে আমাতে ত অমিল নাই। আর এই জগতের উৎপত্তি যাহা হইতেই হউক না কেন, এই জগৎকার্য্য দেখিয়া আমরা সকলেই বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া উঠি। কি আশ্চর্য্য ইহার পরিপাটি। কি অদ্ভুত ইহার বিচিত্রতা। কি নিগূঢ় ইহার ঐক্যবন্ধন। কি শৃঙ্খলা, কি কৌশল, কি নিপুণতা, কি অনির্ব্বচনীয় মহিমায় এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এ সকল চিন্তা করিয়া যে কারণ হইতে এই বিচিত্র, অদ্ভুত, সুনিপুণ, সুশৃঙ্খল, অনির্ব্বচনীয় শক্তিশালী ও মহিমাময় জগতের প্রকাশ বা সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার জ্ঞান, শক্তি ও মহিমার কথা ভাবিয়া সকলকেই স্তম্ভিত হইতে হয়। এই সকল ভাবের অনুশীলনই ত উপাসনা।" এই "অনুষ্ঠান"-পত্রেই রাজা "উপাসনা কাহাকে কহেন?" এই প্রশ্নের উত্তরে কহিতেছেন যে—

"পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহি।"

এইরূপে রাজা কি উপাস্য-নির্ণয়ে, কি উপাসনার সংজ্ঞা নির্দ্ধারণে, ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গে বা সাধনাঙ্গে, কোন দিকেই কোন প্রকারের অপ্রত্যক্ষ ও অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। এমন কি, পাছে তাঁর প্রচারিত উপাসনাতে কি জানি কোনও অপ্রত্যক্ষ, অতিপ্রাকৃত বা কল্পিত বিষয় প্রবেশ করে, এই ভয়ে তিনি বারম্বার কেবল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণেরই উল্লেখ ও আলোচনা করিয়াছেন, স্বরূপ-লক্ষণের কথা বেশী কহেন নাই। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা যে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁহার স্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। এই ব্রহ্ম অজ্ঞেয় কিম্বা কেবল

সত্তামাত্র-জ্ঞেয়। এই ব্রহ্মতত্ত্ব অনেকটা আধুনিক ইউরোপীয় অজ্ঞেয়তা-বাদেরই মতন unknown এবং unknowable—হার্বার্ট স্পেন্সার যে অজ্ঞেয়তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, কেবলমাত্র তটস্থ লক্ষণের দ্বারা যে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা অনেকটা ইহারই অনুরূপ। রাজা যে পরব্রহ্মকে" উপাস্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, "তিনি কি প্রকার?"—এই প্রশ্ন হইলে, উত্তরে কহিতেছেন :—

> তোমাকে পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে যিনি এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা তিনিই উপাস্য হন, ইহার অতিরিক্ত তাঁহার নির্দ্ধারণ করিতে কি শ্রুতি কি যুক্তি সমর্থ হন না।....তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন এবং যুক্তিসিদ্ধও ইহা হয়, যেহেতু এই জগৎ প্রত্যক্ষ অনন্ত, ইহার স্বরূপ ও পরিমাণকে কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন না, সুতরাং এই জগতের কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি লক্ষিত হইতেছেন তাঁহার স্বরূপ ও পরিমাণের নির্দ্ধারণ কি প্রকারে সম্ভব হয়?

বেদান্তগ্রন্থের ভূমিকাতেও এই কথাই কহিয়াছেন।—"ইহার (অর্থাৎ বেদান্তগ্রন্থের) দৃষ্টিতে জানিবেন যে, আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব্ব পরম্পরার এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন।" পুনরায় কহিতেছেন যে, "যে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় নহে কিন্তু তাঁহার উপাসনা-কালে তাঁহাকে জগতের পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা লক্ষ্য করিতে হয়, তাহার কল্পনা কোন নশ্বর নামরূপে কিরূপ করা যাইতে পারে? সর্ব্বদা যে সকল বস্তু যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি আমরা দেখি ও তাহার দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন করি তাহারো যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি না; ইহাতেই বুঝিবে যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাঁহার স্বরূপ কিরূপে জানা যায়।"

কিন্তু তাই বলিয়া রাজা যে স্পেন্সারের মতন অজ্ঞেয়তাবাদী বা agnostic ছিলেন, এমন মনে করা কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মের স্বরূপজ্ঞান ও স্বরূপ-উপাসনা সম্ভব, রাজা ইহা বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু অন্য বিষয়ে যেমন, এখানেও সেইরূপ অধিকারী-অনধিকারী বিচার আছে। সকলের পক্ষে এই স্বরূপ জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। আপামর সাধারণের পক্ষে ইহা একরূপ অসাধ্য। কারণ শ্রুতিই কহিতেছেন (কঠ—৪র্থ—১)—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ
তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ
দাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্॥

রাজা এই শ্রুতির অনুবাদ করিয়াছেন :—

স্বপ্রকাশ যে পরমাত্মা তেঁহ ইন্দ্রিয় সকলকে রূপ রস ইত্যাদি বাহ্য বিষয়ের গ্রহণের নিমিত্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এই হেতু লোক সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য বিষয়কে দেখেন, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পারেন না। কোন বিবেকী পুরুষ মুক্তির নিমিত্ত বাহ্যবিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে নিরোধ করিয়া অন্তরাত্মাকে দেখেন।

অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয় সকলের একান্ত নিরোধ না হইলে, জীবের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয় না। যে অবস্থায় বহিরিন্দ্রিয়ের এরূপ একান্ত নিরোধ হয়, আমাদের শাস্ত্রে তাহাকেই সমাধি কহিয়াছেন। রাজা সমাধিতে বিশ্বাস করিতেন। সমাধিতে ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়, ইহাও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে রাজা স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন যে স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি গুণের দ্বারা ব্রহ্মের যে নির্দ্দেশ করা হয় "সে কেবল প্রথমাধিকারীর বোধের নিমিত্ত।" এইরূপে তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্ম নির্ণয় করিয়া তাঁহার চিন্তা ও

অনুশীলন করিতে করিতে ক্রমে তাঁর স্বরূপজ্ঞান উপলব্ধি হইয়া থাকে। সে স্বরূপ-জ্ঞানে ব্রহ্মকে সত্যং জ্ঞানম্ অনন্ত রূপে প্রতীত হয়। বেদান্ত-সূত্রের অনুবাদে রাজা কহিয়াছেন :—

> ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্য-রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায়।

ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারে স্বরূপ-সাক্ষাৎকার বা আত্মসাক্ষাৎকার কাহাকে বলে, তাহা আরও একটু বিশদ করিয়া কহিয়াছেন :—

> বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দ্বারা যে আমরা পরমেশ্বরের আলোচনা করি সেই পরম্পরা উপাসনা হয়। আর যখন অভ্যাসবশতঃ প্রপঞ্চময় বিশ্বের প্রতীতির নাশ হইয়া কেবল ব্রহ্মসত্তা মাত্রেরই স্ফুর্ত্তি থাকে তাহাকেই আত্ম-সাক্ষাৎকার কহি।

এই স্বরূপ-জ্ঞান কেবল সমাধিতে লাভ করা যায়। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার উদয় হইলে, সাধক প্রথমে জগতের কারণ ও নির্ব্বাহক রূপে ব্রহ্মের চিন্তা করিবেন। বহুতর লোকের পক্ষে ইহাই কেবল সম্ভব। তবে "সমাধি বিষয় ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।" কিন্তু এই সমাধির শক্তিলাভ অতিশয় কঠিন সাধন সাপেক্ষ বলিয়া অতি অল্প লোকেই এই স্বরূপ উপাসনার অধিকার লাভ করেন। অধিকাংশ লোকে কেবল তটস্থ লক্ষণ দ্বারা, জগতের কারণ ও নির্ব্বাহ কর্ত্তারূপেই ব্রহ্মের উপাসনা করিতে পারেন। তাঁহাদের পক্ষে এই উপাসনাই প্রত্যক্ষের সঙ্গে যুক্ত ও সাক্ষাৎ অনুভূতি প্রতিষ্ঠ হইয়া সত্য হয়। যাঁহারা সমাধির শক্তি লাভ করেন নাই, তাঁহাদের পক্ষে স্বরূপ-উপাসনার প্রয়াস নিশ্চয়ই বস্তুজ্ঞানহীন অলীক মানস কল্পনাতে পরিণত হইবে। তাহারা মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ না করিলেও মানসী কল্পনার সৃষ্টি করিয়া অসত্যের উপাসনা করিবেই করিবে।

এই জন্য রাজা সাধারণ লোকের নিমিত্ত তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া, জগতের স্রষ্টা পাতা ও সংহর্ত্তারূপে তাঁহার চিন্তা করিবারই বিধান দিয়াছেন।

আর এই উপাসনা সকলের পক্ষেই উপযোগী। যে যে ধর্ম্মমত পোষণ করুক না কেন, আপনার উপাস্যকে স্রষ্টা পাতা ও সংসারের প্রভু ও নিয়ন্তা বলিয়া বিশ্বাস করে। সুতরাং জগতের যিনি আদি কারণ তাঁহাকে কেবল স্রষ্টা পাতা ও নিয়ন্তারূপে ধ্যান করিলে সকলেরই নিজ নিজ উপাস্যের ভজনা হয়, অথচ এখানে কাহারও সঙ্গে কাহারও কোন বিরোধ উপস্থিত হয় না। এইটিই সার্ব্বজনীন ঈশ্বর-তত্ত্ব ও এই ঈশ্বর-তত্ত্বের এরূপ ভজনাই সার্ব্বজনীন ভজনা। এই সার্ব্বজনীন ঈশ্বর-তত্ত্বের আশ্রয়ে, এই সার্ব্বজনীন ভজনার প্রতিষ্ঠা করিয়া, যাহাতে সকল ধর্ম্মের, সকল সম্প্রদায়ের সকল লোকে এক উদার ও বিশাল মিলনভূমিতে একত্রিত হইয়া, নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মত ও বিশ্বাস, আচার ও অনুষ্ঠানাদিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, এক পরমেশ্বরের ভজনা করিতে পারেন, তাহারই জন্য রাজা ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

এই ব্রহ্মসভা কোনও নূতন ও বিশিষ্ট ধর্ম্মমত বা ধর্ম্মসাধনের প্রতিষ্ঠা করে নাই। ইহা হিন্দুর দেউল, খৃষ্টীয়ানের গির্জ্জা, মুসলমানের মসজিদ, বা বৌদ্ধ ও পারসী, শিণ্টো ও কনফুচীয় প্রভৃতি ধর্ম্মের বা সম্প্রদায়ের ভজনালয়কে ভাঙ্গিয়া, তাহাদের স্থান অধিকার করিতে চাহে নাই। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাবে যেখানে, যেভাবে, যে নামে, যে উপকরণেই আপন আপন উপাস্যের পূজা করুক না কেন, সকলে যাহাতে ধর্ম্মের সাধারণ ও সার্ব্বভৌমিক লক্ষণের প্রতি মনোনিবেশ করিয়া, একটা সাধারণ ও সার্ব্বজনীন ক্ষেত্রে সম্মিলিত হইয়া, সাধারণ ও সার্ব্বজনীনভাবে জগতের যিনি একমাত্র কারণ ও নিয়ন্তা, তাঁহার ভজনা করিতে পারে, ব্রহ্মসভা তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দেয়। ব্রহ্মসভার

আকারে রাজা একটি সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মক্ষেত্র ও ভজনের স্থান প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন।

ইহাই যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের পরিপূর্ণ আদর্শ বা চরম লক্ষ্য এমন নহে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে যে সকল বৈশিষ্ট্য ফুটিয়াছে, তাহাকে বাদ দিলে ধর্ম্মের যে সাধারণ তত্ত্ব বা লক্ষণটুকু বাকি থাকে, তাহা অতি সামান্য। তাহার দ্বারা সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বা least common multiple মাত্র প্রাপ্ত হই, গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনিয়ক বা Greatest Common Measure প্রাপ্ত হইতে পারি না। ইহার মধ্যে ধর্ম্মের যে সার্ব্বভৌমিকতা প্রাপ্ত হই তাহাতে ধর্ম্মবস্তুর লঘুতম লক্ষণ ও ক্ষুদ্রতম আকার মাত্র প্রত্যক্ষ করি, তাহার শ্রেষ্ঠতম লক্ষণ বা বিকাশ যে কি, তার সন্ধান পাই না। সদ্যোজাত শিশুর মধ্যে সার্ব্বভৌমিক যে মনুষ্যত্ব বস্তু তার কতটুকুই বা প্রত্যক্ষ হয়! মানব শিশুতে যতটুকু মনুষ্যধর্ম্ম প্রকাশিত হয়, তাহাকে ধরিয়া মনুষ্যত্ব বস্তুর স্বরূপ আমরা কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। প্রকৃত মনুষ্যত্ব বস্তু কি ইহা দেখিতে হইলে শ্রেষ্ঠতম মানুষকে দেখিতে হয়। শিশুতে মনুষ্যত্ব অতি অস্ফুট বীজাকারে বা অঙ্কুরাকারে মাত্র প্রত্যক্ষ হয়। এই বীজ যে মানুষে পরিপূর্ণ রূপে ফুটিয়াছে, তাহাতেই কেবল মনুষ্যত্বের পূর্ণ লক্ষণ ধরিতে পারি। সার্ব্বভৌমিক যে মনুষ্যত্ব বস্তু তার সত্য স্বরূপ পরিপূর্ণ মানুষেই প্রকট হয়, শিশুতে হয় না। সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইহাই সত্য। রাজা যে সূত্র ধরিয়া জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে একটা ঐক্য স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে ধর্ম্মের বীজাঙ্কুর মাত্র প্রত্যক্ষ হয়, পরিপূর্ণ প্রস্ফুট ধর্ম্মবস্তুকে পাওয়া যায় না। রাজার এই সূত্র অবলম্বনে আদিম অবস্থার প্রেতপূজা, নিসর্গ-পূজা, পশুপক্ষী গিরি নদী প্রভৃতির পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্ভক্তি পর্য্যন্ত ধর্ম্মের সকল অবস্থার, সকল

প্রকাশের মধ্যে যে অতি সামান্য ঐক্যটুকু আছে তাহাই কেবল ধরিতে পারি। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব যে অপূর্ব্ব উন্নতি ও বিকাশ লাভ করিয়াছে, তার সন্ধান খুঁজিয়া পাই না। অথচ ধর্ম্মের এই সকল বিশেষ বিশেষ প্রকাশ বাদ দিলে তার পরিপূর্ণ সত্য ও মাহাত্ম্য কিছুই রক্ষা পায় না।

রাজা যে এ সকল কথা ভাবেন নাই বা বুঝেন নাই, এমন কল্পনাও করা সম্ভব নয়। বেদান্তে যে সকল তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও পরোক্ষভাবে "কার্য্য দেখিয়া কর্ত্তার চিন্তন"—রূপ যে উপাসনা উপদেশ দিয়াছেন, ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠায় রাজা তাহাই কেবল অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা সত্য। কিন্তু স্বরূপোপাসনা যে সম্ভব ইহাও তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। তবে কেবল শ্রেষ্ঠতম অধিকারী, যাঁহারা সমাধির শক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই স্বরূপ উপাসনা করিতে পারেন, অপরের পক্ষে ইহা অসাধ্য বলিয়া অবিহিত। সুতরাং রাজা যে তত্ত্ব ও উপাসনা প্রচার করিয়াছিলেন তাহা যে ধর্ম্মের শেষ কথা বা শ্রেষ্ঠতম অবস্থা নহে, ইহা তিনি বেশ জানিতেন। আজিকালিকার ধর্ম্মবিজ্ঞান যেরূপে যতটা পরিষ্কার ভাবে ধর্ম্মের বিকাশ-ক্রমটির সন্ধান পাইয়াছে, ডারুইন-প্রচারিত অভিব্যক্তিবাদের মূল তত্ত্বের আশ্রয়ে ধর্ম্মের যে ঐতিহাসিক ধারার কথা আধুনিক পণ্ডিতেরা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং এই সকল অভিনব আবিষ্কার ও চিন্তার ফলে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের যে তত্ত্ব আজকাল প্রকাশিত হইতেছে, রাজার সময়ে তাহা হয় নাই। কিন্তু তথাপি রাজা আপনার অনন্যসাধারণ মনীষা প্রভাবে, আমাদের দেশের প্রাচীন বৈদান্তিক সাধনের অনুশীলনের দ্বারাই ধর্ম্মেরও যে ক্রমোন্নতি হয়, ইহা পরিষ্কাররূপে ধরিয়াছিলেন। বেদান্তে একদিকে "ক্রম-মুক্তি"র ও অন্যদিকে "পরম্পরা-উপাসনার" কথা কহিয়াছেন।

রাজা এই "পরম্পরা-উপাসনার" সূত্রটি অবলম্বন করিয়াই তাঁর সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মতত্ত্ব ও উপাসনা তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তটস্থ লক্ষণের দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া, এই "অচিন্ত্য-রচনা-বিশ্বের" আশ্রয়ে অচিন্ত্য শক্তিশালী ও অনির্ব্বচনীয় গুণসম্পন্ন, অবাঙ্মনসো গোচর পরমেশ্বরের চিন্তার দ্বারা উপাসনা প্রচার করিয়া, রাজা জগতের যাবতীয় ধর্ম্মের একটি সাধারণ মিলনসূত্র মাত্র দেখাইয়া দেন। কিন্তু এইখানেই ধর্ম্ম সাধনের শেষ হইল, এমন কথা তিনি বলেন নাই, ভাবেন নাই, কল্পনাও করেন নাই। বরঞ্চ তিনি সাধারণভাবে এই উপাসনাতে অপর সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সঙ্গে মিলিত হইয়াও, প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীকে তাহার নিজের শাস্ত্র ও সাধন অনুযায়ী আপন আপন সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ও ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। একদিকে যেমন তিনি স্বদেশবাসী হিন্দুসাধারণকে বেদান্তসম্মত ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, অন্যদিকে সেইরূপ বিদেশীয় খৃষ্টীয়ান সাধারণকে বাইবেলসম্মত ঈশ্বরোপাসনাতেই প্রেরিত করেন। তিনি খৃষ্টীয়ানকে বৈদান্তিক হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে, কিম্বা হিন্দুকে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে কহেন নাই। কেবল কি হিন্দু, কি খৃষ্টীয়ান সকলকেই নিজ নিজ প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে আপন আপন ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলিতে উপদেশ দিয়া দিলেন।

জগতের ভিন্ন ভিন্ন প্রাচীন ঐতিহাসিক ধর্ম্মেতে যে সকল বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারও মধ্যে সত্য আছে; সাধকগণের প্রত্যক্ষ অনুভূতির আশ্রয়েই এসকল বৈশিষ্ট্যেরও প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু এসকল গভীরতর ও গভীরতম সত্যের সাক্ষাৎকারলাভ জনসাধারণের ভাগ্যে ঘটে না। এসকল অনুভূতিলাভ বহু-সাধন-সাপেক্ষ। জনসাধারণের সে সাধন নাই। সুতরাং তাহাদের পক্ষে এসকল

গভীরতম তত্ত্ব অজ্ঞেয় ও অবোধ্য। যাহার অনুভূতি হয় নাই, তাহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে বিচারের যথাযোগ্য অবসরও মিলে না। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অনুমান অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে অনুমানের আশ্রয় লইলে মিথ্যা কল্পনার সৃষ্টি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। শ্রেষ্ঠতম অধিকারীর সাধকেরা যে সকল নিগূঢ়তম তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, এবং শাস্ত্রাদিতে যে সাক্ষাৎকারের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, সাধারণ নিম্নতম অধিকারীর সাধকেরা সেই সকল ধর্ম্মেই অনেক প্রকার অলীক কল্পনার সৃষ্টি করিয়াছেন। একের প্রত্যক্ষ অপরের প্রত্যক্ষের সঙ্গে সর্ব্বদাই মিলে, মিলিবে। ইহা যেমন সত্য ও অনিবার্য্য, সেইরূপ পরস্পরের কল্পনার অমিল হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। তবে পুরাগত সংস্কার-বদ্ধ হইয়া যেসকল কল্পনা পুরুষানুক্রমে কোনও জাতির অস্থিমজ্জাগত হইয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে এরূপ অমিল হয় না ও হইবার আশঙ্কা অল্প। কিন্তু এখানে ব্যষ্টিভাবে একজাতির অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির একে অন্যের কল্পনার মধ্যে মিল দেখিতে পাওয়া গেলেও, সমষ্টিভাবে অপর জাতির কল্পনার সঙ্গে সেরূপ মিল হয় না, হওয়াও অসম্ভব। আমাদের দেশের লোকেরা বিশেষ মানসিক অবস্থাধীনে, অর্থাৎ ধ্যানের বা সমাধির অবস্থায়, কালীদুর্গা কিম্বা রাধাকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ করেন। খৃষ্টিয়ানরা যীশুকে কিম্বা এঞ্জেলদিগকে দেখিয়া থাকেন। সেইরূপ মুসলমানেরা ঐ অবস্থায় হজরত মহম্মদকে কিম্বা আলীকে কিম্বা কোনও পীরকে দেখিয়া থাকেন। কোনও ইউরোপীয় খৃষ্টীয়ান যদি রাধাকৃষ্ণকে দেখিতে পাইতেন, কিম্বা কোনও হিন্দু যদি যীশুখৃষ্টকে দেখিতে পাইতেন, অথবা আরবদেশের কোনও মুসলমান যদি শিবদুর্গার প্রত্যক্ষলাভ করিতেন, তাহা হইলে এসকল অনুভূতিকে সত্য অর্থাৎ বস্তুতন্ত্র মনে করা সম্ভব হইত। কারণ একজনের যেবস্তু সাক্ষাৎকারে যে অনুভূতি

হয়, সে বস্তু সাক্ষাৎকারে অপরের সেই অনুভূতি হইবেই হইবে। আমাদের দেশের সাধকেরা ভগবানের এসকল দেবতারূপ ধারণকে মায়িক বলিয়াছেন, সাধকের তৃপ্ত্যর্থে ভগবান এসকল রূপ-ধারণ করেন। মায়াপ্রভাবে তিনি এসকল রূপ ধরিয়া সাধকের সমক্ষে উপস্থিত হন। এই মায়া, ইন্দ্রজাল, মিথ্যাকে সত্যরূপে দেখান। বাজিকরেরা এইরূপ অবস্তুকে বস্তুরূপে, একবস্তুকে অন্যবস্তু রূপে দেখাইয়া থাকে। ইহারা দর্শকের দৃষ্টিভ্রম উৎপাদন করে, তাহার বুদ্ধিকে মোহিত করিয়া অসত্যে সত্য বোধ জন্মায়। ভগবানও তবে এইরূপই সাধকের তৃপ্তির নিমিত্ত তাহার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া এসকল দৃষ্টিভ্রম উৎপাদন করেন। একথা মানিলেও ভগবানের অসীম করুণারই প্রমাণ হয়, সাধক যাহা দেখেন তাহা যে সত্য ইহার প্রমাণ হয় না। বরঞ্চ তদ্বিপরীতই প্রমাণ হয়। আর এসকল কল্পনার যেরূপ ব্যাখ্যাই করিনা কেন, এই কল্পনার ভূমিতেই যে জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মেতে যাবতীয় ভেদবিরোধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যোগ-সমাধি প্রভৃতি সাধনের উচ্চভূমিতে আবার এসকল কল্পনার জন্ম হয়। এই জন্যই রাজা এসকলকে উপেক্ষা করিয়া, ধর্ম্মতত্ত্বকে ও ধর্ম্মসাধনকে জনগণের সাধারণ অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ অনুভূতির উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায়, "প্রথমাধিকারীর বোধের নিমিত্ত" ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র

এক

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত-চিত্র লিখিতে বসিয়া আজ নব-পর্য্যায় 'বঙ্গ-দর্শনের' শেষ সম্পাদক প্রিয় সুহৃৎ শৈলেশচন্দ্রের কথা বারবার মনে পড়িতেছে। এক বৎসর হয় নাই, শৈলেশচন্দ্র বঙ্গ-দর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত-চিত্র লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। বহুদিন হইতেই তাঁর এই সাধ ছিল। বঙ্গ-দর্শনে রবীন্দ্রনাথের চরিত-চিত্র প্রকাশিত হইবার পরেই দু' চারিজন প্রাচীন ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি চরিতালেখ্য লিখিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। শৈলেশ-চন্দ্র বাঁচিয়া থাকিলে ইতিপূর্ব্বেই আমাকে এ কাজে হাত দিতে হইত। আজ শৈলেশচন্দ্র এ লোকে নাই। তিনি যেখানেই থাকুন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়াই আমি তাঁর সাধের বঙ্কিম চরিত-চিত্র অঙ্কনে প্রবৃত্ত হইলাম।

নিজের সাধ এবং অপরের অনুরোধ সত্ত্বেও এতাবৎকাল বঙ্কিমের চরিতালেখ্য রচনায় প্রবৃত্ত হই নাই; কারণ, সাহসে কুলাইয়া উঠে নাই। ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় না থাকিলে, কাহারও যথাযথ চরিতালেখ্য অঙ্কন করা সহজ নয়; সম্ভব কিনা তাহাই অনেক সময় সন্দেহ হয়। বঙ্কিম চন্দ্রের সঙ্গে দু' চারবার সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল বটে; কিন্তু সে সামান্য পরিচয়ে মানুষকে চেনা যায় না। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমকে বাঙ্গালা দেশের কে না জানে? বাল্য অতিক্রম করিতে না করিতেই, তাঁর গ্রন্থের সঙ্গে আমারও পরিচয় আরম্ভ হয়। যে বয়সে আমাদের দেশে, পুত্র পিতার মিত্র হইয়া থাকে, সেই বয়সেই বঙ্গ-

প্রকাশ

দর্শনের পৃষ্ঠায় মাসে মাসে বঙ্কিমের মানস সৃষ্টি সকলের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত হয়। বুঝিতাম না, কিন্তু পড়িতাম। অথবা বুঝিতাম নাই বা বলি কেমনে? আপনার অধিকার অনুযায়ী যাহা পড়িতাম, তাহা বুঝিতাম বই কি? না বুঝিলে তাহাতে এমন রস পাইতাম না। আর দুর্গেশনন্দিনী বা কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী বা চন্দ্রশেখর, ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুলের সভা কিম্বা উত্তররাম-চরিতের সমালোচনা, এগুলি ত স্কুল কলেজের পাঠ্য ছিল না যে বুঝি আর না বুঝি, রস পাই আর না পাই, ষ্টাটিক্‌সের থার্ড সিষ্টেম অব্ পুলির (Third System of Pulley'র) মতন, "রোগী করত বৈসে ঔষধ পান", তেমনি করিয়া গলাধঃকরণ করিতেই হইত। স্কুলের বই ছাড়িয়া বঙ্কিমের লেখা পড়িতাম। কলেজে আসিয়া,—তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের এখনকার ঐশ্বর্য্যও ছিল না বন্ধনও ছিলনা,—চারিদিকে খোলা মাঠ আর মাঠের পরেই রাজপথের ওপারে যোগেশচন্দ্রের ক্যানিং লাইব্রেরী—কলেজ হইতে পলাইয়া রাজকৃষ্ণবাবু ও হাণ্ড সাহেবকে ফাঁকি দিয়া, যোগেশবাবুর কৃপায় তাঁর দোকানে বসিয়া দিনের পর দিন বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল রসসৃষ্টি প্রাণ ভরিয়া ভোগ করিতাম। রসবস্তু কি, তখন ইহা জানিতাম না। সাহিত্যের উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করিবার পাণ্ডিত্য এখনও জন্মায় নাই, তখন ত ছিলই না। তবে সে পিপাসাটা প্রবলই ছিল। আর রসের জ্ঞান না থাকিলেও, সহজ রসানুভূতির শক্তিটা বিধাতা যেমন দিয়াছিলেন, সেইরূপই ছিল; মানুষের শিক্ষার তাড়নায় কখনও তার বিচক্ষণতা জন্মায় নাই। যাহা ভাল লাগিত, তাহাকেই ভালবাসিতাম। যাহা ভাল লাগিত না, তাহাকেই মন্দ ভাবিতাম। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার আর কি দোষ গুণ আছে জানি নাই, বুঝি নাই; কিন্তু বড় মিষ্ট লাগিত, এ কথাটা এখনও মনে আছে। আর মিষ্ট লাগিত বলিয়াই সেগুলি খুব পড়িতাম। যখন যেটি প্রকাশিত হইত, তখনই সেটি

পড়িয়াছি। সে-পড়ার প্রভাব মন হইতে আজি পর্য্যন্ত ধুইয়া যায় নাই।

সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহিত্যিক-চরিত্র

এরূপ ভাবে, বাঙ্গালা দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত লক্ষ লক্ষ লোকের মতন, আমিও সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে আযৌবনই জানিয়াছি। কিন্তু এত তাঁর বাহিরের দিক; তাঁর সত্তার দিক নয়, তাঁর প্রকাশের দিকমাত্র। এ সকল তাঁর রূপ, স্বরূপ ত নয়। রূপের অন্তরালে স্বরূপাদি সর্ব্বদাই লুকাইয়া থাকে, সত্য। কিন্তু রূপের ভিতর দিয়া স্বরূপে যাওয়া যায় না। প্রকাশের ভিতরে বস্তুর বাহিরটাই দেখা যায়। রূপের মধ্যে স্বরূপের তটস্থ লক্ষণমাত্র প্রকাশিত হয়। সৃষ্টিকে দেখিয়া স্রষ্টাকে যতটুকু জানা যাইতে পারে, সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যেও সাহিত্যিককে ততটুকুই জানা সম্ভব। কিন্তু সৃষ্টি দেখিয়া স্রষ্টার সত্য-জ্ঞান লাভ অসম্ভব। এ জ্ঞান পরোক্ষ, অপরোক্ষ নয়। ইহা অল্পবিস্তর অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত, প্রত্যক্ষের উপরে নহে। অনুমিত জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয় না; প্রত্যক্ষের প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টি দেখিয়া তাঁর সম্বন্ধে যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহা অনুমানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অনুমান সত্য হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। অনুমানের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করা যায় না। এইজন্য কেবল তাঁর গ্রন্থাদি পড়িয়া সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের একটা স্বল্লাধিক মনগড়া ছবি আঁকা সম্ভব হইলেও, সত্যকার মানুষটি যে তিনি কেমন ছিলেন, তার প্রতিকৃতি পরিস্ফুট করা সহজ ত নয়ই, সম্ভব কি না তাই সন্দেহ। এই মানুষটিকে ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার সুযোগ কখনও ঘটে নাই। খালি গায়ে কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। খোলাপ্রাণে কথা-বার্ত্তা কহিতে কখনও শুনি নাই। সুখেতে তিনি কতটা বিহ্বল, দুঃখেতে কতটা অবসন্ন হইতেন; প্রাপ্তিতে তাঁর কতটা আনন্দ, অপ্রাপ্তিতে কতটা

তাহার

বিবাদ হইত; প্রশংসায় কতটা কাঁপিয়া উঠিতেন, স্তুতিবাদে কতটা গলিয়া পড়িতেন, আবার অপ্রশংসায় ও নিন্দাতে কতটা উগ্র বা উত্তেজিত হইতেন; সংসারের বহুবিধ সম্বন্ধেতে তিনি কখন কোন্ মূর্ত্তি ধারণ করিতেন;—এগুলি ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া না দেখিলে, মানুষটি যে কেমন ছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া ধরা সম্ভব নয়। বাঙ্গালার লক্ষ লক্ষ লোকে সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকেই কেবল একটু আধটু চেনে, মানুষ বঙ্কিমচন্দ্রকে চেনে না। অথচ সেটিকে না চিনিলে, তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির নিগূঢ় এবং যথার্থ মর্ম্মও গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই জন্যই সাহিত্য সমালোচনায় সাহিত্যিকের খাঁটি চরিত্রটি যথাসম্ভব জানা ও ধরা এত আবশ্যক।

এই ব্রহ্মাণ্ডকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, মানুষ কত অগণ্য যুগ হইতে তাঁহার এই বিচিত্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহাকে বুঝিতে ও জানিতে প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু কিছু জানিয়াছে কি? স্রষ্টাতে আমরা যে সকল শ্রেষ্ঠ গুণ আরোপ করিয়া তাঁহার স্তুতি বন্দনা করি, সৃষ্টি কার্য্যের আলোচনাতে তার পরিতোষ প্রমাণ পাওয়া যায় কি? আমাদের প্রাচীন লোকায়তগণ, ইউরোপের আধুনিক যুক্তিবাদী ও জড়বাদিগণ—সকলেই এ পথে যাইয়া, কেহ বা প্রকাশ্য আর কেহ বা প্রচ্ছন্ন নাস্তিক্যে পৌঁছিয়াছেন। স্রষ্টাকে দয়াময় বল; সৃষ্টির নিরবচ্ছিন্ন জীবন-সংগ্রামের শোণিত-প্রবাহে দয়ার চিহ্ন কোথায়? স্রষ্টাকে মঙ্গলময় বল, রোগ শোক পাপতাপ জর্জ্জরিত সংসারে মঙ্গলই বা কি? এই পথে ঈশ্বর জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি করিতে যাইয়াই ইংরাজ মনীষী জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল—জগৎস্রষ্টা মঙ্গলময় হইলে সর্ব্বশক্তিমান নহেন, কিম্বা সর্ব্বশক্তিমান হইলে সর্ব্বমঙ্গলময় নহেন,—এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। সৃষ্টির ভিতরে তার সকল বিরোধের নিষ্পত্তি, তার সকল সমস্যার মীমাংসা, তার সকল সত্তার বা ক্রিয়ার সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তটস্থ

লক্ষণের দ্বারা ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা না করিয়া, আত্মজ্ঞানের দ্বারা, অপরোক্ষ অনুভূতিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে পরে, সেই স্বরূপের সাহায্যে এই বিচিত্র বিশ্বরূপের মর্ম্মোদ্ঘাটনে নিযুক্ত হইলেই কেবল সৃষ্টির সত্য অর্থ বুঝা সম্ভব হয়। সৃষ্টির দ্বারা স্রষ্টাকে সত্যভাবে জানা যায় না। স্রষ্টার ভিতর দিয়া তাঁর সৃষ্টিকে যিনি দেখিতে পারেন, কেবল তিনিই সৃষ্টি ও স্রষ্টা উভয়ের যথার্থ তত্ত্ব ও স্বরূপ নিরূপণ করিতে সমর্থ হন। জগৎ-স্রষ্টাকে যেমন করিয়া জানিতে হয়, সাহিত্যস্রষ্টাকেও সেইরূপ করিয়াই জানিতে হয়। আগে মানুষটাকে জানি, চিনি, বুঝি; তারপরে তিনি কিভাবে কি করিয়াছেন, কি উদ্দেশ্যে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, কি বলিতে চাহিয়াছেন, আর কতটাই বা তাহা বলিতে পারিয়াছেন, কোথায় তিনি পরিপূর্ণ সফলতা, কোথায় আংশিক সফলতা, আর কোথায়ই বা একান্ত নিষ্ফলতা লাভ করিয়াছেন, ইহা ধরিতে বুঝিতে এবং প্রমাণ প্রয়োগে অপরকে বুঝাইতে পারা যাইবে। ইহাই সাহিত্য-স্রষ্টার চরিতালেখ্য রচনার মুখ্য প্রয়োজন।

সাহিত্য ও জীবন

স্রষ্টাকে না জানিলে, তাঁর সৃষ্টির সকল রহস্যভেদ ও সকল রসভোগ সম্ভব হয় না। সেইরূপ সাহিত্যের সৃষ্টি যাঁরা করেন, তাঁহাদিগকে ভাল করিয়া না জানিলে, তাঁহাদের সৃষ্ট সাহিত্যেরও সকল রহস্য ভেদ ও সকল রস সম্ভোগ করা যায় না। সাহিত্য সমালোচনায় সাহিত্যিকের জীবন-চরিতের বিচার ও আলোচনা এই কারণেই অতিশয় আবশ্যক। অথচ লোকে অনেক সময় সাহিত্য পড়িতে যাইয়া সাহিত্যিকের জীবনের খোঁজ করে না। এদেশে পুরাকাল হইতেই, মনে হয়, এ পদ্ধতি অবলম্বিত হয় নাই; কোন কালে হইয়া থাকিলেও, আমরা যে যুগের সাহিত্য-চর্চ্চার সংবাদ পাইয়াছি, সেকালে তাহা লোপ পাইয়াছিল। এই জন্যই আমরা কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, মেঘদূত বা

কুমার

শকুন্তলার গঠন-পাঠন কালে, কালিদাস কোথাকার, কোন্ সময়ের কি প্রকৃতির লোক ছিলেন; তাঁর সংসার-জীবন ও ধর্ম্ম-সিদ্ধান্ত কিরূপ ছিল, তাঁর নৈসর্গিক ও সামাজিক আধার ও আবেষ্টনই বা কি ছিল, কোন্ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আশ্রয়ে তাঁর অলৌকিক কবি-কল্পনা ফুটিয়া ও গড়িয়া উঠিয়াছিল, তিনি হিমালয়ের কোন্ অংশের, কোন্ ছবির, কোন্ রূপের, কোন্ ভাবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, কোন্ বাস্তব ঘটনার বা রসানুভূতির উপরে তাঁর চিত্রিত কাব্য-কলার অপূর্ব্ব রসসকল স্ফুরিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, এ সকল কোন দিন জানিবার জন্ত ব্যাকুল হই নাই। তাঁর কাব্য-সৃষ্টিতে আমরা কেবল কল্পনারই খেলা দেখি; দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হই। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কল্পনা যে সত্যকে ছাড়িয়া জন্মে না, এ কথাটা ভুলিয়া যাই। ভুলিয়া যাই বলিয়াই, বোধ হয়, কালিদাসের সকল কথার ভিতরকার মর্ম্মও সকল সময়ে ধরিতে পারি না। কালিদাসকে যদি আমরা ভাল করিয়া জানিতাম, মানস-কল্পনাতেও যদি এই অমর কবির একটি জীবন্ত প্রতিচ্ছবি আঁকিতে পারিতাম, তাহা হইলে তাঁর সৃষ্টিসকল আমাদের চক্ষের সামনে একেবারে সজীব হইয়া ফুটিয়া উঠিত। তাঁর হিমালয়, তাঁর মেনকা, তাঁর মহাদেব, তাঁর পার্ব্বতী, আমাদের নিকট কেবল আকাশের দেবতা হইয়াই চিরদিন পড়িয়া রহিতেন না, কিন্তু তাঁর এ সকল কাব্য পড়িবার সময়, ইহারা ঘরের মানুষ হইয়া, চক্ষের সম্মুখে চলিতে ফিরিতে আরম্ভ করিতেন। এখনও যতটুকু বুঝি ও সম্ভোগ করি, তাহা ইহাদের অতিমানবতা নহে, মানবতা মাত্র। রতি-বিলাপের রতি কামদেবের কেবল পত্নী নহেন; কিন্তু আমাদের ঘরের, সমাজের চিরপরিচিতা পতিবিয়োগবিধুরা আদরিণী মাত্র। স্বামীর সোহাগে তাঁর পাতিব্রত্যের প্রকৃতি একান্ত স্বামীগত না হইয়া কতকটা আত্মগত হইয়া পড়িয়াছে। কত সোহাগিনী এই ভাবে স্বামীতে আপনাকে

ডুবাইতে না পারিয়া, স্বামীর গুণেই স্বামীকে নিজের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিতেছেন। রতি চিতারোহনোন্মত্তা হইয়াও আত্মসুখাভিমানিনী। এ চিত্র কালিদাস কোথা হইতে পাইলেন, আমরা ঠিক জানিনা। জানিনা, বলিয়াই, খুঁটিনাটি ধরিয়া তার বিচার আলোচনাও ধরিতে পারি না। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের অভাবে তার পরিপূর্ণ রসবোধও সম্ভব হয় না। সেইরূপ কোন্ মানবী কালিদাসের উমার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিচ্ছায়া ছিলেন, কোন্ মহাযোগীই বা তাঁর মহাদেবকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, কোন্ বিরহী তাঁর মেঘদূতের মূল চরিত্র, কোন্ রাজাই বা তাঁর দুষ্মন্ত ও দিলীপ, কোন্ রমণীকে দেখিয়াই বা তিনি তাঁর শকুন্তলাকে আঁকিয়াছেন, এ সকলের কোনও সন্ধান আমরা রাখি না, জানিনা; কালিদাসের জীবনের কোন্ অঙ্কে, কি সম্বন্ধের ভিতরে এ সকল রসমূর্ত্তির মূল আদর্শ ভাসিয়া উঠিয়াছিল, তাহা জানিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। এইজন্য তাঁর কাব্যকে আমরা কেবল বাহির হইতেই দেখি; তাঁর কাব্যকলার অন্তঃপুরের খবর কিছুই রাখি না ও জানি না। যে প্রণালীতে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ পুরাতন বাইবেলের কলা-সৃষ্টির ভিতর হইতে প্রাচীন ইহুদীয় জাতির একটা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছেন, এ দেশের প্রাচীনকালের ও মধ্যযুগের কবিকল্পনার ভিতর হইতে যদি কখনও কোনও ভারতীয় মনীষী যে যে যুগে এ সকল কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছিল, তৎ তৎ যুগের এক একটি স্বল্পবিস্তর প্রামাণ্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাস না হউক, অন্ততঃ এক একটি ঐতিহাসিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে পারেন, তাহা হইলে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণাদির এবং কালিদাস প্রভৃতি কবিকুলগুরুগণের কাব্য-সৃষ্টির মধ্যে আমরা এমন জ্ঞান, এমন রস, এমন সত্য, এমন ভাব ও উদ্দীপনা পাইব, যাহা এখন আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও অসম্ভব। কাব্যকে লোকে সচরাচর

কেবল কল্পনার সৃষ্টি বলিয়াই মনে করে। কাব্যেও যে বাস্তবকে ধরিয়া, বাস্তবকে ফুটাইয়া, বাস্তবকে সার্থক ও সম্পূর্ণ করিয়াই আপনার সত্য সার্থকতা লাভ করে, এ কথা সকলে বুঝে না। সকল কবিও বুঝেন না, সকল পাঠক বুঝিবে তবে কিরূপে?

কাব্য কল্পিত সৃষ্টি নহে। শ্রেষ্ঠ কাব্যমাত্রেই জীবনের অভিব্যক্তি। মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যেমন সমুদায় বিজ্ঞান বা সায়েন্সের * প্রতিষ্ঠা হয়; এই অভিজ্ঞতার উপরেই যেমন যাবতীয় দার্শনিক তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত গড়িয়া উঠে; সেইরূপ এই অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়াই সর্ব্ব-প্রকারের কবি-কল্পনারও স্ফুরণ এবং বিকাশ হইয়া থাকে। এই অভিজ্ঞতা লইয়াই মানুষের জীবন। এই অভিজ্ঞতার দ্বারা যাহাকে ধরি ধরি অথচ ধরিতে পারি না, এই অভিজ্ঞতার ভূমিতে যাহা ফোটে ফোটে কিন্তু ফুটিয়া উঠে না, এই অভিজ্ঞতা যাহার আভাস মাত্র দেয় কিন্তু যাহাকে নিঃশেষে প্রকাশ করিতে পারে না, কবিকল্পনা তাহাকেই আর একটু পরিস্ফুট, আর একটু জ্ঞানগম্য, আর একটু রসানুভাব্য, আর একটু প্রত্যক্ষ করিয়া তুলে। কাব্য এই অভিজ্ঞতারই অভিব্যক্তি। কবির অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি তাঁর কাব্য। সাহিত্য-স্রষ্টার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুভূতির অভিব্যক্তি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি। শব্দ যেমন অর্থের অভিব্যক্তি, সার্থক শব্দ যেমন সত্য বস্তু বা সত্য ভাবের অভিব্যক্তি,

* আমাদের ভাষায় বিজ্ঞানের একটা বিশিষ্ট অর্থ আছে। যে জ্ঞানের উপরে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন, খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতির একত্ব প্রতিষ্ঠিত, তাহাই বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞানকেই ভৃগু "ব্রহ্ম" বলিয়া জানিয়াছিলেন। বিজ্ঞান শব্দের এই বিশিষ্ট অর্থটি মনে করিয়াই আজিকালি বাঙ্গালা ভাষায় আমরা যাহাকে বিজ্ঞান বলি, তার বিশেষত্ব বুঝাইবার জন্য এখানে ইহার ইংরেজি প্রতিশব্দ—সায়ান্স—Science কথাটা দিতে হইল।

সাহিত্য স্থষ্টিও সেইরূপ সাহিত্যিকের সত্যকার বহির্জীবনের ও অন্তর্জীবনের প্রতিচ্ছবি। শব্দার্থবোধ যেমন বস্তুজ্ঞান সাপেক্ষ, কাব্য-স্থষ্টির সত্য রসাম্নভূতি সেইরূপ কবির বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞানসাপেক্ষ। যে কবিকে জানে না, সে তাঁর কাব্যের নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পারে না। সাহিত্যিকের সাহিত্য স্থষ্টির সত্য ও নিগূঢ় মর্ম্মবোধের জন্ম তাঁহার চরিত্রের, তাঁর চরিতালেখ্যের ধ্যান একান্ত আবশ্যক। ঐ চরিত্রই যে এই চিত্রের মাপকাঠি।

বঙ্কিম সাহিত্য বঙ্কিম চরিত্রের অভিব্যক্তি। ঐ চরিত্রকে যে না বুঝিল, এই সাহিত্যকে কখনই সে সত্যভাবে বুঝিতে পারিবে না।

বঙ্কিম চরিত-চিত্রের উপাদান

এই চরিতচিত্রের মূল উপাদান বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের একখানিও উল্লেখযোগ্য জীবনী প্রকাশিত হয় নাই। যাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎভাবে বিবিধ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে দেখিয়াছিলেন ও নানাদিক হইতে সেই জটিল চরিত্রের অপরোক্ষ অনুভূতি লাভের স্থযোগ ও সৌভাগ্য যাঁহাদের ঘটিয়াছিল, "বঙ্কিম মণ্ডলের" সে সকল সাহিত্যরথী প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন। সেই পুণ্যস্মৃতির সলিতা হাতে লইয়া একমাত্র অক্ষয়চন্দ্র সরকারই আমাদের সৌভাগ্যবলে এখনও বাঁচিয়া আছেন। অক্ষয়চন্দ্র এ কাজ করিবেন, কিম্বা এই বয়সে, এই ভগ্নদেহে, তাহা করিতে পারিবেন কিনা, জানি না। কিন্তু এ কাজটি যিনিই করুন না কেন, যতদিন না বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি সর্ব্বাঙ্গস্থন্দর জীবন-চরিত রচিত হইয়াছে, ততদিন বঙ্কিমচন্দ্রের চরিতালেখ্য রচয়িতাকে নিজেই চারিদিক হইতে যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব তাঁর আলেখ্যের উপাদানগুলি সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। এখনও একাজটা কিয়ৎপরিমাণে সহজসাধ্য আছে, আর কিছুদিন পরে অসাধ্য না হউক, অত্যন্ত দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে।

ফলতঃ এখনও আমাদের পক্ষে যত সহজ, আমাদের পুত্রস্থানীয়দের পক্ষে ততটা সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র হইতে বয়সে অনেক কনিষ্ঠ হইলেও আমরা যে যুগে জন্মিয়াছি, বঙ্কিমচন্দ্র সেই যুগেরই লোক। যে সকল সামাজিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই সকল অবস্থার ভিতরেই মোটের উপরে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনও গড়িয়া উঠিয়াছে। যে সকল জ্ঞান ও ভাবের সংঘর্ষে, যে সকল আদর্শের প্রেরণায় তাঁর অদ্ভুত সাহিত্যসৃষ্টির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, সেই সংঘর্ষের মধ্যে সেই প্রেরণাতেই আমাদের জ্ঞানও প্রথমে ফুটিতে আরম্ভ করে। যে বিষম যুগ-সন্ধিকালে, বিরুদ্ধ ভাব ও চিন্তাস্রোতের আবর্ত্তে পড়িয়া, সেকালের ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতিগতি ঘূর্ণিপাকে পতিত তরণীর মতন বিভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছিল; আর যে কালে, যে আবর্ত্তের মধ্যে স্বদেশের ও স্বজাতির চিন্তাতরণীকে স্থির রাখিবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র আপনার বজ্রমুষ্টিতে তার কর্ণধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন; আমরা সেই যুগসন্ধি সময়ে জন্মিয়া সেই চিন্তাবর্ত্তের মধ্যেই ঘুরিয়া ফিরিয়া, ডুবিয়া ভাসিয়া, গড়িয়া উঠিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা না থাকিলেও তাঁর সাহিত্য-জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ ও অপরোক্ষ সম্বন্ধ ছিল। এইজন্যই তাঁহাকে বুঝিবার ও বুঝাইবার একটু আধটু অধিকার আছে বলিয়া মনে করি। কারণ এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাটাই বঙ্কিমচন্দ্রের চরিতালেখ্যের মূল জমি। এটি বুঝিতে পারিলে, তবে বঙ্কিম-চরিত্রের ও বঙ্কিম-সাহিত্যের বিকাশের সূত্রটি ধরা সম্ভব হইবে।

চিরঞ্জীব বঙ্কিমচন্দ্র

এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিস্তর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের

জীবদ্দশাতেই দিন দিন ইহা বদলাইয়া গিয়াছিল। দুর্গেশনন্দিনীর রচনাকালের আর আনন্দমঠের রচনাকালের মধ্যে ইংরাজি-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের চিন্তারাজ্যে যুগান্তর ঘটিয়াছিল। এই সকল পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আপনি পরিবর্ত্তিত ও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফলতঃ বঙ্কিমচন্দ্র কোন দিন আপনার পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যথাযোগ্য সঙ্গতি রক্ষা করিতে অক্ষম হন নাই। কোন দিন তিনি কাল-স্রোতের পশ্চাতে পড়িয়া থাকেন নাই। এই জন্যই মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত সত্য সত্যই বঙ্কিমচন্দ্র বাঁচিয়াছিলেন। তিনি যে বয়ঃক্রম পাইয়াছিলেন, সে বয়সে অনেক লোকই দেখি মরিবার বহুপূর্ব্ব হইতেই মৃত হইয়া যায়। সাহিত্য-জগতেও এ সকল জীবন্মৃতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বিশেষতঃ আমাদের দেশে, অন্ততঃ আধুনিক সময়ে, অতি অল্প লোকেই মরণকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র পঞ্চান্ন বৎসর কাল ইহলোকে ছিলেন। ইংরাজি শিক্ষিত, আচারভ্রষ্ট, কর্ম্মবিক্ষিপ্ত বাঙ্গালীর পক্ষে পঞ্চান্ন বৎসর বাঁচিয়া থাকা নিতান্ত সামান্য কথা নহে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত জীবনের শক্তি ও যৌবনের দীপ্তিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। জীবন কেবল নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নয়, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া চলিবার শক্তিতে। যৌবন কালে নয়, রসানুভূতির সামর্থ্যে। এই দুইটিই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত একরূপ অক্ষুণ্ণ ছিল। এদেশের তিনজন চিন্তানায়ককে এই ভাবে আমরণ বাঁচিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। দুইজনকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একজনের কথা শুনিয়াছি। এক রাজা রামমোহন, দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, তৃতীয় বঙ্কিমচন্দ্র। ইঁহাদের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ ও পার্থক্য ছিল। কিন্তু তিনজনেরই জীবনীশক্তি প্রায় সমান ছিল। তিনজনেই নিত্য নূতন জ্ঞান আহরণ, নিত্য নূতন আদর্শ আয়ত্ত এবং নিত্য নূতন রস আস্বাদন করিয়াছেন।

ইঁহাদের তিনজনেরই জীবন-শতদল দিন দিন নূতন বর্ণে ও নূতন তেজে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত এ বেগটী থামে নাই। ইঁহাদের দৈব প্রতিভার স্বরূপটি নিত্য নূতন অবস্থার ভিতরে, নিত্য নূতন রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। শক্তিশালী প্রতিভামাত্রেই এইরূপ বহুরূপী। নূতন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, নূতন সাধনের আবিষ্কার, নূতন রসের সৃষ্টি যাঁরা করেন, তাঁরা স্রষ্টার গুণ ও ধর্ম্ম লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। স্রষ্টা স্বয়ং যেমন সৃষ্টির জন্য বহুরূপ হইয়া থাকেন,—"বহুস্যাং প্রজায়েতি"—প্রজোৎপত্তির জন্য বহুরূপ ধারণ করেন, দৈব-প্রতিভাসম্পন্ন লোকোত্তরগণও সেইরূপই করিয়া থাকেন। রামমোহন একজন, না বহুজন, বলা কঠিন। "তুফাৎতুলে" যে রামমোহনের পরিচয় পাই, "বেদান্তসারে" তাঁহাকে চেনা যায় কি? পঞ্চোপনিষদের ভূমিকায় যে রামমোহনকে দেখি, "ব্রাহ্মণ-সেবধিতে", খৃষ্টিয়ান পাদ্রিদিগের সহিত বিচারে, হিন্দু ধর্ম্মের পরিপোষক রামমোহন যে সেই রামমোহন, ইহা বলা কঠিন হয়। আবার Three Appeals to the Christian Publicএতে আর এক রামমোহনকে দেখিতে পাই। ব্রহ্মসভার সঙ্গীতে—

স্মর পরমেশ্বরে, অনাদি কারণে
বিবেক বৈরাগ্য, দুই সহায় সাধনে—

যে রামমোহনের পরিচয় পাই, বিলাতের রঙ্গালয়ের শ্রেষ্ঠতম রসমূর্ত্তি-সকলের প্রতিষ্ঠাত্রী ইংরাজ-অভিনেত্রীদের কাব্যরসানুশীলন-নিপুণ রাম-মোহনে আর এক ভাব ও আর এক আদর্শ দেখিয়া থাকি। অথচ এ সকল বহুরূপের ভিতরে একটি স্বরূপই দেশ কাল পাত্রাদির দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়া, নব নব মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কেশবচন্দ্রের মধ্যেও এই অদ্ভুত বৈচিত্র্য, বিকাশ ও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছি। আদি ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র, ভারতবর্ষীয় সমাজের কেশবচন্দ্র, নব বিধানের কেশবচন্দ্র, ঠিক একই ব্যক্তি কিনা, কেবল বাহির হইতে বিচার করিয়া

এ সন্দেহের নিরসন করা যায় না। আমরা তাঁহাকে এক ব্যক্তি বলিয়া দেখিয়াছি ও জানিয়াছি, সেই জন্যই এ সন্দেহ আমাদের মনে উঠে না। সুদূর ভবিষ্যতে কেশব-সাহিত্য পুরাণে ও কেশবচরিত্র কিম্বদন্তিতে পরিণত হইলে এই সমস্যা যে উঠিতে পারে না বা উঠিবে না, এমন কথা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও এই লক্ষণটি দেখিতে পাওয়া যায়। দুর্গেশনন্দিনী বা মৃণালিনীর স্রষ্টা যে বঙ্কিমচন্দ্র, তাঁহাকেই আবার কৃষ্ণ-চরিত্রের রচয়িতা বা গীতা-ধর্ম্মের উপদেষ্টা বলিয়া চেনা কঠিন হয়। তাঁর চারিদিকের সামাজিক, মানসিক অবস্থার যেমন পরিবর্ত্তন ও বিকাশ হইয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের দৈবী-প্রতিভাও তেমনি এ সকল পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গতি রাখিয়া, নিত্য নূতন সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে। জীবন-সংগ্রামে জয়শ্রী কেবল সংগ্রামক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বীবল-প্রহরণপটু শক্তিকেই বরণ করে না; দুর্দ্ধর্ষ শক্তির সঙ্গে সুনিপুণ নীতি যেখানে সম্মিলিত হয়, সেই খানেই বিজয়লক্ষ্মী বাঁধা পড়িয়া রহেন। জীবনের সংকেত কেবল প্রতিকূল শক্তির প্রতিরোধের সামর্থ্যেই লুকাইয়া রহে না, সন্ধির কুশলতার মধ্যেই তাহার পরিপূর্ণ সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়। যে কেবল সংগ্রাম করিতেই জানে, সন্ধি করিতে জানে না; যে কেবলই প্রতিবাদ পরায়ণ, কিন্তু সমন্বয় পারগ নহে; তাহার পক্ষে জীবন সংগ্রাম কেবল অপচয়েরই কারণ হয়, অভ্যুদয়ের উপায়ের পন্থা হইয়া উঠে না। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জীবনে এই সন্ধির নিপুণতা, এই সমন্বয়ের সামর্থ্য ছিল; এই শক্তির বলেই তিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের একজন অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী চিন্তানায়ক হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পরেও ত প্রায় পঁচিশ বৎসর কাটিতে চলিল, কিন্তু বঙ্কিমের এই অধিনায়কত্ব এখনও লোপ পায় নাই; অপচিত হওয়া ত দূরের কথা, দিন দিন যেন বাড়িয়াই যাইতেছে বলিয়া বোধ হয়। প্রথম যৌবনে বঙ্কিমচন্দ্র ঘোরতর যুক্তিবাদী ছিলেন; সে যে যুক্তিবাদেরই

যুগ ছিল। ইংরাজী শিক্ষা দীক্ষা পাইয়া ইউরোপের প্রবল যুক্তিবাদকে পরিহার করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত ছিল না। মহর্ষিপদার্হ দেবেন্দ্রনাথ তাহা পারেন নাই; প্রবক্তা-ধর্ম্মী কেশবচন্দ্র তাহা পারেন নাই, সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র যে এ যুক্তিবাদের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিলেন ইহা কিছুই বিচিত্র নহে। দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র দুইজন স্বল্পাধিক অজ্ঞাতসারেই এই অভিনব যুক্তিবাদকে অন্তরে অন্তরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্মের আবরণে, ফলতঃ এই যুক্তিবাদকেই প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রকৃতিগত আস্তিক্য-বুদ্ধি, কতকটা ডিপ্লোমেসির (diplomacy) পথেই যেন এই যুক্তিবাদের সঙ্গে আপনাকে মিলাইয়া মিশাইয়া চলিয়াছিল; প্রকাশ্যভাবে তাহাকে একেবারে গ্রহণও করে নাই; অকুতোভয়ে সম্মুখ সমরে তাহাকে বিধ্বস্ত করিতেও চেষ্টা করে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যৌবনে ইউরোপের এই আধুনিক যুক্তিবাদকে আপনার অন্তরে অকুণ্ঠসহকারেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ভয় কাহাকে বলে, বঙ্কিমচন্দ্র জানিতেন বলিয়া মনে হয় না। "পাছে লোকে কিছু বলে"—এ ভাবনা তাঁর কখনও ছিল বলিয়া বোঝা যায় না। না থাকারই কথা। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও ধর্ম্মোপদেষ্টার পক্ষে একান্তভাবে লোকমতকে উপেক্ষা করিয়া চলা সম্ভব হয় না। প্রাচীন লোকমতকে অগ্রাহ্য করিয়া, যাঁহারা প্রথমে বীরদর্পে স্বাধীনতার নিশান হাতে লইয়া, নূতন সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিতে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারাও দুদিন পরে, আপনাদের কর্ম্মের ও ধর্ম্মের—আপনাদের মিশনের খাতিরে, নিজেদের দলের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়েন। সমাজের আনুগত্য ছাড়িয়া অনেক সময়ই ইঁহাদিগকে নিজেদের দলের বা সম্প্রদায়ের দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়। ব্যক্তিস্বাভিমান ও যুক্তিবাদ উভয়ই এখানে শেষে হার মানিয়া যায়। লোকনায়ক হইলেই লোকরঞ্জন করিতে হয়। যখন যাহাকে সত্য

বলিয়া বুঝা যায়, তখনই তাহাকে আর প্রকাশ্যে চিন্তায় ও কর্ম্মে, আচারে ও অনুষ্ঠান বরণ করা সম্ভব হয় না। নিজের প্রতিপত্তি হানির ভয়ে না হউক, অন্ততঃ লোকহিতার্থায়, ধর্ম্মের খাতিরেই, অজ্ঞজনের বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে সংকোচ বোধ হয়।

সাহিত্যের সন্ন্যাস

কেবল যাঁহারা খাঁটি সন্ন্যাসী তাঁহারাই সর্ব্বদা নিজের কাছে খাঁটি থাকিয়া চলিতে পারেন। আর পারেন যাঁহারা খাঁটি কবি। যাঁহারা নিজের রসেই নিজে ভোর, নিজের সৃষ্টিতেই নিবদ্ধদৃষ্টি, নিজের সৃষ্টিকলার অনুধ্যানে ও বহিঃপ্রকাশেই যাঁহারা আত্মারাম হইয়া রহেন, যাঁহাদের জীবনের সার্থকতা নিজের তৃপ্তিতে অপরের স্তুতিবাদে নহে, যাঁহাদের কর্ম্মের সাফল্য সেই কর্ম্মেরই মধ্যে আত্মপ্রকাশ হয় তাহাতে, বাহিরের প্রতিপত্তির মধ্যে নয়; সেই সকল শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক, প্রচলিত পদ্ধতিতে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়াও, খাঁটি সন্ন্যাসী। অলৌকিক প্রতিভায় একটা আত্মসম্ভাবিত ভাব সর্ব্বদাই থাকে। ইহা প্রকৃতপক্ষে আত্মসম্ভাবিত ভাবও নহে, কিন্তু অনেক সময় ইহাকে লোকে self-conceit বলিয়া ভুল বুঝিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা self-conceit নহে, self-confidence মাত্র। আপনার উপরে এই একান্ত নির্ভরটুকু, আপনার শক্তিতে এই অটল আস্থাটুকু যাঁহার নাই, তাঁহার কোনও প্রতিভা আছে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। ইহা অহংকার নহে। প্রতিভা কি করিতে পারে যেমন জানে, কি করিতে পারে না, তাহাও তেমনি বুঝে। নিজের সাধ্যাসাধ্যের জ্ঞান সাধারণ লোকেরই থাকে না; সেইজন্য তাহাদের অহংকারও শোভা পায় না, বিনয়েরও কোনও দাম হয় না; দু'ই কল্পিত,—মিথ্যাভিমান এবং অলীকাভিনয় মাত্র। কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতিভার আত্মনির্ভর ও বিনয় দু'ই খাঁটি বস্তু। সত্য সত্যই একক্ষেত্রে "উজ্জ্বলে মধুরে" মিলিয়া যায়, মিশিয়া

রহে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই self-confidence তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার উপযোগী ছিল। এ ব্যক্তি কোনও দিন কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া চলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। সমাজেরও মুখাপেক্ষী হন নাই, নিজে দল বাঁধিয়া, সেই দলের মতামতের ভিতরেও বাঁধা পড়েন নাই। নিজের মনে যখন যাহাকে সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন, নিজের বুদ্ধিতে যাহা যখন সঙ্গত বলিয়া ধরিয়াছেন, নিজের প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি যখন যে পথে চলিতে চাহিয়াছে, অকুতোভয়ে অকুণ্ঠা সহকারে তাহাই বলিয়াছেন, তাহাই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, সেই পথেই চলিয়াছেন। আর চলিয়াছেন মানুষের মতন, কৃমির মতন নহে। উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর মধ্যে বিস্তর দেখা গিয়াছে; কিন্তু কৃমি-প্রকৃতি-সুলভ বক্রতা ও পিচ্ছিলতা কখনও লক্ষিত হয় নাই। ভিতরে ভিতরে এইরূপ একটা মুক্তভাব ছিল বলিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র এমন করিয়া আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোন দিন চারিদিকের চিন্তার ও ভাবনার তাঙ্গ প্রবাহের সঙ্গে তৃণের মত ভাসিয়া চলেন নাই, এই প্রবাহকে ঠেলিয়া তাহার তরঙ্গভঙ্গের উপরে উঠিয়া, তাহার মূল গতিকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করিয়াই, আপনি নিত্য নূতন রসে, নিত্য নূতন জ্ঞানে, নিত্য নূতন শক্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন। বসুন্ধরা যেমন ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনি ফুটিয়া উঠে, প্রত্যেক ঋতুর বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎ করিয়া, তাহাকে নিজের বিকাশ ও সার্থকতা সাধনে নিয়োগ করে; প্রত্যেক নূতন অবস্থার মধ্যে যাহা গ্রহণীয় তাহাকে গ্রহণ, যাহা বর্জ্জনীয় তাহাকে বর্জ্জন করিয়া অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় শক্তিকেই আপনার বিকাশের উপযোগী করিয়া তুলে; শক্তিশালী মহাপুরুষেরাও নিজ নিজ অধিকারে তাহাই করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্রোতে ভাসিয়া বেড়ান না, অথবা ডাঙ্গায় দাঁড়াইয়া স্রোতের শক্তি ও সত্যতাকে

মায়িক এবং অলীক বলিয়াও উড়াইয়া দেন না; কিম্বা তটস্থ হইয়া তাহার চাঞ্চল্যের ও অমঙ্গলের সম্বন্ধে ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করেন না, কিন্তু স্রোতের মাঝখানে যাইয়া, আপনার শক্তি ও নিপুণতার দ্বারা, তাহারই বেগে তাহাকে নিজের সার্থকতা-সাধনে ও জনসমাজের ইষ্টপথে পরিচালিত করেন। বাঙ্গালা দেশের আধুনিক চিন্তার বিকাশে ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর কাল বঙ্কিমচন্দ্রকে সর্ব্বদাই এই স্রোতের মাঝখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছি। এই জন্যই আধুনিক বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যে ও ভাবরাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের এমন অনন্যপ্রতিযোগী ও সর্ব্বতোমুখী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আর বঙ্কিমচন্দ্র সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভগীরথের ন্যায় আধুনিক জ্ঞান ও ভাবস্রোতের আগে আগে তাঁহার দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইয়া চলিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে বুঝিতে হইলে সকলের আগে তাঁর সময়কার নব্য-শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের আধুনিক চিন্তার ইতিহাসটি ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। এই ইতিহাসটিই বঙ্কিম-চরিতালেখ্যের মূল জমি। ঐ আলেখ্যটিকে পরিস্ফুট করিতে হইলে আগে এই জমিটিকে ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলা আবশ্যক।

কিন্তু জমির গুণ বুঝিবার আরও আগে বীজের বৈশিষ্ট্য এবং শক্তিটা জানা প্রয়োজন।

দুই

বীজ ও বংশের কথা

বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রের ও প্রতিভার প্রকৃত মূল্য কষিতে হইলে, এক দিকে যেমন তাঁর জীবনের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থার, অন্য দিকে সেইরূপ যে বংশধারাতে, যে বীজ হইতে তাঁর জন্ম হইয়াছিল, তাহারও যথাসম্ভব জ্ঞানলাভ করা আবশ্যক। মানুষ কেবল বাহিরের অবস্থাতেই গড়িয়া উঠে না; এসকল অবস্থা ও ব্যবস্থা, তার ভিতরকার বীজ-শক্তিকেই নানা ভাবে ফুটাইয়া তুলে। উদ্ভিদ্-জগতে যেমন বীজ সেইরূপই গাছ হয়। কাঁঠাল বীজে কাঁকুড় ফলে না। সর্ব্বত্রই এইরূপ—যেমন বীজ তেমনি জীব। কিন্তু উদ্ভিদ্-জগতেও কেবল বীজেতেই গাছ হয় না। শ্রীহট্টের কমলালেবু খাসিয়া পাহাড়ে জন্মায়। ঐ পাহাড়িয়া গুণেই এই লেবু এমন সুস্বাদু ও সুমিষ্ট হয়। এই কমলালেবুর বীজ বাঙ্গালা দেশের সমতল জমিতে পুঁতিলে কমলালেবু আর ফলে না, গোঁড়া লেবু হইয়া যায়। বীজের শক্তি জমির গুণে নানা আকার ধারণ করে। কেবল তাহাই নহে, উদ্ভিদের বিকাশের জন্য আকাশের বায়ু, রৌদ্র এবং বৃষ্টিরও প্রয়োজন। এই জমি, এই রৌদ্র, এই বৃষ্টি, এ সকলই উদ্ভিদের বিকাশে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বলিয়া গণ্য হয়। উদ্ভিদের বিকাশে বীজটি তার হেরিডিটি (beredity); জমি, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তার আধার ও আবেষ্টন, তার এনভাইরণমেন্ট্‌স্ (environments)। আধুনিক অভিব্যক্তি-তত্ত্বে বা ইভোলিউশনে (evolution'এ) এই

হেরিডিটি ও এনভাইরণমেণ্ট দুইটিই মূলতত্ত্ব। হেরিডিটি জীবের বীজ-কোষের মধ্যে নিহিত থাকে। এই বীজকোষ হইতে এই বীজ-শক্তিকে আমরা পৃথক করিতে পারি না; কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব যে কোষ মাত্রেই আধার, আধেয় নহে। বীজকোষও বীজের আধার, আধার বলিয়াই তাহাও পারিশার্শ্বিক অবস্থার অন্তর্গত। তাহাকেও এন্‌ভাইরণমেণ্টই বলিতে হয়। কিন্তু এই আধারের সঙ্গে ঐ আধেয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, নিতান্ত অঙ্গাঙ্গী। আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানেতে আমরা ইহাদের পৃথক করিয়া দেখিতে, জানিতে বা ভাবিতে পারি না। এই বীজকোষেতে যে বস্তুটি নিগূঢ়ভাবে নিহিত থাকে তাহাই জীবের জীবত্ব, তাহাই তার নিত্যত্ব; সেই বস্তুকে দেখিনা, কিন্তু দেখি না বলিয়া, তাহা যে নাই এমন কথা বলিতে পারি না। কারণ জীবের যে সকল পরিবর্ত্তন প্রত্যক্ষ করি, তার অন্তরালে একটী কিছু নিত্য বস্তু না থাকিলে, এই প্রত্যক্ষ পরিবর্ত্তনেরও কোন অর্থ হয় না।

তিলেষু তৈলম্ দধিনীব সর্পিঃ স্রোতস্বাপঃ অরণীষু অগ্নি

তিলেতে যেমন তৈল নিগূঢ়ভাবে থাকে, তার সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া থাকে, অথচ তাহাকে দেখা যায় না; দধিতে যেমন ঘৃত থাকে; শুষ্ক নির্ঝরিণী-গর্ভে যেমন জল থাকে, অরণীতে যেমন অগ্নি থাকে সেইরূপ প্রত্যেক বিকাশশীল জীবের মধ্যে এমন একটা কিছু প্রচ্ছন্ন থাকে, যাহা তার একত্ব, তার জীবত্ব, তার নিজত্ব ও নিত্যত্বের ভূমি এবং যাহাকে আশ্রয় করিয়াই তার বিকাশ-ধারার সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন প্রকাশিত হয়। এইটিই তার মূল বস্তু। এইটিই তার বীজ। এই বস্তু তার হেরিডিটির মূল উপাদান। এই বস্তু তার পৈত্রিক ও পুরুষানুক্রমাগত। জীবের যাবতীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থা এই

বস্তুকেই তার নিজের শক্তিতে ও নিজের আকারে, নিজের বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলে। উদ্ভিদের এই বস্তু তার স্বজাতীয়ত্ব; আমের ইহাই আমত্ব; ইহাই গোলাপের গোলাপত্ব ও অপরাজিতার অপরাজিতাত্ব। আমাদের এই বস্তু কেবল সাধারণ মনুষ্যত্ব নহে, কিন্তু ইহাই ইংরেজের ইংরেজত্ব, জার্ম্মাণের জার্ম্মাণত্ব। আবার ইহাই জনের (John) জনত্ব, কার্লের (Karl) কার্লত্ব, রামের ও শ্যামের রামত্ব ও শ্যামত্ব, প্রত্যেকের কুলধারার বৈশিষ্ট্য ও প্রত্যেকের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রের ইহাই বঙ্কিমত্ব। এই নিজস্ব নিগূঢ় বস্তুতেই তাঁর জীবনের, চিন্তার ও চরিত্রের সর্ব্ববিধ পরিবর্ত্তন ও বৈচিত্রের মধ্যে তাঁর একত্ব ও ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়াছে। এই বস্তুর দ্বারাই তিনি তাঁর দেশের সমাজের সময়ের অপর সকল লোক হইতে পৃথক ও বিশিষ্ট হইয়াছিলেন। পিতৃপুরুষানুক্রমিক এই বীজটিই তাঁর বিকাশের মূল বস্তু, শিক্ষা-দীক্ষা প্রভৃতিতে এই বস্তুকেই নানা দিকে ও নানা ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের এই বৈজিক বস্তুটি অতি শ্রেষ্ঠ জাতীয় ছিল। অতি সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতিশয় বুদ্ধিমান ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। ইংরেজ সরকারে তিনি উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। কুল-গৌরব, পদ-গৌরব, ধন-গৌরব, বিদ্যা-গৌরব, সকলই বঙ্কিমচন্দ্রের পরিবারে বিদ্যমান ছিল। কুলগৌরবাদি-প্রতিষ্ঠিত আভিজাত্যের ভাল-মন্দ দুই দিকই আছে। ইহার প্রভাবে মানুষের চরিত্রে কতকগুলি গুণ ও তার সঙ্গে সঙ্গেই আবার কিছু কিছু দোষও ফুটিয়া উঠে। কুল পদ ধন ও বিদ্যা যেখানে একাধারে মিলিত হয়, সেখানে চরিত্রের একটা অসাধারণ শক্তি জাগিয়া থাকে। এরূপ পরিবারে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায়ই একটা প্রবল স্বাতন্ত্র্যাভিমান দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য দিকে আবার এ

সকলের সঙ্গে একটা সংযম এবং শীলতাও মিশিয়া থাকে। এরূপ আভিজাত্যের অহঙ্কার প্রায়ই আত্মস্থ থাকে, আত্ম-প্রকাশের জন্য ব্যস্ত হয় না। সকলে যাঁহাদের কথা সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া চলে, তাঁহারা অপরের কথায় কান দিবার প্রবৃত্তির অনুশীলন করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না। সকলে যাঁহাদিগকে মানিয়া চলে, তাঁহারা লোকমতের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে শিখেন না। তাঁহাদের মধ্যে একটা নিরঙ্কুশ ব্যক্তিত্বাভিমান বা অনধীনতার ভাব আপনি জন্মিয়া যায়। তাঁহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা পর্য্যন্ত সহজ এবং নির্ভীক হইয়া থাকে। সমাজের ভয় যে কি বস্তু, ইহা প্রায়ই তাঁহারা জানেন না। এই সকল যে কেবল গুণের কথা, তাহাও নয়; ইহা দোষের কথাও হয়। কিন্তু এই জাতীয় দোষ গুণ মিলিয়াই এ সংসারে সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র লোক-নায়ক-চরিত্র গঠিত হয়। এই জাতীয় দোষগুণ দুই বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দেখা গিয়াছে। এই চট্টোপাধ্যায় বংশের অহংকারের তেজে, শুনিয়াছি, লোকে তাঁহাদের কাছে ঘেসিতে সাহস পাইত না। আবার অন্যপক্ষে যাঁহারা এই ব্যূহ ভেদ করিয়া তাঁহাদের অন্তরঙ্গ জীবনে একবার প্রবেশ করিতে পারিতেন, তাঁহারা ইহাদের সৌজন্যে এবং অমায়িকতায় চিরদিন মুগ্ধ হইয়া থাকিতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য তাঁর নিজের প্রতিভারই ফল ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁর চরিত্রের তেজ, তাঁর অসাধারণ আত্মনির্ভরতা ও ব্যক্তিত্বাভিমান বা পারসনালিটি (personality),—তাঁর দেমাক, তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতা এসকলকে যে তাঁর পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা এনভাইরণমেণ্ট্‌ই বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, একথাও অস্বীকার করা যায় না। এই পরিবারে না জন্মিলে বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক বঙ্কিমচন্দ্র হইতেন কিনা, বলা যায় না। যাঁরা মানুষের জন্মটাকে একটা আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, তাঁরা এরূপ ভাবিতেও বা পারেন; হিন্দুর জন্মতত্ত্ব যাঁরা বুঝেন তাঁদের পক্ষে এরূপ ভাবা সম্ভব নহে।

বীজের জন্ম ও কর্ম্ম-কথা

ইউরোপীয় লোকেরা জীবের জন্মটাকে একটা অহেতুক, আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, ইহা জানি। ইংরাজি ভাষায় এইজন্য accident of birth বলিয়া একটা কথা আছে। আমাদের ভাষায় তার অনুরূপ কোন কথা নাই। আমরা কস্মিনকালে মানুষের জন্মটাকে এরূপ একটা অকারণ, আকস্মিক কার্য্য বলিয়া ভাবিতে পারি নাই। সৃষ্টির কোথাও যে কিছু অকারণ ও আকস্মিক, কোনও কিছু অন্ধ ঘটনা সম্পাত হইতে উৎপন্ন হয় বা হইতে পারে, হিন্দু কোনও দিন এমন অদ্ভুত কল্পনা করে নাই। মানুষের জন্ম তার কর্ম্মের ফল। যার যেমন কর্ম্ম, সে সেই কর্ম্মোচিত দেহলাভ করিয়া সেই কর্ম্মফলের ভোগ এবং ক্ষয় করিবার জন্যই সংসারে আসে। আর যে পিতার বীজে, যে মাতার গর্ভে, এই উদ্দেশ্যের উপযোগী উপাদান আছে, জীবের কর্ম্ম তাহাকে সেইখানেই টানিয়া আনে। আজিকালিকার ইউরোপীয় জীব-বিজ্ঞান যাহাকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বিধি বা ল' অব ন্যাচার‍্যাল সিলেক্‌সন্ বলে, তাহা যে জীবরে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে দখল করিয়া তার বিকাশ ক্রমকে নিয়মিত করে, এমন নহে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বা ন্যাচার‍্যাল সিলেক্‌সনের অর্থ এই যে প্রত্যেক জীব-কোষাণু সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই আপনার জীবনরক্ষার ও বিকাশ সাধনের অনুকূল যাহা তাহাকেই আশ্রয় করিয়া চলে, যাহা ইহার প্রতিকূল তাহাকে প্রাণপণে বর্জ্জন করিতে চাহে। এই গ্রহণ ও বর্জ্জন লইয়াই জীবের জীবন-সংগ্রাম। এই সংগ্রাম যে জীবের ভূমিষ্ঠ হইবার পরে বা সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়, ইউরোপীয় জীববিজ্ঞানও একথা বলে না। জীব-কোষের উৎপত্তি হইতেই এই সংগ্রাম চলিতে আরম্ভ করে। মায়ের গর্ভে এই সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তার আরও পূর্ব্বে এই জীবকোষ যখন পিতার শুক্রেতে, মাতার শোণিতে বীজাবস্থায়

থাকে, তখনও এই সংগ্রাম চলে। জীববিজ্ঞানের অনুবীক্ষণ যতদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায়, ততদূর পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম লক্ষিত হয়। যাহা জীববিজ্ঞান দেখে না ও জানে না, সেখানে কি এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম নাই?

হিন্দুর কর্ম্মবাদ এই জীববিজ্ঞানের অতীত ও অজ্ঞাত ভূমিতেও এই নিয়মের প্রতিষ্ঠা করে। এই জীবন-সংগ্রাম, এই গ্রহণ ও বর্জ্জন চেষ্টা জীবের নিত্যধর্ম্ম। যেখানে জীব, সেইখানেই এই প্রয়াস রহিয়াছে। জীববিজ্ঞান যাহাকে জীবন বলে, জীবের জন্মের পূর্ব্বে তার এই জীবন থাকে, না থাকে না? যদি না থাকে, তবে জন্মকালে এ বস্তু আসে কোথা হইতে? অজীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয়, ইউরোপের জীববিজ্ঞানও আজি পর্য্যন্ত একথা সাহস করিয়া বলিতে পারে নাই। অজীব-জনন-বাদ বা abiogenesis এর মত এখনও প্রমাণ প্রতিষ্ঠ হয় নাই। জীব হইতেই জীবের উৎপত্তি হয়, এখন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সমাজেও এই মতটাই প্রবল রহিয়াছে। জীব দেহটাকেই যদি সমগ্র ও সম্পূর্ণ জীব বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে পিতৃমাতৃ দেহ হইতে এই জীবের উৎপত্তি হয়, এই কথা বলিতে পারি। কিন্তু এই দেহতত্ত্বেতে জীব সম্বন্ধে সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। এই পাঞ্চভৌতিক দেহকেই আমাদের শাস্ত্রে অন্নময়কোষ বলিয়াছেন। অন্ন হইতে প্রাণের উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না, কল্পনা করাও কঠিন। এই দেহের উপরে প্রাণ। এই প্রাণ বস্তু কি, কে বলিবে? এই প্রাণকে দেখি না, শুনি না, ধরি না, ছুঁই না, কোনও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহাকে গ্রহণ করিতে পারি না, অথচ ইহা সকল দেহ ও সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপিয়া আছে। দেহ ছাড়া জীবের কেবল প্রাণই যে আছে, তাহাও নয়। তার মন আছে, বুদ্ধি আছে, অহংকার আছে, আর সকলের উপরে অহংপ্রত্যয়বাচক একটা বস্তু আছে, যাহাকে আমরা তার আত্মা বলি,

যে বস্তু তার জীবনের অনিত্যতার মধ্যে নিত্য, তার মৃত্যুর মধ্যে অমৃত; যে বস্তু তার জীবনের পরিবর্ত্তনশীল ইতিহাসের চিরসঙ্গী ও চিরসাক্ষী হইয়া আছে। নিত্যের জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। জন্মে সে থাকে, জন্মের পূর্ব্বেও থাকে, মৃত্যুকালে সেই মৃত্যুর সাক্ষী, মৃত্যুর পরেও সে থাকে। আজিকালিকার বিজ্ঞান যাহাকে হেরিডিটি বলে, তাহাও এই নিত্য যে আত্ম বস্তু, তাহারই এন্‌ভাইরন্‌মেণ্ট বা আধার ও আবেষ্টন বা তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার অন্তর্গত। এই এন্‌ভাইরণমেণ্ট সহায়ে এই আত্ম-বস্তু আপনার কর্ম্মকে ফুটাইয়া তুলে ও ক্ষয় করিয়া থাকে।

এই আত্মা ভোক্তা; তার ভোগ আছে। এই ভোগের আবার ক্ষয় আছে। এই ভোগের জন্যই তার কর্ম্ম ও কর্ম্মফল। এই ভোগ ও কর্ম্মের ভিতর দিয়াই সে এই সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্যে আপনাকে প্রাপ্ত হয় ও পূর্ণ করে। এই ভোগ এবং কর্ম্মই তার আত্ম-চরিতার্থতার বা self-realisation এর পথ। আমরা যে অবস্থাটাকে জীবের জন্ম বলি, তাহা লাভ করিবার জন্য পিতৃমাতৃ-নির্ব্বাচন প্রয়োজন। এই নির্ব্বাচনের নিয়ন্তা জীবের এই ভোগ-বাসনা ও এই সঞ্চিত কর্ম্ম। এখানেও উপায় উদ্দেশ্যের সংযোগ আছে। না থাকিলে, জন্মটা অর্থহীন, অন্ধ-ঘটনা-সম্পাতে পরিণত হয়। জন্মের কোনও অর্থ আছে মানিলে, ইহার অন্তরালেও এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের বিধানটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহা হইলেই জন্মটা আর একটা "অ্যাক্‌সিডেণ্টে" পরিণত হয় না।

প্রাকৃতজনের পক্ষে যাহাই হউক না কেন, অন্ততঃ লোকোত্তরচরিতদিগের পক্ষে জন্মটা নিতান্ত একটা আকস্মিক ঘটনা-সম্পাত বলিয়া মনে করা কঠিন। ইহারা সংসারে যে কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেই কর্ম্মের উপযোগী আয়োজন সংগৃহীত

হইতে আরম্ভ করে। তাঁহাদের বংশধারা এই কর্ম্মের অনুকূল হয়। তাঁহাদের পিতৃমাতৃ-চরিত্র এই কর্ম্মোপযোগী গুণের বীজ তাঁহাদিগকে দান করে। তাঁহাদের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থানও ইহার উপযোগী হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনেও ইহা দেখিতে পাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার চরিত্রের মূল সরঞ্জামগুলি তাঁহার পিতামাতার, তাঁহার বংশধারার এবং পরিবারবর্গের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। কুল, পদ, ধন এবং বিদ্যার যোগাযোগে তাঁর পিতৃপরিবার নিজেদের সমাজে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। কেবলমাত্র কুলগৌরবে বঙ্কিম-চরিত্রের অসাধারণ ঔদার্য্যকে ফুটাইয়া তুলিতে পারিত না। কেবলমাত্র পদ-মর্য্যাদায় কিম্বা ঐশ্বর্য্যপ্রভাবেও আবাল্য হইতে তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে নির্ভীক করিতে পারিত না। কেবলমাত্র বিদ্যার জোরেও তিনি জীবদ্দশাতেই বাঙ্গালীর চিন্তারাজ্যের রাজা হইয়া বসিতে পারিতেন না। যে স্বরাট নহে, সে সম্রাট হইতে পারে না। যার ভিতরে কোনও দিকে কিছু অপরিহার্য্য হীনতাবোধ থাকে, সে কখনও স্বরাট হইতেই পারে না। জন্মাবধি বঙ্কিমচন্দ্রকে কোনও বিষয়ে কাহারও নিকটে মাথা হেঁট করিতে হয় নাই। এই জন্যই তিনি প্রথমে নিজের স্বরাজ্য ও ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও জ্ঞানবৃদ্ধি-সহকারে আপনার সহযোগীগণের মনের সাম্রাজ্য অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের আধুনিক কালের অপরাপর চিন্তানায়কগণের মধ্যে কেবল রাজা রামমোহন ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রেই কুল, পদ, ধন এবং বিদ্যার এই অপূর্ব্ব সম্মেলন ঘটিয়াছিল। আর এই জন্যই রামমোহন, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের মতন আর কেহ দেশের লোকের চিন্তা ও চরিত্রের উপরে এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠাও লাভ করিতে পারেন নাই। এই তিনজনই স্বরাট ও সম্রাট ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-দীক্ষা

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা ও পিতামহের কথা যতটা শোনা যায়, তাহাতে তাঁর বৈজিকধারা বা হেরিডিটি যে অতি শ্রেষ্ঠ জাতীয় ছিল, ইহা অস্বীকার করিবার কোনও কারণ দেখি না। যে জমিতে এই বীজ পড়িয়াছিল, অর্থাৎ তাঁর পিতৃ-পরিবারের অবস্থা ও ব্যবস্থাও এই বীজকে সম্পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিবার বিশেষ উপযোগী ছিল বলিয়াই মনে হয়। তারপর তাঁর শিক্ষাদীক্ষাও অতিশয় উন্নত ও উদার ছিল। সে সময়কার নব্য-শিক্ষার্থী বাঙ্গালীর পক্ষে যতটা উদার ও উৎকৃষ্ট শিক্ষালাভ করা সম্ভ বছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহা পাইয়াছিলেন। তখন এদেশের ইংরাজি-শিক্ষার বাল্যাবস্থা বলিলেও চলে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজি পড়িতে আরম্ভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হইলে, তিনি সেকালকার সিনিয়ার স্কলারশিপ পাশ করিয়াই লেখাপড়া শেষ করিতেন। কিন্তু তাঁর অধ্যয়ন সমাপ্তির প্রাকালেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়া বি, এ, উপাধিদানের আয়োজন হয়। বঙ্কিমচন্দ্র অল্প কয়েকদিন মাত্র বি, এ, পরীক্ষার নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যগ্রন্থ পাঠ করিয়া, পরীক্ষা দিতে গমন করেন এবং অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে বি, এ, পাশ করেন। কিন্তু এইখানেই তাঁর বিদ্যাচর্চ্চার শেষ হয় নাই। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি নিত্য নূতন জ্ঞানার্জ্জনে নিযুক্ত ছিলেন। অর্থের হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-সেবা কেবল সখের ব্যাপার ছিল,—যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর গ্রন্থের উপস্বত্ব নিতান্ত কম দাঁড়ায় নাই। কিন্তু অন্য কোনও দিক দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সখের সাহিত্যিক ছিলেন না। সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য তিনি যতটা শ্রম স্বীকার করিতেন, তাঁর পরবর্ত্তী কোনও বাঙ্গালী সাহিত্যিক এ পর্য্যন্ত তত শ্রমস্বীকার করিয়াছেন কি না সন্দেহ। বিশেষ বিশেষ তথ্যের সন্ধানে, বিশেষ বিষয়ের গবেষণায়, কেহ কেহ ইদানীং

আপনাদের সমুদায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এ কথা ভুলিয়া যাই নাই। জগদীশচন্দ্রের বা প্রফুল্লচন্দ্রের বিজ্ঞানালোচনা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বা অক্ষয় মৈত্রের ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান, এ সকল নিতান্ত সখের ব্যাপার বা amateur work নহে। ইঁহারা আপনাপন বিদ্যার অনুশীলনে বিস্তর শক্তি ও সময় নিয়োগ করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন ও প্রয়াস সর্ব্বদা প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যে ইঁহাদের যতই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি হউক না কেন, বঙ্কিম-চন্দ্রকে যে অর্থে সাহিত্যসেবী বলা যায়, ইঁহাদিগকে সেই অর্থে সাহিত্যসেবী বলা যায় না। বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, এ সকলই ইঁহাদের মূল সাধ্য—সাহিত্য নহে। ইঁহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যে সকল তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার জন্য সাহিত্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু সাহিত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র সাধ্য ছিল। বিস্তৃত অর্থে, বিজ্ঞান ইতিহাসাদিও সহিত্যের অন্তর্গত সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশিষ্ট অর্থে লোকে সাহিত্য বলিতে মৌলিক রসসৃষ্টিই বুঝিয়া থাকে। রসবস্তু ভিতরের। আন্তরিক রসানুভূতির উপরে এই রসের প্রতিষ্ঠা। শব্দাত্মক বা বর্ণাত্মক বা ধ্বন্যাত্মক কিম্বা মৃণ্ময়, কি ধাতুময়, কি প্রস্তরময় বস্তু বা চিত্রাদির সাহায্যে এই আন্তরিক রসানুভূতিকে সম্যকরূপে বাহিরে ফুটাইয়া তুলাই সাহিত্য, চিত্র, সংগীত, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ললিতকলার উদ্দেশ্য। এইজন্য সচরাচর, বিশেষতঃ আমাদের দেশে, সাহিত্যিকেরা অন্তরের রসানুভূতি অনুশীলনে যতটা তৎপর হইয়া থাকেন, বাহিরের জগতের বিবিধ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে ততটা যত্ন করেন না। বাহ্যবস্তুর সহিত মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ যে কতটা ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী, বিষয় বিশেষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মনের গতি ও প্রকৃতি যে বদলাইয়া যায় এবং এই কারণে বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি বহির্বিদ্যার আলোচনা ও

প্রচারের দ্বারা আন্তরিক রসানুভূতির প্রচার এবং শক্তিও যে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, এ সকল কথা মামুলী সাহিত্য-সেবাতে বড় একটা গণনার মধ্যে আসে না। আর এই কারণেই আমাদের সাহিত্যসৃষ্টি অনেক সময় কেবল স্বপ্ন-সৌন্দর্য্যই লাভ করে, পারমার্থিক সত্য লাভ করা ত দূরের কথা, ব্যবহারিক সত্যের উপরেও যথাযোগ্যভাবে গড়িয়া উঠে না।

সাহিত্যের সাধনা

মানুষকে লইয়াই ত সাহিত্য। মানুষের মন লইয়াই ও সাহিত্যের যাবতীয় লীলাখেলা। মানুষের ভাবকে আকার দিয়া, রং দিয়া, আদিতে ও মূলে যাহা অতীন্দ্রিয় তাহাকে নানা ইঙ্গিতে, সংকেতে, উপমায়, রূপকে সাজাইয়া কিয়ৎপরিমাণে ইন্দ্রিয়ানুভূতির অধিকারে টানিয়া আনাই সাহিত্যের লক্ষ্য। মানুষ আপনার অন্তরের অপরোক্ষ অনুভূতিতে যে সকল অজ্ঞাত বস্তুর সন্ধান লাভ করে, তাহাকে জগতের অশেষবিধ জ্ঞাত বস্তু ও বিষয়ের সঙ্গে অনুমান উপমানাদির দ্বারা যুক্ত করিয়া জ্ঞানগোচর করিয়াই সাহিত্য-সৃষ্টি আপনার যথার্থ সার্থকতা লাভ করিয়া থাকে। ইংরাজি ফ্যান্সি (fancy) শব্দকে যদি আমরা বাঙ্গালায় কল্পনা বলি, তাহা হইলে ইংরাজিতে যাহাকে ইমেজিনেষণ (imagination) কহে, তাহাকে আমাদের ভাষায় অপরোক্ষ অনুভূতি বলা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। সাহিত্যে এই সত্য কল্পনা বা ইমেজিনেষণকেই আমি অপরোক্ষানুভূতি বলিতে চাই। এখানে এই অর্থেই অর্থাৎ ইংরাজি ইমেজিনেষণের প্রতিশব্দরূপেই, অপরোক্ষানুভূতি শব্দ ব্যবহার করিতেছি। এই অন্তরঙ্গ অনুভূতি, এই অতীন্দ্রিয়-সম্বন্ধ-জ্ঞান বা রসবোধই ইমেজিনেষণ। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কখনও জানা যায় না তাহাকে ব্যক্ত করাই এই অপরোক্ষানুভূতি বা অন্তরঙ্গ-অনুভূতির কর্ম্ম। এইজন্যই এই অনুভূতি সাহিত্য-সৃষ্টির মূল মন্ত্র।

—as imagination bodies forth,
The forms of things unknown, the poet's pen
Turns them to shapes, and gives to airy nothing,
A local habitation and a name.

—ইহাই সত্য ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের লক্ষণ। কিন্তু মানুষের অজ্ঞাতকে ধরিবার শক্তি ও প্রণালী সর্ব্বদাই সে যাহা ও যতটুকু জানে, তাহার উপরেই নির্ভর করে ও তাহারই দ্বারা নিয়মিত হয়। জ্ঞাত ও অজ্ঞাত দুইটা একান্ত বিচ্ছিন্ন রাজ্য নয়। জ্ঞাত যাহা তাহা অজ্ঞাত নহে, ইহা সত্য। কিন্তু সেইরূপ আলোক যাহা তাহাও ছায়া নহে, ছায়া যাহা তাহা আলোক নহে, একথাও সত্য এবং প্রত্যক্ষ। অথচ ছায়া আর আতপকে পরস্পর হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ছায়ার পাশেই আতপ, আতপের সঙ্গেই ছায়া সর্ব্বদা থাকে। সেইরূপ জ্ঞাত এবং যাহাকে অজ্ঞাত বলি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাহা এবং যাহাকে ইন্দ্রিয়াতীত বলি, ইহারা উভয়েও সর্ব্বদা পরস্পরের সঙ্গে একাঙ্গ হইয়াই যেন থাকে। গুণকে যেমন গুণী হইতে, চিন্তাতে পৃথক করিলেও, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাতে কদাপি পৃথক দেখা যায় না; সেইরূপ যাহা জানি, তাহা হইতে কিছুতেই যাহা জ্ঞানাতীত ও অজ্ঞেয় তাহাকে আলাদা করা সম্ভব হয় না। এইজন্যই বহির্বিষয়ের জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের সত্যোপলব্ধি এবং আনন্দানুভূতি বা রসানুভূতির প্রকৃতি ও প্রসার উভয়ই বাড়িয়া যায়। দেহের জ্ঞান যত বাড়ে, চৈতন্যের উপলব্ধি তত বিস্তৃত ও গভীর হয়। এই জ্ঞানপ্রভাবে দেহের উপরে মানুষের আধিপত্য যত বৃদ্ধি পায়, সেই পরিমাণে তার রস সম্ভোগের মাত্রা এবং বৈচিত্রও বাড়িয়া যায়, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের রসানুভূতিও পরিপক্কতা ও পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে। জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা অপরিহার্য্য অন্যোন্যাপেক্ষীত্ব আছে। সেইরূপ জ্ঞানের এবং ভাবের বা রসের,—সায়েন্স (science) এবং

আর্টের মধ্যেও একটা অনন্যাপেক্ষা রহিয়াছে। আপনার যুগের শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান-বিজ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া, কিম্বা তাহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, গভীর, প্রাণগত, প্রত্যাক্ষ যোগ রক্ষা না করিয়া, কোনও সাহিত্যই সত্য ও শ্রেষ্ঠ রসমূর্ত্তি গড়িয়া তুলিতে পারে না। বাঙ্গালা সাহিত্যে আমরা এই অতি মামুলী ও মোটা কথাটা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছি বলিয়া মনে হয়। এই কারণেই বাঙ্গালা দেশে সত্য সাহিত্য-সৃষ্টি যেন ক্রমে বন্ধ হইয়া যাইতেছে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালা দেশে আজিকালি বিজ্ঞানচর্চ্চা বাড়িয়াছে, প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান ও ঐতিহাসিক গবেষণা বেশ হইতেছে। এ সকল ক্ষেত্রে বাঙ্গালী বিশেষ মৌলিকতার ও কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন। এ সকল বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু সাহিত্যের ধারা যেন ক্রমে শুকাইয়া যাইতেছে। সাহিত্য সৃষ্টি যেন কেবলই একটা অলীক অন্তর্মুখীনতার অভিনয়ে ব্যস্ত হইয়া বিমানচারিণী হইয়া পড়িতেছে। সাহিত্য-কলায় কেবলই যেন একটা আবছায়ার লীলা আরম্ভ হইয়াছে।

বঙ্কিম-যুগের সাহিত্য ও বিদ্যাবত্তা

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে এটি হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের সাহিত্যের সম্রাট, সেই যুগের আদিতেও আজিকালিকার মতন বাঙ্গলা সাহিত্য এতটা পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হয় নাই। আর হয় নাই এই জন্য যে সেকালের বাঙ্গালী লেখকেরা প্রায় সকলেই, আপনাদের সম-সাময়িক শিক্ষা ও সাধনার বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য প্রভৃতি প্রায় সকল অঙ্গকেই স্বল্পাধিক অধিকার করিবার চেষ্টা করিতেন। বাঙ্গলা শব্দযোজনা আজিকালিকার মতন তখন এত সহজও ছিল না; আর যে সুললিত শব্দযোজনা করিতে পারিত, সে সেই ঝঙ্কার-সম্পদের বলে একটা দীগ্‌গজ সাহিত্যিক হইবার উচ্চ আশা লইয়া পাঠক সমাজেও আসিয়া দাঁড়াইত না। এখনকার সাহিত্যিকেরা প্রায়

অনেকেই হয় স্বয়ংসিদ্ধ, না হয় কৃপা-সিদ্ধ। সাহিত্য-সৃষ্টির যে একটা বিশেষ, কঠোর সাধনা আছে, এ কথা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রকে এই কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছিল। তাঁর পূর্ব্বে অক্ষয়কুমারকে এবং ঈশ্বরচন্দ্রকেও কঠোর সাধনা পথে সাহিত্য-জীবনে সিদ্ধিলাভ করিতে হইয়াছিল। সেকালের হিসাবে অক্ষয়কুমারের বিস্তর পড়াশুনা ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কত বিস্তৃত পড়াশুনা ছিল তাঁর গ্রন্থাদিতে তার যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর সংগৃহীত পুস্তকরাশিতে তদপেক্ষা বেশী পরিচয় পাই। কিন্তু এ বিষয়ে বঙ্কিম-চন্দ্রের মতন আর কাহাকেও এ দেশে খুঁজিয়া পাই না। সে সময়ের ইংরাজি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানাদি বিষয়ে তাঁর জীবদ্দশায় বঙ্কিমচন্দ্রের মতন আর একটিও পণ্ডিত লোক বাঙ্গালা দেশে ছিলেন বলিয়া জানিনা। তাঁর গ্রন্থাবলীর সর্ব্বত্র এই অসাধারণ বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। অথচ কুত্রাপি তিনি যে নিজের বিদ্যা জাহির করিতে চাহিয়াছেন, ঘুণাক্ষরেও এ সন্দেহটা মনে জাগে না। আপনার সৃষ্টিকে সাজাইবার কিম্বা নিজের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তিনি প্রয়োজনমত অপরের প্রামাণ্য বা উদ্ভাবিত সত্যের উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু কোথাও নিজের বিদ্যার গৌরব প্রতিষ্ঠা করিতে চান নাই। বিদ্যা তাঁর প্রতিভার কিঙ্করী হইয়াই ছিল, তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রভু হয় নাই। বিদ্যা তাঁর যতই বেশী হউক না কেন, প্রতিভা এই বিদ্যা অপেক্ষা অনেক গুণে বড় ছিল। আমাদের শিক্ষিত-সমাজ আজিকালি কাল্‌চারের অভিমানে ফাঁপিয়া উঠিতেছে, মাঝে মাঝে পাণ্ডিত্যের আস্ফালনে কোলাহলায়িতও হইয়া উঠে। বঙ্কিম "মণ্ডলে" এ স্ফীত মস্তকের বা এ কোলাহলের উৎপাত দেখা যায় নাই; অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের যে পড়াশুনা ছিল, এখন তার কিছুই নাই বলিলে চলে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা পড়িতেন, তাঁর অলোক-

আশী

সামান্ত প্রতিভা তাহা একেবারে হজম করিতে পারিত। অধীত বিদ্যাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিতেন। পরের বস্তু তাঁর নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা যাচাই হইয়া, তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডারে তাঁর নিজের মোহরাঙ্কিত হইয়া সঞ্চিত হইত। সোনা, রূপা, তামা প্রভৃতি যেমন টাকশালে এক আকারে যায়, কিন্তু সেখান হইতে আর এক আকারে বাহির হইয়া আসে, সেইরূপ অধীত বিদ্যাসকল এক ভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে যাইত, আর অন্য আকারে তাঁহার লেখনীমুখে বাহির হইয়া আসিত। জীব মাত্রেরই বাহিরের খাদ্য গ্রহণ করিয়া, যাহা প্রয়োজনীয় তাহাকে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া রাখিবার ও যাহা নিষ্প্রয়োজন তাহাকে উৎসর্জ্জন করিবার শক্তি থাকে। এই শক্তিই জীবের জীবনের প্রধান লক্ষণ। মনেরও এই ধর্ম্ম আছে। যে মনের এই জীবন-ধর্ম্মটা আছে, সে যেমন অনায়াসে বাহিরের প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করিতে পারে, সেইরূপ আহরিত বিষয়ে যাহা নিষ্প্রয়োজন বা হানিকর, অর্থাৎ যাহা তার প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পারে না, তাহাকে বর্জ্জনও করিতে পারে। যে মন এইরূপ বর্জ্জনক্ষম নহে, তাহা অজীর্ণ-বিদ্যার উৎপাতে শীর্ণ হইয়া পড়ে। বিদ্যা তার মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, তাহার হ্রাস এবং অপচয়ই করিয়া থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রের মানস জীবনে কোনও দিন কেহ এ অজীর্ণ রোগ দেখিতে পায় নাই। পড়াশুনা তাঁর মধ্যে যে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল, অতি অল্প লোকের মধ্যেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; সাধারণ লোকের মধ্যে পাওয়া যায় না, পণ্ডিতদের মধ্যেও সচরাচর দেখা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়িবার সময়, তিনি যে সে সময়ের কোন্ তত্ত্বটা জানিতেন না, এ দেশের বা ইউরোপের কোন্ লেখকের বা পণ্ডিতের সঙ্গে যে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, ইহা ভাবিয়া উঠিতে

পারি না। এ দেশের বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, মন্বাদি স্মৃতি, সাংখ্যবেদান্তাদি দর্শন, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ভবভূতি প্রকৃতির কাব্য, রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস, ভাগবতাদি পুরাণ, নানাবিধ তন্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ, এ সকলের সঙ্গে তাঁর কতটা যে পরিচয় ছিল, তাঁর উপন্যাসে, প্রবন্ধাবলীতে, কৃষ্ণচরিত্রে, গীতাভাষ্যে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইউরোপীয় দার্শনিক ক্যাণ্ট, হেগেল, কুজো, কোম্‌টে এবং ইংরাজ চিন্তানায়ক স্পেন্‌সার, মিল্‌, বেন্থাম, হক্‌স্‌লি, টিণ্ডেল, ফ্রেডারিক হ্যারিসন্‌ প্রভৃতি ও আর এক দিকে মেথু আর্‌নল্ড, রেণাঁ প্রভৃতি এমন কি আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব বা spiritualism এবং মেসমেরিজম্‌ (mesmerism) পর্য্যন্ত তাঁর কতটা কেবল জানা নয়, আয়ত্ত ছিল,—এ সকলের বিস্তর প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে রহিয়াছে। অথচ কোথাও একটুও অপপ্রয়োগ বা পাণ্ডিত্য-প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা যে কত বড় ছিল, ইহাতেই আমরা তাহার একটা অতি প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হই। নিজের শক্তির উপরে যে দাঁড়াইতে পারে, নিজের প্রতিভার মৌলিকতা যে বুঝে, সে পরের বস্তু লইয়া বড়াই করিতে যাইবে কেন? স্বরাজ্যে যে প্রতিষ্ঠিত, সে পরের নিকট হইতে করই লইয়া থাকে, অপরের যশোভাতি বা জয়শ্রী ধার করিয়া আনিবার জন্য ব্যগ্র হয় না। ইহাতে যে তার ইজ্জৎ যায়।

সুরেন্দ্রনাথ

আধুনিক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনে সুরেন্দ্রনাথের স্থান

সুরেন্দ্রনাথ বাঙ্গালী। কিন্তু তাঁর প্রতিভার প্রেরণা ও সুদীর্ঘ কর্ম্ম-জীবনের প্রভাব বাংলার সীমা অতিক্রম করিয়া, সমগ্র ভারতরাষ্ট্রকে অধিকার করিয়া আছে। আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে আরও অনেক শক্তিশালী লোকনায়ক আছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন কোন বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁদের সকলের প্রভাব ও প্রতিষ্ঠা আপন আপন প্রদেশেতে আবদ্ধ। লালা লাজপত্ রায়ের নাম ভারত-বিশ্রুত হইলেও, কর্ম্মক্ষেত্র প্রকৃত পক্ষে পঞ্চনদের সীমা অতিক্রম করে নাই। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও সেইরূপ কেবল এলাহাবাদ ও আগ্রার যুক্ত-প্রদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনেই কতকটা নেতৃত্ব-মর্য্যাদা পাইয়াছেন। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকে অনেকেই তাঁর নাম জানে, কিন্তু তাঁর প্রতিভার বা কর্ম্মজীবনের প্রেরণা তাহারা অনুভব করে নাই। স্যার্ ফিরোজশাহ মেহেতার রাষ্ট্রীয়-নেতৃত্বও বোম্বাইএর পার্শী ও গুজরাটের বেনিয়া সম্প্রদায়েই সাক্ষাৎভাবে স্বীকৃত হয়; বোম্বাই প্রদেশের মহারাষ্ট্রীয় সমাজ, কিম্বা বাংলার কি পঞ্জাবের শিক্ষিত সম্প্রদায় এ পর্য্যন্ত তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করেন নাই। তবে কন্‌গ্রেসে বা জাতীয় মহাসমিতিতে কিছুদিন পর্য্যন্ত যে তাঁর একটা অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। আর ইহার হেতুও একরূপ চক্ষের উপরেই পড়িয়া আছে। জন্মাবধিই কংগ্রেস স্যার্ ফিরোজশাহ মেহেতা, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,

শ্রীযুক্ত এ. ও. হিউম্ এবং স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবর্ণ, ইঁহাদের অর্থেই বিশেষভাবে পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। অনেক সময় কংগ্রেসের অপরাপর নেতৃবর্গ কংগ্রেসের ব্যয় সংকুলনের জন্য প্রতিশ্রুত চাঁদা যথাসময়ে আদায় করেন নাই বা করিতে পারেন নাই বলিয়া এই চারিজনকেই বহুদিন পর্য্যন্ত এই অনাদায় টাকার দায়ভারও বহন করিতে হয়। এ অবস্থায় যাঁহাদের কার্পণ্যে বা ঔদাসীন্যে স্যার্ ফিরোজশাহ মেহেতাকে বৎসর বৎসর এত টাকার ঝুঁকি বহন করিতে হইয়াছে, তাঁহাদের পক্ষে কংগ্রেসের কার্য্যকলাপে মেহেতা সাহেবের অভিপ্রায়ের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। মেহেতা সাহেবের নিকটে কংগ্রেসের এই দীর্ঘকালব্যাপী অন্ন-ঋণ স্মরণ করিয়াই অপরাপর নেতৃবর্গ কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনায় তাঁর অভিমত ও আবদার মানিয়া চলিয়াছেন। কংগ্রেসের অন্যতম উত্তমর্ণ বলিয়াই কংগ্রেস্-মণ্ডলে স্যার ফিরোজশাহ মেহেতার একটা প্রতাপ ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুবা কংগ্রেসের বাহিরে, দেশের সাধারণ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মাকর্ম্মের উপরে, কিম্বা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের চিত্তে, মেহেতার চরিত্রের বা প্রতিভার কোনো প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায়, কোনো কোনো বিষয়ের আলোচনায়, অপরাপর সভ্যগণের তুলনায়, কখনো কখনো অসাধারণ সাহসিকতার ও বিশেষ কৃতিত্বের প্রমাণ প্রদান করিয়া, শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখেলে ভারতব্যাপী একটা খ্যাতি ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন, সত্য। আর এ খ্যাতি ও মর্য্যাদা তাঁর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রের উপরেই যে অনেকটা প্রতিষ্ঠিত, ইহাও অতিশয় সত্য। গোখেলে সদ্বিদ্বান ও কোনো কোনো বিষয়ে স্বল্পবিস্তর বিশেষজ্ঞতাও তাঁর আছে। য়ুরোপীয় অর্থনীতি-শাস্ত্রে গোখেলের যে পরিমাণ অধিকার জন্মিয়াছে, ভারতের আর কোনো লোকপ্রসিদ্ধ

রাষ্ট্রীয় কর্ম্মনায়কের তাহা আছে কি না সন্দেহ। যে প্রণালী অবলম্বনে ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিকেরা বিবিধ রাষ্ট্রীয় বিষয়ের বিচার-আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই প্রণালী অবলম্বনে পরমতখণ্ডন ও স্বমত-প্রতিষ্ঠায় গোখেলে একরূপ সিদ্ধহস্ত। ইংরেজের চিরাভ্যস্ত বাদ-বিত্তায়— ইংরেজিতে ইহাকে ডিবেট (debate) বলে— লার্ট কার্জ্জনের মত পারদর্শী লোক ইংলণ্ডেও এখন কম। অথচ কখনো কখনো লাট কার্জ্জনকেই এ বিষয়ে গোখেলের নিকটে হার মানিতে হইয়াছে। আর আপনার বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী স্বদেশের সেবাতে জীবন উৎসর্গ করিয়া, গোখেলে এ পর্য্যন্ত যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে এই সেবাব্রত উদযাপন করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, ভারতের অন্য কোনো লোকনায়কের মধ্যে সেরূপ ঐকান্তিকী নিষ্ঠাও দেখা যায় নাই। গোখেলের মধ্যে যে সকল গুণের যেভাবে সমাবেশ হইয়াছে, সে সকল গুণ এদেশের অন্য কোনো প্রসিদ্ধ লোকনায়কের মধ্যে সে মাত্রায় দেখা যায় নাই; ইহা সত্য বটে। কিন্তু তবুও গোখেলের বর্ত্তমান ভারতব্যাপী খ্যাতি যে কেবল তাঁর পাণ্ডিত্য ও চরিত্রবলেই অর্জ্জিত হইয়াছে, এমন কথাও বলা যায় না। স্বর্গীয় মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে যদি গোখেলেকে হাতে ধরিয়া না তুলিতেন; পুণার সার্ব্বজনীন সভা যদি রাণাডের অনুরোধে গোখেলেকে ওয়েল্‌বী কমিশনের সম্মুখে আপনাদের প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ না করিতেন; প্রথম বারে বিলাত গিয়া বিলাতী সংবাদপত্রে, প্লেগ-বিধানের প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে পুণার ইংরেজ সৈনিকগণের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ গোখেলে আনিয়াছিলেন, যদি ফিরিয়া জাহাজ-ঘাটেই সর্ব্বতোভাবে তার প্রত্যাখ্যান করিয়া বোম্বাইএর রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহভাজন না হইতেন; ফিরোজশাহ মেহেতার শিষ্যত্ব ও আনুগত্য স্বীকার করিয়া, তাঁহারই প্রসাদে যদি তিনি বোম্বাই-ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারি সভ্যগণের প্রতিনিধি হইয়া বড় লাটের ব্যবস্থাপক-সভায় না আসিতেন; সেখানে

লাট কার্জ্জন আপনার স্বভাবসিদ্ধ ঔদার্য্যগুণে যদি গোখেলের বিচারযুক্তির যথাসাধ্য খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াই তাঁর মেধার ও পাণ্ডিত্যের সম্বর্দ্ধনা না করিতেন; ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে তথাকথিত চরম-পন্থীদিগের অভ্যুদয় হইলে, মিণ্টো ও মর্লে প্রভৃতি ভারত-শাসনযন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় রাজপুরুষেরা যদি এই নূতন রাষ্ট্রীয়-শক্তিকে সংযত ও প্রতিহত করিবার জন্য গোখেলে ও তাঁর দলের লোকনায়কগণকে লোক-চক্ষে বাড়াইয়া তুলিতে চেষ্টা না করিতেন;—এই সকল বাহিরের ঘটনাপাত না হইলে, গোখেলে যে শুদ্ধ আপনার প্রতিভার বা চরিত্রের বলে ভারতব্যাপী এই খ্যাতি লাভ করিতে পারিতেন, ধীরভাবে সকল বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া বিচার করিলে, এই সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু এ সকল যোগাযোগ সত্বেও গোখেলে যে সমগ্র ভারতের আধুনিক-শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব-মর্য্যাদা লাভ করিতে পারেন নাই, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কেবল এক সুরেন্দ্রনাথই এই দেশে, এই কালে, এই অনন্যপ্রতিযোগী নেতৃত্বের দাবী করিতে পারেন।

যে সকল বাহিরের ঘটনা ও অবস্থার যোগাযোগে এ দেশের অপরাপর রাষ্ট্রীয় কর্ম্মনায়কগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের প্রথমাবস্থায় এবং তাহার পরেও বহুদিন পর্য্যন্ত, তাঁহার ভাগ্যে সে সকল যোগাযোগ ঘটে নাই। রাজপুরুষদিগের আসন্ন সংসর্গলাভ এ দেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র প্রশস্ত পথ। আর এ দেশে ধনবলে ও পদবলেই রাজপুরুষদিগের প্রসাদলাভ করিতে পারা যায়। আজ লোকে বলে, সুরেন্দ্রনাথ লক্ষপতি হইয়াছেন। কিন্তু তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভ সময়ে সুরেন্দ্রনাথের এ ধনপরিবাদ ছিল না। গোখেলেকে রাণাডে নিজের হাতে ধরিয়া বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। বাংলার তদানীন্তন লোকনায়কগণের মধ্যে একজনও এরূপভাবে সুরেন্দ্রনাথকে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার

চেষ্টা করেন নাই। বাংলার ধনী ও পদস্থ লোকেরা আজ সুরেন্দ্রনাথের সাহায্য ছাড়া কোনো স্বাদেশিক অনুষ্ঠানে ব্রতী হইতে সাহস পান না। কিন্তু ইঁহাদের জ্যেষ্ঠেরা একদিন রাজদ্বারে-লাঞ্ছিত সুরেন্দ্রনাথকে অস্পৃশ্য মনে করিয়া, তাঁহা হইতে দূরে থাকিতেন। বহুদিন পর্য্যন্ত রাজ-প্রসাদলোলুপ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের সভ্যগণ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনায় সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে এক মঞ্চে উপবেশন করিতেও শঙ্কিত হইতেন। আজ সুরেন্দ্রনাথ ইংরাজ রাজপুরুষদিগের দ্বারাও কিয়ৎ-পরিমাণে সম্বর্দ্ধিত হইতেছেন। কিন্তু একদিন তিনি এই রাজকর্ম্মচারী সম্প্রদায়ের নিকট লাঞ্ছিত হইয়া রাজকর্ম্ম হইতে অপসারিত হইয়াছিলেন। আর বহুদিন পর্য্যন্ত সে লাঞ্ছনার কথা এ দেশের ইংরেজ রাজপুরুষেরা বিস্মৃত হন নাই। প্রত্যুত যতই সুরেন্দ্রনাথ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-আলোচনায় দেশের জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া, আপনি সেই শক্তি-সাহায্যে শক্তি-শালী হইয়া উঠিতেছিলেন, ততই তাঁহারা সেই প্রাচীন লাঞ্ছনার স্মৃতিকে প্রাণপণে জাগাইয়া রাখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাও সকলে জানেন। সেই রাজপুরুষেরাই, আজিকার অবস্থাধীনে, আপদ-বিপদে প্রতিপদেই দেশের প্রজামতের পোষাকতা-লাভের লোভে সুরেন্দ্রনাথের পরামর্শ গ্রহণ করিতেছেন। যে সুরেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া কংগ্রেসের কাজকর্ম্ম আজ কিছুতেই চলে না ও চলিতে পারে না; একদিন, কংগ্রেসের জন্মকালে, তাহার জন্মদাতা ও ধাত্রীবর্গ সকলে প্রাণপণে সেই সুরেন্দ্রনাথকে তাহার বাহিরে রাখিতে চাহিয়াছিলেন, এ কথাও মিথ্যা নয়। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যার ফিরোজশাহ মেহেতা উভয়েই সুরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেসের কর্ম্মে আমন্ত্রণ করিতে চান নাই। হিউম সাহেবও প্রথমে তাঁহাদের মতেই মত দিয়াছিলেন। হিউম ভারত গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ছিলেন। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি যে অশ্রদ্ধা বহুদিন হইতে জাগিয়াছিল,

হিউমের মনেও যে তাহা ছিল না, এমন নহে। তার উপরে যখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেহেতা প্রভৃতি কংগ্রেসী নেতৃবর্গ সুরেন্দ্রনাথের সাহায্য গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন হিউম যে সেই মতে সায় দিবেন, ইহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের ব্যবস্থা করিবার জন্য হিউম যখন কলিকাতায় আসিলেন এবং সুরেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া বাংলা দেশের লোকমতকে কংগ্রেসে টানিয়া আনা যে একান্ত অসম্ভব, ইহা দেখিলেন ও বুঝিলেন, তখন তাঁর মত ফিরিয়া গেল এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মেহেতা প্রভৃতির আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া, গুণগ্রাহী হিউম স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথকে কংগ্রেসের কর্ম্মনেতৃত্বে বরণ করিয়া লইলেন। আজ সুরেন্দ্রনাথের অনেক সহায়-সম্পদ লাভ হইয়াছে। আজ তিনি দেশের রাজপুরুষ ও রাজারাজড়ার দ্বারা সম্বর্দ্ধিত ও সম্মানিত হইতেছেন। কিন্তু একদিন তাঁহাকে নিঃসহায় ও নিঃসম্বল অবস্থায়, "শোথের শেওলার" মত দেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মস্রোতের ঘাটে ঘাটে ফিরিতে হইয়াছিল। আজ তিনি আধুনিক ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে যে অনন্যপ্রতিযোগী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহা কোনো প্রকারের অনুকূল ঘটনাপাতের ফল নহে। এ কীর্ত্তি অর্জ্জনে কেহ তাঁহাকে কোনো প্রকারে সাহায্য করেন নাই। ইহা সর্ব্বতোভাবে তাঁর স্বোপার্জ্জিত। কেবল আপনার প্রতিভা ও পুরুষকারের বলে সুরেন্দ্রনাথ এ দেশের বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় কর্ম্মজীবনে এই অনন্যপ্রতিযোগী নেতৃত্ব মর্য্যাদা লাভ করিয়াছেন। এইখানেই তাঁর বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব।

সুরেন্দ্রনাথের চরিত্র

অশেষ প্রকারের প্রতিকূল অবস্থার ভিতর দিয়া সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে। আর এই সকল প্রতিকূল অবস্থাকে অতিক্রম

করিয়া তাঁর এই কর্ম্মজীবন যে এমন অদ্ভুত সফলতা লাভ করিয়াছে, ইহাতে সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ মানসিক বলেরই প্রমাণ প্রদান করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সুরেন্দ্রনাথ বীর পুরুষ নহেন। আমরা সচরাচর যাহাকে বীরত্ব বলি, তার অন্তরালে অনেক সময় একটা ফলাফল-বিচার-বিরহিত একগুয়ামি লুকাইয়া থাকে। এই প্রকারের একগুয়ামি সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে নাই; থাকিলে, সুরেন্দ্রনাথ যে সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা কখনই পাইতেন না। সুরেন্দ্রনাথ যে খুব সাহসী পুরুষ, এমনো বলা যায় না। যে অসমসাহসিকতা অসাধ্য সাধনের প্রয়াস করিয়া, সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, পরিণামে নিঃশেষ নিষ্ফলতা মাত্র লাভ করে, সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে কখনো সেরূপ অসমসাহসিকতা দেখা যায় নাই। কিন্তু অবিচলিত ধৈর্য্য যে বীরত্বের লক্ষণ, আর নিন্দাস্তুতি উভয়কে সমভাবে উপেক্ষা করিয়া আপনার অভীষ্টসিদ্ধির পথে চলিবার শক্তির ভিতরে যে সাহসিকতা লুক্কায়িত থাকে, সে বীরত্ব ও সে সাহস সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে সর্ব্বদাই দেখা গিয়াছে। যে মনের বল থাকিলে লোকে বিরোধী শক্তির আঘাতে বরং ভাঙ্গিয়া যায় কিন্তু কখনো তাহার নিকটে নত হয় না;—এই আত্মঘাতী মানসিক বল সুরেন্দ্রনাথের কখনো ছিল না। কিন্তু যে মনের বল আপনার রুচি ও প্রবৃত্তি, মান ও অপমান, আয়াস ও শ্রম-ক্লেশ, এ সকলকে অগ্রাহ্য করিয়া, সকল অবস্থাতেই সেই অবস্থার সঙ্গে যথাসম্ভব সন্ধি ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়া, আপনার লক্ষ্যের অনুসরণ করিতে পারে, সুরেন্দ্রনাথের সে মানসিক শক্তি যে পরিমাণে আছে, আমাদের আর কোনো লোকপ্রসিদ্ধ রাষ্ট্রীয়-নায়কের মধ্যে তাহা নাই। যে নিগূঢ় কৌশল-সহায়ে জীব বিবিধ বিরোধী অবস্থা ও ব্যবস্থার মধ্যে পড়িয়াও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মানুযায়ী আত্মরক্ষায় ও আত্মচরিতার্থতা লাভে সমর্থ হয়, সুরেন্দ্রনাথ অতি আশ্চর্য্যরূপে সে কৌশলটী লাভ করিয়াছেন।

এই কৌশলটী যে জীব লাভ করিতে পারে, সেই কেবল বিশ্বব্যাপী নির্ম্মম জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারে। এই কুশলতাগুণেই সুরেন্দ্রনাথও জীবন-সংগ্রামের জয়টীকা ললাটে ধারণ করিয়া, ভারতের আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের রজঃপ্রাধান্য

সুরেন্দ্রনাথের অন্তঃপ্রকৃতি যে খুব সাত্ত্বিক তাহা নয়। নির্ম্মলত্ব, ভাস্বরত্ব ও অনাময়ত্ব, এ সকলই সত্ত্বের লক্ষণ। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের বুদ্ধি অতীন্দ্রিয় বস্তুধারণায় তৎপর হয়; চিত্ত বিকারশূন্য ও কর্ম্ম নিষ্কাম হয়। এ সকলের কোনো লক্ষণ এ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের চিন্তায় ও চরিত্রে প্রকাশিত হয় নাই। তাঁর স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনা, যুগযুগান্তব্যাপী তপস্যার ফলে, বহুদিন হইতে সত্ত্বপ্রধান হইয়া আছে, সত্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, সে কালে কর্ম্মবশে এই সমাজের পুরাভ্যস্ত সাত্ত্বিকতাও ঘোর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বত্রই যুগসন্ধিকালে এইরূপ হইয়া থাকে। এইজন্য যে শিক্ষা ও সাধনায় এই সাত্ত্বিকীভাব ফুটিয়া উঠে, সুরেন্দ্রনাথ সে শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হন নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাল্যকালে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের মধ্যে, নূতন ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে, স্বদেশের সনাতন ভাব ও আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি একেবারে লোপ পাইতেছিল। সমগ্র দেশ তখন ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া, নিজেদের প্রাচীন সভ্যতার ও সাধনার প্রাণহীন ও অর্থশূন্য বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপের অনুসরণে নিযুক্ত ছিল। তার ভিতরকার সত্যের ও মহত্ত্বের অনুভূতি, সাধুসন্ন্যাসিগণের মধ্যে কচিৎ থাকিলেও, সাধারণ গৃহস্থদিগের মধ্যে একেবারে ছিল না

বলিলেই হয়। তার উপরে, সুরেন্দ্রনাথের পিতা, ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, য়ুরোপীয় সভ্যতার ও সাধনার প্রবল রাজসিক আদর্শের দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁর সমসাময়িক ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই স্বল্পবিস্তর এই দশা ঘটিয়াছিল। দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেন্দ্রনাথকে কেবল ইংরেজী শিখাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। ইংরেজের চালচলন অভ্যাস ও ইংরেজের চরিত্র লাভ করিবার জন্য, তিনি অতি অল্প বয়সেই সুরেন্দ্রনাথকে ডভ্‌টন স্কুলে প্রেরণ করেন। এইরূপে সুরেন্দ্রনাথ একরূপ বাল্যাবধিই কলিকাতার ইংরেজী ও এংলো-ইণ্ডিয়ান্ বালকগণের সংসর্গে থাকিয়া স্কুল কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করেন; তার পরে, বিলাতে যাইয়া এই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্য উদ্‌যাপন করিয়া সিভিলিয়ানী-পদ লইয়া, দেশে ফিরিয়া আসেন। আজিকালি বিলাত ও ভারত যেন এ'ঘর ও'ঘর হইয়া পড়িয়াছে, সত্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ যখন শিক্ষার্থী হইয়া বিলাত গমন করেন, তখন এইরূপ ছিল না। সেকালে বিলাত যাওয়া এত সহজ ছিল না বলিয়া, বিলাত-প্রত্যাগত হিন্দুদিগের নিজেদের প্রাণে একটা প্রবল অহঙ্কার এবং কোনো কোনো দিক দিয়া সমাজেও তাঁহাদের একটা অনন্যসাধারণ মর্য্যাদা ছিল। সে কালের বিলাত-প্রত্যাগত বাঙ্গালী হিন্দুদের সঙ্গে, তাঁহাদের প্রাচীন পৈতৃক সমাজের কোনো প্রকারের যোগাযোগ প্রায়ই থাকিত না। সমাজও তাঁহাদিগকে পতিত বলিয়া বাহিরে ফেলিয়া রাখিত। আর তাঁহারা নিজেরাও সাহেব সাজিয়া, সহধর্ম্মিণীকে গাউন পরাইয়া মেম সাজাইয়া, "নেটিভ্‌দের" সঙ্গে প্রমুক্তভাবে মেশামেশি করিলে কি জানি এই সগুলব্ধ সভ্যতার মর্য্যাদাভ্রষ্ট হইয়া পড়েন, সেই ভয়ে আপনাদের সমাজ হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতে চেষ্টা করিতেন। সুরেন্দ্রনাথও প্রথম বয়সে তাহাই করিয়াছিলেন। আর বিধাতার চক্রান্তে ও তাঁর স্বদেশের সুকৃতিবলে, সুরেন্দ্রনাথের সিভিলিয়ানী-পদ

যদি খসিয়া না পড়িত, তাহা হইলে আজি পর্য্যন্তও তিনি এই ভয়াবহ পরধর্ম্মের বোঝাই বহন করিয়া চলিতেন। অতএব এই সকল ঘটনাবশে সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্যে যে স্বদেশের ও স্বজাতির সভ্যতা ও সাধনের নিগূঢ় প্রকৃতির সাক্ষাৎকার লাভ ঘটে নাই, ইহা কিছু বিচিত্র নহে।

সুরেন্দ্রনাথের প্রাণের টান্‌টা পুরাদমেই স্বদেশাভিমুখী হইলেও তাঁর মত, প্রকৃতি এবং ভিতরকার ভাব ও আদর্শ যে সত্যই স্বদেশী, এমন বলা যায় না। শুদ্ধ সাত্বিকী প্রকৃতিই আমাদের স্বদেশী চরিত্রের চিরন্তন আদর্শ। যেমন ভিন্ন ভিন্ন লোকে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের কোন না কোন একটা গুণ অপর দুই গুণকে অভিভূত করিয়া, তাহাদের প্রকৃতিকে বিশেষ ভাবে সাত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক করিয়া তোলে, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জাতির প্রকৃতিতেও গুণ বিশেষের প্রাধান্য ঘটিয়া থাকে। কোন জাতি বা এই জন্য তামসিক, আর কেহ বা রাজসিক, আর কেহ বা সাত্বিক প্রকৃতির হয়। কোন জাতির সভ্যতা ও সাধনা রজঃ-প্রধান, আর কাহারও বা তমোপ্রধান, আর কোন জাতির সভ্যতা ও সাধনা বা সত্ত্ব-প্রধান হইয়া থাকে। য়ুরোপের সভ্যতা ও সাধনা রজঃ-প্রধান। ভারতের সভ্যতা ও সাধনা সত্ত্ব-প্রধান। য়ুরোপের সাধনাতেও সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণেরই প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা আছে। রজঃ-প্রধান বলিয়া য়ুরোপীয় সাধনায় তামসিকতা নাই বা সাত্বিকতা ফুটে নাই, এমন নহে। জীব সাধন-বলে কখনও কখনও এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ মুক্ত লোক সর্ব্বত্রই অতি বিরল। সাধারণ মানুষের ভিতরে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাধনায় এবং সভ্যতায়ও সর্ব্বদাই এই তিন গুণ বিদ্যমান আছে। ভারতবর্ষেও অনেক তামসিক এবং রাজসিক লোক আছেন। ভারতের বহুমুখী সাধনায় রাজসিক এবং তামসিক উভয়

প্রকৃতিরই যথাযোগ্য অনুশীলনেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও ভারতের সভ্যতার ও সাধনার ঝোঁক সাত্ত্বিকতারই দিকে। শুদ্ধ সাত্ত্বিক চরিত্রই আমাদের দেশের আদর্শ চরিত্র। য়ুরোপীয় সাধনার ঝোঁক রাজসিকতারই দিকে। এই জন্য রাজসিক চরিত্রই সে দেশের আদর্শ চরিত্র। সুরেন্দ্রনাথ বাল্যাবধি য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার ঐকান্তিক প্রভাবের ভিতরে বাড়িয়া উঠিয়াছেন বলিয়া, এই য়ুরোপীয় আদর্শের রাজসিক চরিত্রই লাভ করিয়াছেন।

আর সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও চরিত্র শুদ্ধ সাত্ত্বিক নয়, কিন্তু একান্ত রাজসিক, ইহা কোনোই নিন্দার কথা নহে। ফলতঃ প্রকৃত সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক এ সংসারে অত্যন্ত বিরল। অন্য দেশের তো কথাই নাই, আমাদিগের এই সত্ত্ব-প্রধান সভ্যতা এবং সাধনাতেও বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক চরিত্র যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। সচরাচর লোকে যাহাকে সাত্ত্বিকতা বলিয়া মনে করে, অনেক সময় তাহা কেবল ঘোরতর তামসিকতারই রূপান্তর মাত্র। সত্ত্ব এবং তমঃ উভয়েরই কতকগুলি বাহিরের লক্ষণ এক প্রকারের বলিয়া অতি সহজেই এইরূপ ভ্রম হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকতার বৃদ্ধিতে অনেক লোকের মধ্যে কখনও কখনও এমন একটা অবস্থা আসিয়া পড়ে, যাহাতে তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারের বাহিরের কর্ম্মচেষ্টা হইতে বিরত করে। এই কর্ম্মচেষ্টাহীনতা তমো-গুণেরও লক্ষণ। তবে এই সাত্ত্বিকী নিশ্চেষ্টতার অন্তরালে ভগবন্নির্ভরতা আর তামসিকী নিশ্চেষ্টতার অন্তরালে নিদ্রালস্য প্রভৃতি জড়গুণ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এ দু'য়ের প্রভেদ বুঝিতে না পারিয়া, লোকে অনেক সময় এই নিদ্রালস্য প্রভৃতি জড়ধর্ম্মসম্ভূত নিশ্চেষ্টতাকেই সাত্ত্বিকতার লক্ষণ বলিয়া ভ্রম করে।

প্রত্যেক যুগসন্ধিকালে পূর্ব্বতন যুগের বিধি-ব্যবস্থা ও রীতি নীতি যখন লোকের একান্ত অভ্যস্ত হইয়া তমোধর্ম্মাক্রান্ত হয়, তখন সত্ত্ব-প্রধান

সমাজেও এই জাল সাত্বিকতার প্রভাব অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। এই জাল সাত্বিকতাতেই আমাদের দেশটা এখন ছাইয়া ফেলিয়াছে। এ অবস্থায় লোক-সমাজে পুনরায় সত্য সাত্বিকতার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, জনগণের অন্তরস্থিত রজোগুণকেই আগে বাড়াইয়া তোলা আবশ্যক হয়। সুরেন্দ্রনাথ আচরণ ও উপদেশের দ্বারা আপনার দীর্ঘ কর্ম্মজীবনে এই যুগপ্রয়োজন সাধন করিয়া আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এরূপ অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ যখন রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন তখন যদি তিনি লোকচক্ষে কোনো উচ্চ সাত্বিকী আদর্শ ধরিতে যাইতেন, তাহা হইলে তাহাতে দেশব্যাপী তামসিকতার প্রভাব বাড়িয়া যাইত, প্রকৃত সাত্বিকতা লোকচরিত্রে কখনই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত না। দেশের কল্যাণের জন্য সে সময় রজোগুণের প্রেরণারই বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আর সমাজপ্রকৃতির এই অন্তঃপ্রয়োজনের অনুরোধে সে সময়ে সর্ব্বপ্রকারের লোকহিতব্রতই বিশেষভাবে রজোধর্ম্মাক্রান্ত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসংস্কারক নহেন। স্বদেশের ধর্ম্মজীবনে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্য বিধাতা তাঁহাকে ডাকেন নাই। সামাজিক এবং বিশেষভাবে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার সংস্কার সাধনব্রতেই ভগবান তাঁহাকে বরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক ধর্ম্মসংস্কারকগণও তখন দেশের ধর্ম্মজীবনের মধ্যে একটা প্রবল রাজসিক ভাবই জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সময়ে এইরূপ চেষ্টারই প্রয়োজন এবং তাহাই স্বাভাবিক ছিল। অতএব কালধর্ম্মবশে সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতি ও চরিত্র রাজসিক হইয়াছে। এরূপ না হইলে তিনি যে কাজ করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন না। লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, অশম ও স্পৃহা এই সকলই রাজসিকতার প্রধান লক্ষণ। ধনমানাদি লাভ হইতে আরম্ভ করিলে, তাহা উত্তরোত্তর আরও অধিক পরিমাণে লাভ হউক, এই যে

অভিলাষ তাহারই নাম লোভ। পরদ্রব্যাদিতে যে লালসা তাহাকেও লোভ বলে বটে, কিন্তু সে লোভ নিরতিশয় নিকৃষ্ট বস্তু, অতি নিম্ন অধিকারের ধর্ম্মও এই লোভকে প্রশ্রয় দেয় না। এই লোভ রাজসিক বস্তু নহে। কিন্তু ধর্ম্মানুমোদিত উপায়ে উত্তরোত্তর ধনমানাদি বৃদ্ধি করিবার যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই রজোগুণের লক্ষণ। নিয়ত কর্ম্ম করিবার যে ইচ্ছা, তাহারই নাম প্রবৃত্তি। কোনো বিষয় বা প্রতিষ্ঠানকে গড়িয়া তুলিবার যে উদ্যম, তাহাই আরম্ভ। ইহা করিয়া, পরে উহা করিব, এইরূপ সংকল্প-বিকল্পাত্মিক যে বুদ্ধি, তাহাই অশম। সর্ব্বপ্রকারের সামান্য বস্তুতে যে তৃষ্ণা তাহাই স্পৃহা। এই লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, অশম ও স্পৃহা, শাস্ত্রে এই সকলকেই রাজোলক্ষণ বলিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে এই সকল লক্ষণগুলিই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এই সকলের দ্বারাই তাঁর প্রকৃতির রাজোপ্রাধান্য প্রমাণিত হয়। এই রাজসিকতাই সুরেন্দ্রনাথের জীবনের ও চরিত্রের একদিকে বলের ও অন্যদিকে দুর্ব্বলতার হেতু হইয়া আছে। তাঁর ভাল ও মন্দ, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, উভয়ই এই রাজসিক প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

আপনার কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই সুরেন্দ্রনাথ যে ঘোর বিপাকে পতিত হন, সেরূপ বিপাকে পড়িয়া অতি অল্প লোকেই আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিত। ধন-মানের আশা করিয়াই তিনি সংসারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সহসা ধন-মান-পদ সকল হারাইয়া, নিরতিশয় দারিদ্র্যের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। যাহা কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাঁহার পদচ্যুতির আদেশের বিরুদ্ধে বিলাতে আপীল করিতে যাইয়া, তাহাও একরূপ নিঃশেষ হইয়া গেল। পৈতৃক ভদ্রাসনের নিজের অংশটুকু মাত্র অবলম্বন করিয়া, দারিদ্র্যের বিভীষিকা মাথায় লইয়া, সুরেন্দ্রনাথ আবার কলিকাতায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। সুরেন্দ্রনাথ রাজকর্ম্মেই জীবন অতি-

বাহিত করিবেন ভাবিয়া, তাহারই উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন ; কোনো প্রকারের ব্যবসায়িক-বিদ্যা লাভ করেন নাই। রাজদ্বারে লাঞ্ছিত হইয়া অন্যত্র তাঁহার বিদ্যার ও যোগ্যতার উপযুক্ত কর্ম্ম লাভ করাও তখন সম্ভব ছিল না। কিন্তু পদচ্যুত এবং একরূপ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াও সুরেন্দ্রনাথ দমিয়া গেলেন না। আপনার পুরুষকারের প্রভাবে সমুদায় প্রতিকূল অবস্থাকে উপেক্ষা করিয়া নূতন ক্ষেত্রে নূতন কর্ম্মজীবন গড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে ইংরেজ রাজপুরুষদিগের সমকক্ষ হইয়াছিলেন তিনিই এখন সামান্য বেতনে মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপকের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আপনার জীবিকা অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় পড়িলে অনেক লোকই একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইত। পুনরায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে শক্তি ও উদ্যম আবশ্যক, অনেক লোকেই তাহা আর সংগ্রহ করিতে পারিত না। কিন্তু দমিয়া যাওয়া কাহাকে বলে, সুরেন্দ্রনাথ ইহা একেবারেই জানেন না। জীবন-সংগ্রামে সুরেন্দ্রনাথ সময় সময় হটিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কখনই পরাভূত হ'ন নাই। ইহা তাঁহার প্রকৃতিগত উচ্চ অঙ্গের রাজসিকতারই ফল। জীবের জীবনী-শক্তি একদিকে ব্যাঘাত পাইলে যেমন আর একদিকে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে, সুরেন্দ্রনাথের বলবতী কর্ম্মস্পৃহাও এইরূপে যখনই একদিকে প্রতিকূল অবস্থার দ্বারা প্রত্যাহত হইয়াছে তখনই অপূর্ব্ব কুশলতা সহকারে, আপনার অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণাতেই যেন অজ্ঞাতসারে নূতন পথে যাইয়া আত্মচরিতার্থতা লাভের চেষ্টা করিয়াছে। রাজকর্ম্মে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আশা যখন অকালে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল, তখন তিনি স্বদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্রে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, সেই দিকে আপনার শরীর মনের সমুদায় শক্তি নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন।.

সুরেন্দ্রনাথের যোগসিদ্ধি

সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে কখনো ধর্ম্মজীবনের কোনো প্রকারের বাহ্য আড়ম্বর দেখা যায় নাই। তিনি ঈশ্বর মানেন; কিন্তু সার্থক বা নিরর্থক ঈশ্বর-প্রসঙ্গে কখনো কালাতিপাত করেন বলিয়া শুনা যায় নাই। স্বদেশের বা বিদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের বা তত্ত্ববিদ্যার সঙ্গে তাঁহার যে কোনো প্রকারের সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল বা আছে, এমনও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিবলেই হউক, আর অহেতুকী ভাগবতী-কৃপাগুণেই হউক, সুরেন্দ্রনাথ আপনার কর্ম্মজীবনের ভিতর দিয়াই যে এক প্রকারের যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, ইহাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। সুরেন্দ্রনাথ রাগদ্বেষবিমুক্ত বৈরাগী পুরুষ নহেন। পুত্রদারগৃহাদিতে তাঁর আসক্তি নাই এবং এ সকলের ইষ্টানিষ্টলাভে তাঁর চিত্ত বিচলিত হয় না, এমনও নহে। প্রত্যুত তাঁর মত প্রীতিশীল পতি ও সন্তানবৎসল পিতা আমাদের দেশেও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র দেখা যায় না। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবনের আহ্বানে, নলিনী-দলগত জলবিন্দুর ন্যায়, এই সকল স্নেহমমতার আসক্তি তাঁহার চিত্ত হইতে সর্ব্বদাই অনায়াসে ঝরিয়া পড়িতে দেখিয়াছি। প্রথম জীবনে নবীন পুত্রশোক এবং শেষ জীবনে নিদারুণ পত্নীবিয়োগ, এ সকলের কিছুতেই ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার স্বাদেশিক কর্ম্মচেষ্টার কোনো ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই। ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা-দিনে সুরেন্দ্র-নাথের পুত্র-বিয়োগ হয়। বন্ধুগণ যখন তাঁহাকে সভাস্থলে আসিবার জন্য ডাকিতে যান, তখন সুরেন্দ্রনাথ নিদারুণ পুত্রশোকে অধীর। কিন্তু ভারত-সভার প্রতিষ্ঠার জন্য সভাস্থলে তাঁহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে শুনিয়া, সেই শোকাহত সুরেন্দ্রনাথ তখনই শোকবেগ সংবরণ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপ ধৈর্য্য ও সংযম পূর্ব্বজন্মলব্ধ যোগ-শক্তির প্রভাবেই প্রাকৃতজনে সম্ভব হয়। আবার বিগত কংগ্রেসের

প্রাক্কালে, এই বৃদ্ধ বয়সে, পত্নীবিয়োগবিধুর সুরেন্দ্রনাথ এক দিনের জন্যও যে আপনার দৈনন্দিন কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন নাই, ইহা দেখিয়াও তাঁহাকে মুক্তপুরুষ বলিয়াই মনে হয়। এই মুক্তভাব সাধনালব্ধ নহে, কিন্তু সহজসিদ্ধ। ইহাই তাঁহার কর্ম্মজীবনের মূলসূত্র। আর কর্ম্মজীবনে তিনি যে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এই সহজসিদ্ধ মুক্তভাবই তাহার নিগূঢ় হেতু। এই মুক্তভাব আছে বলিয়াই, সুরেন্দ্রনাথ কখনও অতীতের নিষ্ফলতার স্মৃতিকে ধরিয়া পড়িয়া থাকেন নাই। ইহার জন্যই তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও কখনো আত্মহারা হ'ন নাই। আর এই জন্যই সময়ে সময়ে অশেষ প্রকারের নিন্দা ও অপবাদের ভাগী হইয়াও, সুরেন্দ্রনাথ কখনই আপনার অভীষ্ট কর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন নাই।

সুরেন্দ্রনাথ জনপ্রিয় লোকনায়ক হইয়াও কোনো দিনই লোক-নিন্দার হাত এড়াইতে পারেন নাই। বরং সময়ে সময়ে তিনি এতটাই লোক-নিন্দার ভাগী হইয়াছেন যে, অন্য লোকে সেই অপবাদ মাথায় লইয়া আবার কখনও লোক-নেতৃত্বের দাবী করিতে সাহস পাইত কি না সন্দেহ। রাজকর্ম্ম হইতে অপসৃত হইয়া, নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলে যে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে অযাচিত আশ্রয়দান করিয়াছিলেন, সুরেন্দ্রনাথ যখন তাঁর মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী সিটি কলেজে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং অল্পদিন মধ্যে আপনি সেই মেট্রোপলিটন কলেজের আর একটা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, রিপণ কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাঁহার কুযশে বাংলার শিক্ষিত-সমাজ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ নীরবে সেই নিন্দাবাদকে উপেক্ষা করিয়া অল্পদিন মধ্যেই জনসাধারণের চিত্তে আপনার পূর্ব্বতন প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার রিপণ কলেজের আইন বিভাগের অবৈধ আচার আচরণ লইয়া, একটা বিষম গোল বাধিয়া উঠে এবং

এই কলেজ একেবারে উঠিয়া যাইবার আশঙ্কা পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়। আর যে ভাবে তখন সুরেন্দ্রনাথ এই আসন্ন বিপদ হইতে আপনার কলেজটী রক্ষা করেন, তাহা লইয়াও শিক্ষিত বঙ্গসমাজের সর্ব্বত্র তাঁহার যে কুযশ রটনা হয়, সেরূপ কুযশকে ঠেলিয়া অন্য কোন লোকনায়ক স্বাদেশিক কর্ম্মক্ষেত্রে অটল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। আর শোকে সংযম, বিপদে ধৈর্য্য, নিন্দাপবাদে উপেক্ষা, প্রত্যক্ষ নিষ্ফলতার মধ্যেও অসাধারণ কর্ম্মোদ্যম, এ সকলই সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বজন্মসিদ্ধ যোগশক্তির প্রমাণ প্রদান করে। সুরেন্দ্রনাথের জীবনের কৃতিত্বের পশ্চাতে এই যোগশক্তিকে প্রত্যক্ষ না করিলে তাঁহার প্রকৃত মর্ম্ম ও মূল্য বোঝা অসম্ভব হইবে। সুরেন্দ্রনাথের এই সংযম, এই উপেক্ষা ও এই কর্ম্মোদ্যম, এ সকল উচ্চতম রাজসিকতারই লক্ষণ। এ সকলে সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ পুরুষকারেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনে পুরুষকার ও দৈব

কিন্তু এ সংসারে পুরুষকার যতই কেন প্রবল হউক না, দৈবের সঙ্গে যুক্ত না হইলে, তাহা কখনই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। সর্ব্ব বিষয়েই সিদ্ধি দৈব ও পুরুষকারের শুভ যোগাযোগের উপরে একান্তভাবে নির্ভর করে। সুরেন্দ্রনাথ আপনার কর্ম্মজীবনে যে অসাধারণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহার অনন্যসাধারণ পুরুষকারের ফল নহে। পুরুষকার আমাদিগের ভিতরকারই কথা। আমাদের অন্তঃপ্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াই তাহা প্রকাশিত হয়। কিন্তু এই পুরুষকারের দ্বারা আমাদের জীবনের বাহিরের অবস্থা ও ব্যবস্থার সৃষ্টি বা পরস্পরের যোগাযোগ সাধিত হয় না। এ সকল যোগাযোগ দৈবই সংঘটন করিয়া থাকে। নেপোলিয়ানের অসাধারণ পুরুষকার লোকপ্রসিদ্ধ। কিন্তু ফরাসীবিপ্লবের তরঙ্গমুখে না পড়িলে, আর যেসকল আদর্শের প্রেরণায়

এবং যেসকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শক্তি-সংঘর্ষে সেই মহাবিপ্লবের সূচনা হয়, তাহার অনুকূলতা না পাইলে, সে অলোকসামান্য পুরুষকার কখনই স্ফুরিত হইত না এবং স্ফুরিত হইলেও কখনই আপনার সম্যক্ চরিতার্থতা লাভে সমর্থ হইত না। আর যেসকল ঘটনাসম্পাতে ও যেসকল ব্যবস্থা ও অবস্থার যোগাযোগে নেপোলিয়ানের পুরুষকার স্ফুরিত ও কৃতার্থ হইয়াছে, তাহা তাঁহার স্বকৃত নহে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপেই দৈবকৃত। সুরেন্দ্রনাথের পুরুষকারের আত্মপ্রতিষ্ঠাতেও এই দৈবের কার্য্যই প্রত্যক্ষ রহিয়াছে।

যে সকল বিশেষ অবস্থা ও ব্যবস্থাদির যোগাযোগে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষকার আত্মপ্রকাশের অনুকূল এবং সময়োচিত অবসর প্রাপ্ত হয়, তাহা দৈবেরই কার্য্য। এরূপ ক্ষেত্র ও অবসর না পাইলে সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবন যে অসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছে, তাহা কখনই লাভ করিতে পারিত না : ফলতঃ সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা অতিশয় অলোকসামান্য, কিম্বা তাঁহার পাণ্ডিত্যের গভীরতা বা প্রসার যে খুবই বেশী, তাহা নহে। তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনীষী তাঁর পূর্ব্বেও অনেক এই বাংলাদেশে জন্মিয়াছেন ; তাঁর জীবনকালেও অনেক ছিলেন এবং আছেন। কৃষ্ণদাসের মত রাষ্ট্রীয় বুদ্ধি কিম্বা রাজেন্দ্রলালের মত পাণ্ডিত্য সুরেন্দ্রনাথের কখনই ছিল না। এমন কি কোনো কোনো দিক দিয়া শিশিরকুমারের প্রতিভাও সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল বলিয়াই মনে হয়। অথচ সুরেন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, ইহাদের কেহই সে কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষকারের সঙ্গে দৈবের যে অনুকূল যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে, এ দেশের তাঁর সমসাময়িক কিম্বা অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কোনো লোকনায়কগণের ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। কৃষ্ণদাস, রাজেন্দ্রলাল, শিশিরকুমার আপন আপন শক্তি অনুসারে সকলেই স্বদেশের

সেবা করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের সাধনবলে বাংলার আধুনিক রাষ্ট্রীয়জীবন অনেক পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে ইহাদের কাহারো নাম থাকিবে কি না সন্দেহ। পণ্ডিতসমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিয়া অনেক দিন রাজেন্দ্রলালের খ্যাতি থাকিবে। বাংলার আধুনিক রাষ্ট্রীয়জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে কৃষ্ণদাসের এবং শিশিরকুমারের নামও কতকটা থাকিবারই কথা। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের দেশীয় সংবাদপত্রের ইতিহাসেও এই দুই বাঙ্গালী সংবাদপত্র সম্পাদকের নাম কতকটা থাকিয়া যাইবে। কারণ "হিন্দু-প্যাট্রিয়ট" ও "অমৃত-বাজার"কে উপেক্ষা করিয়া এদেশের আধুনিক সংবাদপত্রের ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নহে। কিন্তু আধুনিক ভারতের ইংরেজি-শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের জীবনে ও চরিত্রে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিভা ও পুরুষকার যে শক্তিসঞ্চার করিয়াছে, কৃষ্ণদাস কিম্বা রাজেন্দ্রলাল কিম্বা শিশিরকুমার হইতে তাহা হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি ইহার একটা প্রধান কারণ বটে; কিন্তু কেবল এই বাগ্মিতাপ্রভাবেই সুরেন্দ্রনাথ এই কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিতেন না।

সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা-শক্তি

সত্য বলিতে কি, সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতাশক্তিও যে অত্যন্ত উচ্চ-অঙ্গের এমন কথাও বলা যায় কি না সন্দেহ। সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজি-বক্তৃতার শব্দ-সম্পদ অতি অদ্ভুত, ইহা অস্বীকার করা যায় না। ভারত-বর্ষের বক্তাদের ত' কথাই নাই, ইংরেজ বাগ্মিগণের বক্তৃতাতেও এরূপ অসাধারণ শব্দসম্পদ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কিন্তু সুললিত শব্দযোজনায় সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা যে অনন্যসাধারণ দক্ষতালাভ করিয়াছে, চিন্তার গভীরতায় কিম্বা ভাবের মৌলিকতায় অথবা যুক্তিপরাম্পরা-প্রয়োগে

কোনো সিদ্ধান্ত বিশেষের প্রতিষ্ঠার নিপুণতায় সেরূপ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা বহুল পরিমাণে ধ্বন্যাত্মক। সঙ্গীতের শক্তিও এইরূপই ধ্বন্যাত্মক। আর সঙ্গীত যেমন ধ্বন্যাত্মক স্বরগ্রামের দ্বারা মানুষের চিত্তকে বিবিধ ভাবাবেগে উদ্বেলিত করিয়া তুলে, সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতাও সেইরূপ শক্তিশালী শব্দপ্রবাহের বলে শ্রোতৃবর্গের চিত্তে তড়িৎ-সঞ্চার করিয়া থাকে। সঙ্গীতের স্বরগ্রাম যতক্ষণ কর্ণপটাহ আহত করিতে থাকে, ততক্ষণই যেমন তার প্রভাব চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখে, কিন্তু সে সুরলয় প্রবাহ যখন বন্ধ হইয়া যায় তখন তার অশরীরী স্মৃতিমাত্র পড়িয়া থাকে, কিন্তু তার মধ্যে ধরিবার ছুঁইবার বড় বেশী কিছু থাকে না; সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার শব্দপ্রবাহও সেইরূপ ফলই উৎপাদন করে। যতক্ষণ তাঁহার কণ্ঠস্বর কানে বাজিতে থাকে, ততক্ষণ তার উন্মাদিনী উদ্দীপনা চিত্তকে চঞ্চল করিয়া রাখে, কিন্তু কর্ণের সঙ্গে সেই শব্দস্রোতের যোগ বিচ্ছিন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে উদ্দীপনার নেশাও ধীরে ধীরে ছুটিতে আরম্ভ করে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তার স্মৃতিমাত্রই জাগিয়া রহে; সে বক্তৃতার চিন্তাযুক্তির প্রভাব শ্রোতৃবর্গের জ্ঞান ও চরিত্রকে অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সুরেন্দ্রনাথ কেবল আপনার অসাধারণ বাগ্মিতাবলেই যে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না।

আর সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার এই অদ্ভুত শব্দসম্পদও প্রকৃতপক্ষে সহজসিদ্ধ নয়। যে সকল সাহিত্যিকের শব্দসম্পদ সহজসিদ্ধ, তাঁহাদের শব্দ-বিন্যাসের অন্তরালে সর্ব্বদাই হয় ভাবরাজ্যের কিম্বা জ্ঞানরাজ্যের কিম্বা বাহিরের বিষয়-জগতের কিম্বা সামাজিক ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার একটা অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা বিদ্যমান থাকে। এই বস্তুতন্ত্রতা হইতেই সহজসিদ্ধ সাহিত্যিকের শব্দশক্তি উৎপন্ন হয়। যে সকল লেখক ও বক্তার শব্দসম্পদ সহজসিদ্ধ, তাঁহাদের রচনা বা বক্তৃতার প্রভাব সাময়িক

উদ্দীপনাতেই পর্য্যবসিত হয় না; কিন্তু পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের জ্ঞানে ও জীবনে সর্ব্বদাই স্বল্পবিস্তর স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। যাঁহাদের শব্দ-সম্পদ সহজসিদ্ধ নয় কিন্তু কঠোর সাধনালব্ধ, তাঁহাদের সাহিত্যচেষ্টা অনেক সময় বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়া এই স্থায়ী ফললাভে অসমর্থ হয়। সুরেন্দ্রনাথের শব্দসম্পদও সাধনলব্ধ। তাঁহার স্মৃতি-শক্তি অসাধারণ। এই স্মৃতিবলে অনেক শব্দসম্পদশালী ইংরেজ লেখকের গ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া আছে। এই সকল ইংরেজ লেখকের শব্দসম্পদ আয়ত্ত করিয়াই সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা এমন সম্পত্তিশালী হইয়াছে। আর পরধনপুষ্ট বলিয়া সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতার শব্দ-শক্তির পশ্চাতে সর্ব্বদা কোনও সজীব বস্তুতন্ত্রতা বিদ্যমান থাকে না এবং এই কারণেই তাহার উদ্দীপনাও স্থায়ী হয় না। এ সকল সত্ত্বেও প্রধানতঃ আপনার বাগ্মিতাবলেই সুরেন্দ্রনাথ আধুনিক ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় চিন্তায় ও কর্ম্ম-জীবনে স্থায়ী প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পুরুষকারই ইহার একমাত্র হেতু নহে, ইহার অন্তরালে দৈবপ্রভাবও প্রত্যক্ষ হয়।

দেশকালের যথাযোগ্য যোগাযোগ ব্যতীত এ জগতে কি সাংসারিক কি পারমার্থিক কোনো প্রকারের সাধনাতেই লোকে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। আর দৈবকৃপায় সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনে এই যোগাযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই তিনি এতটা সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছেন। সুরেন্দ্রনাথ আজি পর্য্যন্তও তাঁর স্বদেশের প্রাণবস্তুর সংস্পর্শ লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁর কর্ম্মজীবনের প্রথমে যে তিনি এই প্রাণস্রোতের একান্ত বাহিরে পড়িয়াছিলেন, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক ইংরেজি-শিক্ষিত স্বদেশবাসিগণের সকলেরই এই অবস্থা ছিল। সেকালে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ ইংরেজিতেই কথা-বার্ত্তা ও পত্র ব্যবহার করিতেন, ইংরেজি ধরণেই চিন্তা করিতেন, ইংরেজি সাহিত্যের অলঙ্কারাদি অবলম্বনেই নিজেদের ভাবাঙ্গ সাধনের

চেষ্টা করিতেন। ইংরেজ সমাজের আদর্শে নিজেদের সমাজকে এবং ইংলণ্ডের রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুযায়ী আপনাদের রাষ্ট্রীয় জীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ইঁহারা সকলেই স্বল্পবিস্তর লালায়িত ছিলেন। এই অবস্থায় যে সুরেন্দ্রনাথের ইংরেজি শব্দ-সম্পদ-পুষ্ট, ইংরেজি অলঙ্কার-ভূষিত, ইংরেজি ভাবে অনুপ্রাণিত, য়ুরোপীয় ইতিহাসের দৃষ্টান্তে উদ্দীপিত বাগ্মিতা তাঁহার স্বদেশের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, ইহা কিছুই বিচিত্র নহে।

ইংরেজি-শিক্ষা, স্বাধীনচিন্তা ও ব্যক্তিত্বাভিমান

ইংরেজি শিক্ষা এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে একটা প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমান জাগাইতেছিল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাধনা এই ব্যক্তিত্বাভিমানকেই সত্য স্বাধীনতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। প্রাচীন যুগের য়ুরোপীয় সাধনায় এই ব্যক্তিত্ববোধ—ইংরেজিতে যাহাকে sense of personality বলে—ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। গ্রীসীয় সাধনা জনসমাজকে অঙ্গীরূপে এবং সেই সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে অঙ্গরূপেই দেখিয়াছিল। অঙ্গীকে ছাড়িয়া যেমন অঙ্গের কোন সার্থকতা নাই ও থাকা সম্ভবে না, সেইরূপ সমাজকে ছাড়িয়াও সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কোনো স্বতন্ত্র সার্থকতা যে আছে বা থাকিতে পারে, গ্রীসীয় সাধনায় এই জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই। সুতরাং গ্রীসে যে সকল ব্যক্তি সমাজ-জীবনের পরিপুষ্টিসাধনে একান্ত অসমর্থ হইত, তাহাদিগের বাঁচিয়া থাকারও কোন প্রয়োজন ছিল না। সমাজের ঐকান্তিক আনুগত্যই সে দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত। যেমন গ্রীসে সেইরূপ প্রাচীন ইহুদায়ও কোনো প্রকারের ব্যক্তিত্ববোধ জাগিতে পায় নাই। ইহুদীয় সাধনা জনসমাজের সমষ্টিগত সার্থকতাই উপলব্ধি করিয়াছিল। ব্যষ্টিভাবে

সমাজের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিরও যে একটা নিজস্ব লক্ষ্য ও সার্থকতা আছে, এই জ্ঞান ইহুদীয় চিন্তাতে ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। প্রথম যুগের খৃষ্টীয় সাধনা এক দিকে ইহুদীয় এবং অন্য দিকে গ্রীসীয় ও রোমক সাধনার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং রোমক ব্যবহার-তন্ত্রের প্রভাবে এই নূতন খৃষ্টীয় সাধনায় কিয়ৎ পরিমাণে পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কার সম্বন্ধে একটা ব্যক্তিত্ববোধ জাগিলেও বহুদিন পর্য্যন্ত প্রকৃত ব্যক্তিত্ব-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ইহুদীয় সমাজতন্ত্র এবং গ্রীসীয় ও রোমক রাষ্ট্র-তন্ত্রের স্থানে নূতন খৃষ্টীয় সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়া খৃষ্টীয়ান জনমণ্ডলীর ব্যক্তিত্বাভিমানকে এখানেও চাপিয়া রাখিতে লাগিল। ইহুদায় ও গ্রীস যেমন সমাজান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে একান্তভাবে সমাজশক্তির ও রাষ্ট্র-শক্তির অধীন করিয়া রাখিয়াছিল, প্রথম যুগের খৃষ্টীয় সাধনাও সেইরূপ খৃষ্টীয়ান জনসাধারণকে একান্তভাবে খৃষ্টীয় সঙ্ঘের অধীন করিয়া রাখে। প্রভুশক্তির রূপান্তর ও নামান্তর হইল মাত্র, কিন্তু জন-মণ্ডলীর ঐকান্তিক পরাধীনতার কোন পরিবর্ত্তন হইল না। এইরূপে যেমন প্রাচীন গ্রীক ও রোমক তন্ত্রে, সেইরূপ নূতন খৃষ্টীয় তন্ত্রেও জনগণের ব্যক্তিত্ব মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা হয় নাই। বহু শতাব্দ ব্যাপিয়া একদিকে পৌরোহিত্য-প্রধান রোমক খৃষ্টীয় সঙ্ঘ ও অন্যদিকে স্বেচ্ছাচারী প্রজারঞ্জন-বিমুখ খৃষ্টীয়ান ভূপতিবর্গ, উভয়ে মিলিয়া য়ুরোপীয় জনমণ্ডলীর অন্তর্বাহ্য সর্ব্বপ্রকারের স্বাধীন চেষ্টাকে একান্তভাবে অবরুদ্ধ করিয়া, তাহাদের প্রাণগত ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্বকে নিতান্ত নির্জীব করিয়া রাখিয়াছিলেন। ধর্ম্মের প্রামাণ্যবিচারে স্বাভিমতের এবং রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যাপারে লোক-মতের কোনই অধিকার ও মর্য্যাদা ছিল না। রোমক সঙ্ঘের প্রধান পুরোহিত বা পোপ একদিক দিয়া লোকের ধর্ম্মজীবনে আপনাকে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অন্যদিকে খৃষ্টীয়ান রাজন্যবর্গও জনগণের সাংসারিক কর্ম্মজীবনে ঐশ্বরিক মর্য্যাদার দাবী

করিয়া তাহাদিগকে নিজেদের পদানত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ষোড়শ খৃষ্টীয় শতাব্দীতে রোমান ক্যাথলিক পৌরোহিত্যের অতিপ্রাকৃত প্রভুত্বের প্রতিবাদ করিয়া মার্টিন লুথার খৃষ্টীয় জগতে ধর্ম্মের প্রামাণ্যবিচারে জনগণের স্বাভিমতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন হইতেই খৃষ্টীয় সমাজে স্বাধীন চিন্তার বা Free Thought এর উন্মেষ হইতে আরম্ভ করে। মার্টিন লুথার রোমক সঙ্ঘের অধিপতি পোপের অতিপ্রাকৃত প্রভুত্বের দাবীই অগ্রাহ্য করেন; কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের অতি-প্রাকৃত প্রামাণ্য অস্বীকার করেন নাই। বাইবেলের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া তিনি প্রত্যেক খৃষ্টীয়ান্ সাধক ও যজমানকে, ভগবৎ প্রেরণাধীন হইয়া, আপনাদের ধর্ম্মগ্রন্থের যথাযথ মর্ম্ম নির্দ্ধারণের অধিকার প্রদান করেন। রোমক খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রের মর্ম্ম নির্দ্ধারণের জন্য অতিপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন গুরুরই কেবল প্রতিষ্ঠা ছিল, কিন্তু সাধারণ খৃষ্টীয় সাধক ও সাধনার্থী জনমণ্ডলীর স্বাভিমতের কোনই স্থান ছিল না। মার্টিন লুথার যে সংস্কৃত খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার করেন, তাহাতে শাস্ত্র ও স্বাভিমতের প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু সদ্‌গুরুর কোনো স্থান হয় নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেই প্রাচীন কালের ধর্ম্মজীবন ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। সুতরাং এই সকল শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে হইলে দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যার বলে তাহার অনুরূপ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা আবশ্যক হয়। সর্ব্বপ্রকারের গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাবিহীন প্রাকৃত জনের পক্ষে কেবল ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তির কিম্বা লৌকিক ন্যায়ের যুক্তির বলে অলৌকিক আধ্যাত্মিক সম্পদসম্পন্ন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের উপদেশের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করা একান্তই অসম্ভব। সে অদ্ভুত চেষ্টা সর্ব্বদাই বন্ধ্যার পুত্রশোকের ব্যথার ন্যায় কল্পিত ও অলীক হইবে। কেবল সন্তানবতী রমণীই যেমন আপনার অন্তরের বাৎসল্য-রসের অভিজ্ঞতার দ্বারা অপরের মাতৃ-স্নেহের

একরূপ' হয়

প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন; সেইরূপ অনন্য-সাধারণ সাধন-সম্পদ সম্পন্ন সদ্‌গুরুগণই নিজেদের গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার দ্বারা পুরাতন শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হন। প্রত্যেক বিদ্যার শাস্ত্রই, বহুকালব্যাপী সাধনা দ্বারা যাঁহারা সেই বিদ্যাকে প্রকৃত-ভাবে অধিগত করিয়াছেন, সেইরূপ অধ্যাপক ও আচার্য্যগণের শিক্ষার সত্যাসত্যের সাক্ষ্য দেয়; আর এই সকল অধ্যাপক এবং আচার্য্যগণও নিজেদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বলে আপনাদের বিদ্যাসম্বন্ধীয় শাস্ত্রের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হন। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম উদ্ঘাটনে সদ্‌গুরুর প্রামাণ্য ও প্রয়োজন নাই, এ কথা বলিলে চলিবে কেন? অথচ মার্টিন লুথার প্রবর্ত্তিত Protestant খৃষ্টীয় সাধনা ধর্ম্মসাধনে যেমন শাস্ত্রের ও স্বাভিমতের সেইরূপ সদ্‌গুরুরও যে একটা সঙ্গত স্থান ও অধিকার আছে, ইহা অস্বীকার করে। ইহার ফলে প্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম নির্দ্ধারণে প্রাকৃত জনের অসংস্কৃত বিচারবুদ্ধি এবং লৌকিক ন্যায়ের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অনুমান ও উপমান এই প্রমাণত্রয়ই একমাত্র কষ্টিপাথর হইয়া দাঁড়ায় এবং ক্রমে প্রাকৃত বুদ্ধি বিচারের প্রাবল্য হেতু শাস্ত্রের প্রামাণ্য মর্য্যাদাটুকুও একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপেই য়ুরোপে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর স্বাধীন চিন্তার বা Free Thought-এর এবং যুক্তিবাদের বা Rationalism-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এই স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিবাদ প্রবল হইয়াই য়ুরোপীয় লোকচরিত্রে একটা অসংযত ও অসঙ্গত ব্যক্তিস্বাভিমান জাগাইয়া তুলে। এই ব্যক্তিস্বাভিমানই ফরাসী বিপ্লবের তরঙ্গ-মুখে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মচরিতার্থতা লাভের চেষ্টা করে। আমার বুদ্ধি যাহা সত্য বলে তাহাই কেবল সত্য, সত্যের আর কোনো বাহিরের প্রামাণ্য নাই, আমার সংজ্ঞান বা Conscience যাহাকে ভাল বলে তাহাই ভাল,— ইহার উপরে ভাল-মন্দের আর কোনো উচ্চতর বিচারক নাই—এই বস্তুকেই অষ্টাদশ ও

উনবিংশ খৃষ্ট শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাধনা স্বাধীন চিন্তার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে। এই স্বাধীন চিন্তার প্রভাবেই য়ুরোপে স্বাধীনতার নামে একটা অসংযত ব্যক্তিস্বাভিমান জাগিয়া উঠে এবং ইহার ফলে ক্রমে সমাজের গ্রন্থি শিথিল, ধর্ম্মের প্রভাব ম্লান এবং আধ্যাত্মিক জীবনের শক্তি ও সত্য ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে।

আধুনিক ভারতে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার

ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরেও এই য়ুরোপীয় স্বাধীন চিন্তার ও যুক্তিবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে এবং তাঁহাদের প্রাণে স্বাধীনতার নামে একটা অসংগত ব্যাক্তিস্বাভিমান জাগিয়া আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের সূত্রপাত করে। এই ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের চেষ্টায় বহুবিধ ভ্রম-ত্রুটী এবং অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আধুনিক ভারতের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন গঠনের জন্য তাহা যে একান্তই প্রয়োজন ছিল, এ কথা কিছুতে অস্বীকার করা যায় না। পূর্ব্ব সংস্কার বর্জ্জিত না হইলে কেহ এ জগতে সত্যের সাধনা করিতে পারে না। এই সংস্কার বর্জ্জনের নামই চিত্তশুদ্ধি। কি ব্যক্তি, কি সমাজ উভয়েরই আত্মচরিতার্থতা লাভের জন্য এই চিত্তশুদ্ধির আবশ্যক হয়। 'নেতি'র ভিতর দিয়াই 'ইতি'তে যাইতে হয়। ব্যতিরেকী পন্থার পরেই অন্বয়ী পন্থার প্রতিষ্ঠা। ইহাই আমাদিগের প্রাচীন বেদান্তের শিক্ষা। ইংরেজ মনীষী কার্লাইল Through Eternal Nay to Eternal Yea, এই সূত্রে আমাদের এই প্রাচীন উপদেশেরই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সমাজের সকল অযৌক্তির বন্ধন ছেদন করিতে উদ্যত হইয়া, ধর্ম্মের শাস্ত্রবদ্ধ সকল অনুশাসন অগ্রাহ্য করিয়া, কেবল আপনার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধি ও সংজ্ঞানের উপরে দাঁড়াইতে যাইয়া, আমাদিগের দেশের

আধুনিক শিক্ষা-প্রাপ্ত সম্প্রদায় এই নেতি বা "না"-এর পথ ধরিয়াই নিজেদের ও সমাজের চিত্তশুদ্ধি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ যেরূপ আগ্রহ সহকারে ও যতটা স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়া এই নূতন ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন, ভারতের আর কোনো প্রদেশের লোকে সেরূপ করেন নাই। আর এই সাধন বলেই আধুনিক স্বাধীনতার আদর্শ বাংলা দেশে যতটা ফুটিয়া উঠিয়াছে ভারতের আর কোথাও সেরূপ ফুটিয়া উঠে নাই।

বাংলার স্বাধীনতার ও স্বদেশ-চর্য্যার আদর্শ

ফলতঃ যে যাহাই বলুন না কেন বাংলার নিকট হইতেই যে ভারতের অপরাপর প্রদেশবাসিগণ বহুল পরিমাণে এই আধুনিক স্বাধীনতার ও স্বদেশচর্য্যার উদ্দীপনা লাভ করিয়াছেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সমগ্র ভারত যখন নিদ্রিত, কেবল বাংলাই তখন জাগিয়া উঠিয়াছিল। ব্রিটিশ ভারতের অন্য কোন প্রদেশে যখন ব্যক্তিগত বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার হয় নাই, বাঙ্গালী তখন এই মুক্তিমন্ত্র সাধনে নিযুক্ত ছিল। আর এই জন্যই বাংলার স্বাধীনতার আদর্শের পূর্ণতা ও সজীবতা, বাঙ্গালীর স্বাদেশিকতার ধর্ম্মপ্রাণতা ও একনিষ্ঠা এবং বাংলার রাষ্ট্রীয় জীবনের শক্তি ও শুদ্ধতা, এ সকল এ পর্য্যন্ত ভারতের অন্য কোন প্রদেশে দেখা যায় নাই। অন্যান্য প্রদেশের ধর্ম্মসংস্কার-চেষ্টা একদিকে নূতনকেও নিঃসঙ্কোচে আলিঙ্গন করিতে সমর্থ হয় নাই এবং অন্যদিকে পুরাতন বা সনাতন প্রাণ-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া তাহাকেও সজীব ও সময়োপযোগী করিয়া তুলিতে পারে নাই, কিন্তু নূতনের কুযুক্তি এবং পুরাতনের কুসংস্কারের মধ্যে একটা খিচুড়ি পাকাইবারই চেষ্টা করিয়াছে। সমাজ সংস্কার চেষ্টাতেও অন্যান্য প্রদেশে এইরূপ অসঙ্গতিদোষ দেখা

গিয়াছে। সমাজ সংস্কার করিতে যাইয়া বাংলা আপনার বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী শুদ্ধ শ্রেয়ের পথই ধরিতে চাহিয়াছে, প্রেয়ের পথে চলিবার জন্য ব্যস্ত হয় নাই, কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের সমাজ সংস্কারের চেষ্টাতে ন্যায়ের প্রেরণা অপেক্ষা সুখের প্রলোভনই বলবত্তর হইয়া আছে; সত্যের অনুগত্য অপেক্ষা সুবিধার অন্বেষণই তাহাতে বেশী। অন্যান্য প্রদেশের রাষ্ট্রীয় চেষ্টার মধ্যেও এখনও পর্য্যন্ত একটা সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু বাংলার রাষ্ট্রীয় আদর্শ চিরদিনই সমগ্র ভারতের মৌলিক একত্বের উপরে আপনাকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। সেইরূপ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রকৃত স্বাধীনতার আদর্শও ফুটিয়া উঠে নাই, কেবল বাংলা দেশেই তাহা ফুটিয়াছে। আর অন্যান্য প্রদেশের স্বাদেশিকতাও একদিকে ভারতের সনাতন সভ্যতা এবং সাধনার উপরেও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আর অন্যদিকে আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠতম মানব-হিতৈষা ও বিশ্ব-কল্যাণ-কামনার সঙ্গেও যুক্ত হয় নাই। এই স্বাদেশিকতা কোথাও বা একটা অন্ধ, অযৌক্তিক স্থবির ও গতানুগতিক রক্ষণশীলতার আর কোথাও বা একটা শ্রেয়-জ্ঞানশূন্য প্রেয়-সন্ধিৎসু বিজাতীয় পরজাতি বিদ্বেষেরই নামান্তর ও রূপান্তর মাত্র হইয়া আছে। অনেক স্থলেই এই স্বাদেশিকতার সঙ্গে বিশ্ব-কল্যাণ-কামনার যথোপযোগী সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেবল বাংলা দেশেই আধুনিক স্বাদেশিকতার বা Nationalism-এর পূর্ণ আদর্শ অনেকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর ইহার কারণ এই যে ইদানীন্তন কালে বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজ স্বাধীনতার ও স্বাদেশিকতার যে উন্নত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, ভারতের অন্য কোন প্রদেশবাসিগণ এ পর্য্যন্ত সে শিক্ষা লাভ করিবার অবসর পান নাই। বাংলার এই আধুনিক স্বাধীনতার ও স্বাদেশিকতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নানা দিকে নানা লোক নানা চেষ্টা করিয়াছেন, সত্য; কিন্তু এই নূতন সাধনার প্রথম যুগের প্রধান

দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু তিনজন,—রামমোহন, কেশবচন্দ্র ও সুরেন্দ্রনাথ।

নবযুগের আদর্শ ও রাজা রামমোহন

বাংলার এবং বস্তুতঃ সমগ্র ভারতবর্ষেরই, আধুনিক ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের প্রথম গুরু রাজা রামমোহন। ইংরেজি শিক্ষায়, ইংরেজের শাসনে য়ুরোপীয় সভ্যতা ও সাধনার সংস্পর্শে এদেশে যে অভিনব আদর্শ ফুটিতে আরম্ভ করে, রামমোহনের অলোকসামান্য প্রতিভাই সম্যক্‌রূপে তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই আদর্শকে স্বদেশের পুরাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে মিলাইয়া, কিরূপে তাহার পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে, ইহা দেখাইয়া দিয়াছে। রাজা রামমোহন কিরূপে সমাজ জীবনের সকল বিভাগে এই নূতন যুগধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, তাহার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি আপনার জীবনে ও উপদেশাদিতে যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্বাদেশিকতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে, নানা দিক্ দিয়া, ঋজুকুটিলভাবে বিগত শত বৎসর ধরিয়া দেশের শ্রেষ্ঠজনেরা নিজ নিজ শক্তিসাধ্য অনুসারে সেই আদর্শেরই সাধনা করিয়া আসিয়াছেন। এই শতাব্দব্যাপী সাধনার বলে সেই আদর্শ ক্রমে ক্রমে স্ফুটতর হইয়া উঠিয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হয় নাই।

কিন্তু রামমোহন সম্পূর্ণ যুগ-আদর্শ প্রত্যক্ষ এবং প্রকাশিত করিয়াও আপনার কর্ম্মজীবনে বিশেষভাবে তার ভাব বা theoretic sideই ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন। পূর্ব্বতন যুগের সঞ্চিত কর্ম্মক্ষয় ও তাহার প্রাণহীন সংস্কার ও অর্থহীন কর্ম্মজঞ্জাল পরিষ্কার করিবার চেষ্টাতেই তাঁহার সমুদায় সময় ও শক্তি নিয়োজিত হয়। রামমোহনের শিক্ষা সমাজ-জীবনের সকল অঙ্গকেই অধিকার করিয়াছে, সত্য। একদিকে যেমন

ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গ ও সাধনাঙ্গ, উভয় অঙ্গকেই তিনি সুশোভিত ও সুসংস্কৃত করিয়া, প্রাচীন ঋষিপন্থা অবলম্বনে তাহাকে সত্যোপেত ও সময়োপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেইরূপ অন্যদিকে সমাজজীবনেও যে সকল অহিতাচার পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারও সংস্কার সাধনে সময়োচিত যত্ন করিতে ক্রটী করেন নাই। আর দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনেও যাহাতে প্রজাসাধারণের স্বত্ব-স্বাধীনতার সম্প্রসারণ হয়, রাজা রামমোহন সে দিকেও যথাসাধ্য যত্ন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্ম্মজীবনের এই ব্যাপকতা ও বহুমুখীনতা সত্ত্বেও রামমোহন বিশেষভাবে ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোনও একান্ত ধর্ম্মপ্রাণ সমাজে কোনও নূতন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, সর্ব্বাদৌ তাহাকে ধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ফুটাইয়া তুলিতে হয়, নতুবা সে আদর্শ সে সমাজের ধর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য রাজা রামমোহন নবযুগের সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও তাঁহার কর্ম্মের ঝোঁক যে ধর্ম্মের সংস্কার কার্য্যের উপরেই বেশি পড়িয়াছিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

রামমোহনের স্বাধীনতার আদর্শ

স্বাধীনতাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। ধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গে ও সাধনাঙ্গে এই দুই দিকেই রাজা বিশেষভাবে এই স্বাধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এক দিক দিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় সাধনার স্বাধীনতার আদর্শের সঙ্গে রাজার আদর্শের যোগ ও মিল থাকিলেও, ইহা সর্ব্বতোভাবে সেই আদর্শ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর ছিল। আর স্বদেশের সনাতন সভ্যতা ও সাধনার সঙ্গে রাজার যে গভীর আধ্যাত্মিক যোগ ছিল, তাহাই তাঁহার স্বাধীনতার আদর্শের এই শ্রেষ্ঠত্বের মূল কারণ। রাজা বৈদান্তিক সাধনের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এই জন্য বৈদান্তিক মুক্তির আদর্শের সঙ্গে

রাজা রামমোহনের স্বাধীনতার আদর্শের অতি নিগূঢ় যোগ ছিল। বেদান্ত মার্গ অবলম্বন করিয়া, ইদং প্রত্যয়বাচক সর্ব্ববিধ অনাত্মা-বস্তুর ঐকান্তিক অধীনতা হইতে অহং প্রত্যয়বাচক আত্ম-বস্তুকে মুক্ত করাই রাজা রামমোহনের শিক্ষা ও সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার ধর্ম্মের শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা সকলই এই আদর্শের অনুযায়ী ছিল। রাজার বহুমুখী সাধনার প্রত্যেক ও সকল বিভাগের সঙ্গেই একটা অতি গভীর ও ঘনিষ্ঠ মোক্ষ সম্পর্ক ছিল। আর এই মোক্ষ সম্বন্ধই রাজার আদর্শকে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শ হইতে পৃথক্ রাখিয়াছে। দেশ-প্রচলিত কর্ম্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাজার তীব্র প্রতিবাদ তাঁহার এই বৈদান্তিক আদর্শের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু বেদান্ত সিদ্ধান্তের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াও রাজা সম্পূর্ণরূপে শঙ্কর বেদান্তের মায়াবাদ গ্রহণ করেন নাই। অন্য দিকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সগুণ ব্রহ্মবাদকেও একান্তভাবে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শঙ্কর সিদ্ধান্ত ও রামানুজ সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়া, ভারতের প্রাচীন ঋষিপন্থার সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপের উচ্চতম সামাজিক আদর্শের একট অপূর্ব্ব সঙ্গতি সাধন করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজের পরবর্ত্তী আচার্য্যগণের ন্যায়, রামমোহন কি তত্ত্ববিচারে কি ধর্ম্মসাধনে একান্তভাবে শাস্ত্রগুরুর অধিকার ও প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করেন নাই। কিয়ৎ-পরিমাণে মার্টিন লুথারের মত রাজা রামমোহনও শাস্ত্রনির্দ্ধারণে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের ন্যায় শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও অধিকার একেবারে অস্বীকার করেন নাই। আবার অন্যদিকে লুথারের ন্যায় তিনি শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণে সদ্গুরুর প্রয়োজন অগ্রাহ্য করিয়া, কেবলমাত্র স্বানুভূতির উপরেই শাস্ত্রোপদেশের সত্যাসত্য নির্ণয়ের ভারও অর্পণ করেন নাই। এই জন্যই প্রোটেষ্ট্যাণ্ট খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তে শাস্ত্র ও স্বানুভূতির—Scripture

একথা' তের

এবং private judgmentএর মধ্যে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই, রামমোহন আপনার সিদ্ধান্তে, শাস্ত্রার্থ বিচারে সদ্‌গুরুর যথাযোগ্য স্থান ও অধিকার প্রদান করিয়া, অতি সহজেই সেই সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন। আর এইরূপেই রামমোহন তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম্মসাধনে ভারতের প্রাচীন এবং য়ুরোপের আধুনিক সাধনার উচ্চতম আদর্শের মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজার সামাজিক সিদ্ধি

যেমন তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম্মসংস্কারে, সেইরূপ আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তেও রাজা রামমোহন প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের সাধনার মধ্যে একটা অতি সুন্দর সঙ্গতি স্থাপন করিয়াই আমাদিগের বর্ত্তমান যুগ-আদর্শকে সামাজিক জীবন সম্বন্ধেও একই সঙ্গে স্বাদেশিক ও সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। সমাজ-জীবনের শৈশবে জগতের সর্ব্বত্রই সমাজের কর্ম্ম-বিভাগ বংশ-মর্য্যাদা অনুসরণ করিয়া চলে। যার যে বংশে জন্ম, সেই বংশের পুরুষানুক্রমিক কর্ম্ম ও অধিকারই সমাজ জীবনে তার নিজেরও কর্ম্ম ও অধিকার হয়। যখন পিতা বা পিতৃব্য বা তাঁহাদের অভাবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রত্যেক শিশুর একমাত্র দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু ছিলেন, পরিবারের বাহিরে যখন বাল্য-শিক্ষার কোনো বিশেষ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তখন কোনো ব্যক্তির পক্ষে পৈত্রিক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায়ান্তর গ্রহণে জীবিকা উর্জ্জপান করা একান্ত অসাধ্য না হইলেও, নিতান্তই দুঃসাধ্য ছিল, সন্দেহ নাই। সে অবস্থায় ব্যক্তিবিশেষের কুলধর্ম্মই সমাজ-দেহে তাহার বিশেষ স্থান ও কর্ম্ম নির্দ্ধারণ করিত। আর সে সময়ে জনগণের কর্ম্ম ও অধিকারভেদ জন্মগত হইলেও প্রকৃত পক্ষে গুণ-কর্ম্ম বিভাগের উপরে

প্রতিষ্ঠিত ছিল। সমাজ বিজ্ঞানের এই ঐতিহাসিক তত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়াই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যাম্ ময়া সৃষ্টম্ গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

এই সাধারণ সমাজতত্ত্বের উপরেই হিন্দুর বর্ণ-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হিন্দু এই স্বাভাবিক কর্ম্মবিভাগের সঙ্গে আশ্রম চতুষ্টয়কে যুক্ত করিয়া এই বর্ণভেদের ভিতর দিয়া যে অভেদ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল, জগতের আর কোনো জাতি সমাজ-জীবনের শৈশব ও কিশোরে সেরূপ ব্যবস্থা করিতে পারে নাই। সুতরাং এই আশ্রম ধর্ম্মই প্রাচীন হিন্দু সাধনার সমাজতত্ত্বের বিশেষত্ব। কিন্তু কালক্রমে এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্মও যখন সামাজিক উন্নতি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহায় না হইয়া তাহার অন্তরায়ই হইয়া উঠিতে লাগিল, যখন ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-স্বভাব সুলভ সত্ত্বগুণ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রপ্রকৃতি সুলভ রজোগুণ হারাইয়া কেবল জন্মের দোহাই দিয়াই ব্রাহ্মণত্বের বা ক্ষত্রিয়ত্বের অধিকার ও মর্য্যাদা দাবী করিতে লাগিলেন, তখন সমাজের ও ব্যক্তির উভয়ের কল্যাণার্থ প্রাচীন কুলধর্ম্মকে অতিক্রম করাই আবশ্যক হইয়া উঠিল। এই জন্যই গীতায় ভগবান্ প্রথমে বর্ণাশ্রমের সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াও শেষে গুহ্যাদপি গুহ্যতম যে ধর্ম্মতত্ত্ব তাহার অভিব্যক্তি করিয়া বলিলেন :—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥

অতএব বর্ণাশ্রম-প্রধান হিন্দুর সমাজতত্ত্বেও সর্ব্ব কর্ম্ম ন্যাসপূর্ব্বক মহাজন পন্থা অবলম্বন করিয়া এই বর্ণাশ্রমের অধিকার অতিক্রম করিবারও প্রশস্ত পথ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আবার ইহাই প্রকৃত পক্ষে হিন্দুর সমাজতত্ত্বের ও সমাজনীতির শেষ শিক্ষা ও শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্ত। রাজা এই সিদ্ধান্তের উপরেই আপনার সামাজিক সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহার সঙ্গে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার শ্রেষ্ঠতম ও উচ্চতম সামাজিক সিদ্ধান্তের

সঙ্গতি সাধন করিয়াছিলেন। কর্ম্মসাধনই সামাজিক জীবনের উপজীব্য। কর্ম্মের ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে লাভ করাই সমাজ-জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য লাভের জন্য প্রথমে ঐকান্তিক সমাজানুগত্য, তৎপরে সমাজের এই আনুগত্য স্বীকার করিয়াও ভগবানে সমাজবিধি-নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বপ্রকারের কর্ম্মার্পণ, তার পরে মহাজনপদ আশ্রয় করিয়া এই সমাজানুগত্য বর্জ্জন ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ সাধন—এই ত্রিপাদেতে হিন্দুর কর্ম্মসিদ্ধান্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু মধ্য-যুগের হিন্দুয়ানী নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ ফলভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, লোক-সংগ্রহার্থে বর্ণাশ্রম-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই বুঝিয়া আসিয়াছে। এখনও অনেকে নিষ্কাম কর্ম্ম বলিতে ইহাই বুঝেন। রামমোহন মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর আশ্রম-বিরহিত সুতরাং ধর্ম্মহীন বর্ণভেদের উপরে প্রতিষ্ঠিত কর্ম্মজীবনের সংস্কার সাধনার্থে, প্রাচীন ঋষিপন্থা অবলম্বন করিয়া লোকশ্রেয়কে একমাত্র প্রকৃত নিষ্কাম কর্ম্ম বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এইরূপে তিনি প্রাচীন হিন্দু কর্ম্মতত্ত্বকে একদিকে সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র এবং অন্যদিকে সত্যভাবে স্বদেশী ও সার্ব্বজনীন করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। কি তত্ত্ববিচারে ও ধর্ম্মসাধনে, কি সামাজিক সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠায় ও সমাজ সংস্কারে, রামমোহন কোনো বিষয়েই আপনাকে স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনা, সংস্কৃতি ও সিদ্ধান্ত হইতে একান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করেন নাই।

কিন্তু এই উন্নত, উদার ও একই সঙ্গে স্বদেশী ও সার্ব্বজনীন যুগ-আদর্শ সাধনের যোগ্যতা এবং অধিকার তখনো দেশের লোকের জন্মায় নাই। রাজা আদর্শটাই দেখাইয়া দেন, কিন্তু সেই আদর্শ যেরূপ ক্ষেত্রে সাধন করিয়া আয়ত্ত করা সম্ভব, তখনও সে অনুকূল ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আর একদিক দিয়া কেশবচন্দ্র এবং অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ এই অনুকূল ক্ষেত্র গঠনের বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

কেশবচন্দ্র

রাজা যে উন্নত ও উদার ভূমিতে দাঁড়াইয়া এই অভিনব যুগ-আদর্শ প্রত্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সমাজের সাধারণ চিন্তা ও ভাবকে সেই ভূমিকে লইয়া যাইতে হইলে, সর্ব্বাদৌ তাহার সর্ব্ববিধ পূর্ব্ব-সংস্কার নষ্ট করা আবশ্যক ছিল। প্রত্যেক গঠন কার্য্যের পূর্ব্বেই কতকটা ভাঙ্গা আবশ্যক হয়। রাজাও যে কিছু ভাঙ্গেন নাই এমন নহে। কিন্তু তিনি ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই আবার গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক যুগসন্ধি কালে নূতনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রচলিত ও পুরাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষেরা কেবল এই সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াই ক্ষান্ত হ'ন না। কোথায়, কিরূপে এই সংগ্রামের শান্তি হইবে, কোন্ সূত্র ধরিয়া পুরাতনের ও নূতনের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি সাধন করিতে হইবে, তাঁহাদের সম্যক্ দৃষ্টি ইহাও প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা পুরাতনের অপূর্ণতাকে পরিপূর্ণ করিয়াই নূতনকে আপনার সফলতার দিকে প্রেরণ করেন এবং নূতনের অভিষেক দিয়া পুরাতনকেও সার্থক করিয়া তুলেন। কিন্তু যাঁহারা এই সকল মহাপুরুষের অনুবর্ত্তী হইয়া সমাজ-ক্ষেত্রকে তাঁহাদের প্রকাশিত যুগ-আদর্শের প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে ব্রতী হ'ন, তাঁহাদের এই মহাজন প্রতিভা-সুলভ সম্যক্ দর্শন থাকে না। থাকিলে, তাঁহারা যে বিশেষ কার্য্যে ব্রতী হ'ন, সেই কার্য্যের সফলতারই ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। ফলতঃ প্রাকৃতজনের মধ্যে সম্যক্ দর্শন সচরাচর সংস্কার-কার্য্যের গতি-বেগকে একান্তভাবে কমাইয়া দিয়া তাহাদিগের কর্ম্মোদ্যমকে বহুল পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য সংস্কারকের পক্ষে কর্ম্মোৎসাহের যতটা প্রয়োজন সম্যক্ দৃষ্টির ততটা প্রয়োজন নাই। একদেশদর্শিতা বেগবতী সংস্কারচেষ্টার জন্য একান্ত আবশ্যক। অতএব রাজা যে সমুন্নত যুগ-আদর্শ প্রকাশিত করেন, সেই আদর্শের যথাযোগ্য

একদশ' সত্তেরো

প্রতিষ্ঠার উপযোগী করিয়া সমাজক্ষেত্রকে গড়িয়া তুলিবার জন্য কেশব-চন্দ্রের প্রথম বয়সের অপেক্ষাকৃত একদেশদর্শী সংস্কার চেষ্টারই একান্ত প্রয়োজন ছিল। পরবর্ত্তীকালে, রাজার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আমাদের স্বদেশী-সমাজে প্রাচীন ভারতের ও আধুনিক য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতম আদর্শের মধ্যে যে উদার ও উন্নত সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, তাহারই প্রয়োজনে, কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভা, তাঁর প্রথম বয়সে, স্বল্পবিস্তর একদেশদর্শী ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল। কি ব্যক্তি, কি সমাজ, সকলেরই সত্যলাভের জন্য প্রথমে সর্ব্ববিধ পূর্ব্বসংস্কার-বর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্রের প্রামাণ্য, সদ্‌গুরুর মর্য্যাদা, সমাজবিধানের ধর্ম্মপ্রাণতা, এ সকলকে স্বল্পবিস্তর অস্বীকার না করিলে, মানসক্ষেত্র কদাপি সম্পূর্ণ সংস্কার-বর্জ্জিত ও নির্ম্মল হইতে পারে না। এই সর্ব্বগ্রাসী সন্দেহ ও অসত্যবোধ হইতেই ক্রমে খাঁটি ও সরল বিশ্বাস এবং সত্য আস্তিক্য বুদ্ধির সঞ্চার হয়। "নেতি" "নেতি" বলিয়াই "ইতিতে" পৌঁছিতে হয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে "নেতি" "নেতি" বলিয়া একেবারে পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব শূন্য করিয়া, পরে ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের একত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম,—এই মহাসত্যে উপনীত হইতে হয়। কেশবচন্দ্রের সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কার চেষ্টা রাজার আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া প্রথমে এই "নেতি"র পথ ধরিয়াই চলিয়াছিল। এ পথ সংগ্রামের পথ, সন্ধির পথ নহে। এ পথ শক্তির উচ্ছ্বাসের পথ, সংযমের পথ নহে। ইহা আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ, আত্ম-বিলোপের পথ নহে। এপথ ইংরেজিতে যাহাকে independene বা অনধীনতা বলে তার পথ ; সত্য স্বাধীনতার পথ নহে। এ পথে যাইয়া এক প্রকারের ফ্রিডমে (freedom) পৌঁছান যায়, কিন্তু উপনিষদ যাহাকে স্বারাজ্য বলিয়াছেন, সে বস্তু লাভ হয় না। এ পথ rights-এর পথ, দ্বন্দ্বের পথ ; reconciliation-এর পথ বা সামঞ্জস্য ও শান্তির পথ

নহে। কেশবচন্দ্র প্রথম বয়সে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার-ব্রতে ব্রতী হইয়া, এই স্বত্বের পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। শাস্ত্রের প্রাচীন অধিকারের বিরুদ্ধে অসংস্কৃত ও অসিদ্ধ স্বাভিমতের স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা; সমাজের বিধি-নিষেধাদির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তির স্বত্ব-প্রতিষ্ঠা;—ইহাই কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের কর্ম্মচেষ্টার মূল সূত্র ছিল। ধর্ম্মের ও নীতির আবরণের দ্বারা সুসজ্জিত হইলেও কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কার প্রয়াস সর্ব্ব বিষয়ে এই ব্যক্তিগত rights বা স্বত্বকেই জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিল। আর কেশবচন্দ্র ধর্ম্মসাধনে ও সমাজশাসনে যে ব্যক্তিগত অনধীনতার আদর্শকে জাগাইয়া তুলিয়া দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা নূতন শক্তির সঞ্চার করেন, সুরেন্দ্রনাথ সেই আদর্শকেই রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাইয়া আপনার অনন্যপ্রতিযোগী ঐতিহাসিক কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন।

আধুনিক যুগে কেশবচন্দ্রের পূর্ব্বেই আমাদের দেশে এই ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের সূত্রপাত হইয়াছিল। একদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্ম-সংস্কারে, অন্যদিকে ডেভিড্ হেয়ার এবং ডিরোজিওর শিষ্যগণ সমাজ-সংস্কারে অষ্টাদশ খৃষ্ট-শতাব্দীর ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কেশবচন্দ্রের বিশেষত্ব এই যে তিনি একদিকে আপনার কর্ম্মজীবনে এই দুই সংস্কার-স্রোতকে একীভূত করিয়া, জীবনের সকল বিভাগে এই অনধীনতার আদর্শকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন এবং অন্য দিকে এতাবৎকাল কার্য্যতঃ যে ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার চেষ্টা জীবনের ভিন্ন ভিন্ন বিচ্ছিন্ন কর্ম্মোদ্যমের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছিল, সেই সকল বিচ্ছিন্ন শক্তিকেন্দ্রকে একত্র করিয়া, দলবদ্ধ হইয়া এই সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন। মহর্ষি প্রাচীন শাস্ত্র ও গুরুর প্রভুত্বই কেবল অস্বীকার করেন, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্মার্থীকে আপনার স্বাভিমত কিম্বা সংজ্ঞানের

(conscience) উপরে একান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কোনও চেষ্টা করেন নাই। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্র-গুরু বর্জ্জন করিয়া, উপাসকগণের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবন পরিচালনায় শাস্ত্র-গুরুর প্রাচীন অধিকার মহর্ষির উপরেই অর্পণ করেন। প্রত্যেক সাধনার্থীকে আপন আপন স্বাভিমত ও সংজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেশবচন্দ্রই প্রথম জীবনে ব্রাহ্মসমাজে এক প্রকারের সাধারণ-তন্ত্র গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হ'ন। ধর্ম্মসাধনে ব্যক্তিবিশেষের অসঙ্গত প্রভুত্বের প্রতিবাদ করিয়াই কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। আর ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে কেশবচন্দ্র যে কাজ করেন, আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনে সুরেন্দ্রনাথও ঠিক সেই কাজটাই করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবন

সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের সূচনার বহু পূর্ব্ব হইতে এ দেশের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল, তাহাকে মূর্ত্ত করিয়াই সুরেন্দ্রনাথ আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন; ব্রিটিশ শাসনের প্রথমাবধি বাংলার এবং বিশেষতঃ কলিকাতা সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকেরা বে-সরকারী ইংরেজ প্রবাসীদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া, সময়ে সময়ে বিশেষ বিশেষ রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আপনাপন মতামত ব্যক্ত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন বা সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। সময় সময় রাজ-পুরুষগণ নিজেরাই উপযাচক হইয়া বিশেষ বিশেষ শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে ইহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে চাহিতেন। সুরেন্দ্রনাথের জন্মের মাত্র তিন বৎসর পরে কলিকাতার ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রমানাথ ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীপ্রসন্ন সিংহ,

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ সে'কালের বাংলার মনীষীবর্গ সকলেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েশনভুক্ত ছিলেন। সেকালে ইঁহারাই আপনাদের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় বিধি-ব্যবস্থাদির আলোচনা করিতেন এবং সময়ে সময়ে দেশের অভাব-অভিযোগের কথা রাজপুরুষদিগের গোচরে প্রেরণ করিতেন। রাজ-পুরুষেরাও ইঁহাদিগকেই জনগণের স্বাভাবিক অধিনায়ক বা natural leaders বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইঁহাদিগের মতামতের প্রতি যথাযোগ্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন জমীদারদেরই সভা ছিল। বাংলার, বিশেষতঃ কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের জমীদারগণের স্বত্বস্বার্থ রক্ষার জন্যই এই সভার জন্ম হয়। ইহার সভ্য এবং অধিনায়ক সকলেই জমীদারশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদাস পাল জমীদার ছিলেন না বটে, কিন্তু জমীদারী স্বত্বস্বার্থের পরিপোষক এবং জমীদার-সমাজের মুখপাত্ররূপেই তিনি দেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন জমীদারদিগের সভা হইলেও আপনাদের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী দেশের সাধারণ প্রজাবর্গের রাষ্ট্রীয় স্বত্বস্বার্থ সংরক্ষণে একেবারে উদাসীন ছিলেন না। কিন্তু তাঁহাদের বিচার আলোচনায় জনসাধারণের ত কথাই নাই, শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায়েরও সাক্ষাৎভাবে যোগদান করিবার অধিকার ও অবসর ছিল না। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের নেতৃবর্গ তাঁহাদের স্বত্ব-স্বার্থের সঙ্গে মিলাইয়া যতটা সম্ভব দেশের সাধারণ লোকের স্বত্ব-স্বার্থ রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে এক যোগে কোনো রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম সাধনের প্রবৃত্তি ও প্রয়াস তাঁহাদের ছিল না। সুতরাং দেশের রাষ্ট্র-শক্তিকে জাগাইয়া, সংহত লোকমতের দুর্জ্জয় শক্তি প্রয়োগে, রাজপুরুষদির্গের স্বেচ্ছাচারকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত কোনো চেষ্টা হয় নাই। অথচ দেশের শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী

সম্প্রদায়ের প্রাণে একটা বলবতী আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাজ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতেছিল।

আধুনিক স্বদেশাভিমান ও স্বাদেশিকতা

ফলতঃ যে ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতরে একটা প্রবল ব্যক্তিত্বাভিমান জাগিয়া প্রাচীন সমাজের শাসন ও পুরাগত ধর্ম্মের বিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও সমাজদ্রোহী করিয়া তুলে, তাহাই আবার তাহাদিগের প্রাণে এক নূতন স্বদেশাভিমানেরও সঞ্চার করে। আমাদের সে'কালের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টা বহুলপরিমাণে য়ুরোপীয় আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল, সত্য। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যে এই সকল সংস্কার-চেষ্টার অন্তরালে একটা প্রবল স্বদেশাভিমান জাগিয়া উঠিতেছিল, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। য়ুরোপীয় সমাজের তুলনায় আমাদের নিজেদের সমাজ-জীবন হীন, এবং য়ুরোপের যুক্তিবাদের তৌলদণ্ডে আমাদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধনা ভ্রান্ত ও কুসংস্কার-পূর্ণ বলিয়াই বোধ হইত। আর এই হীনতাবোধ সর্ব্বদাই আমাদিগের স্বদেশাভিমানে আঘাত করিত। এই বেদনার উত্তেজনাতেই আমরা তখন এতটা দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া আমাদের ধর্ম্মের ও সমাজের সংস্কার-সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলাম। আমাদের এই সংস্কার-চেষ্টা যদি সর্ব্বতোভাবে খৃষ্টীয়ানী পন্থা অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিত তাহা হইলে সেই চেষ্টার ফলে আমাদিগের মধ্যে কোনো প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতা ফুটিয়া উঠিতে পারিত না। কিন্তু যে ব্যক্তিত্বাভিমান বা বা individualism এবং যুক্তিবাদ বা rationalism আমাদিগকে নিজেদের সমাজের ও ধর্ম্মের অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করিতে প্রণোদিত করে, তাহারই প্রভাবে আমাদিগের পক্ষে খৃষ্ট-ধর্ম্মে বিশ্বাস স্থাপন এবং

য়ুরোপীয় সমাজবিধানের বশ্যতাগ্রহণও অসাধ্য হয়। মনুষ্য-প্রতিভা রচিত এবং সাধারণ মানববুদ্ধি-সহজ ভ্রমকল্পনা-প্রসূত বলিয়া স্বদেশের বেদপুরাণাদির প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া, খৃষ্টিয়ানের বাইবেলকে ঈশ্বর-প্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিবার আর কোনো পথ রহিল না। শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব উড়াইয়া দিয়া, যীশু খৃষ্টের অবতারত্বে বিশ্বাস করা অসাধ্য হইল। অথচ এইরূপ অবস্থাতেও যখন খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্ম-প্রচারকেরা হিন্দু-ধর্ম্মের উপরে নিজেদের ধর্ম্মের আত্যন্তিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সপ্রমাণ করিতে যাইয়া প্রতিবাদী ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত ও সাধনার হীনতা প্রমাণ করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহাদের এই অযথা নিন্দাবাদের ফলেই—যে স্বদেশেয় ধর্ম্মকে এককালে আমরা হীন বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহারই সম্বন্ধে ক্রমে আমাদিগের প্রাণে একটা প্রবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জাগিয়া উঠিল। মানুষ এজগতে নিজের প্রাণের মধ্যে যে ভাব লইয়া অপর মানুষের নিকটে যায়, তাহার প্রাণেও অলক্ষিতে সেই ভাবেরই সঞ্চার করে। প্রেম এই জন্য প্রেমকে ফোটায়। ঘৃণা ঘৃণাকেই বাড়াইয়া দেয়। একের অহঙ্কার-অভিমান, অপরের অহঙ্কার-অভিমানে আঘাত করিয়া তাহাকে জাগাইয়া তুলে। মানব-প্রকৃতির এই নিয়মবশে খৃষ্টীয়ান ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের অসঙ্গত ধর্ম্মাভিমান আমাদিগের অন্তরে স্বদেশের ধর্ম্মসম্বন্ধেও একটা প্রবল শ্রেষ্ঠত্বাভিমান জাগাইয়া দিল। যাঁহারা একদা স্বদেশের প্রচলিত ধর্ম্মের সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়া স্বদেশবাসিগণের নিকটে নিয়তই সেই ধর্ম্মের ভ্রমপ্রমাদের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন, এখন তাঁহারাই আবার জগতের অপরাপর ধর্ম্মের সঙ্গে তুলনা করিয়া আপনাদের প্রাচীন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে যত্নবান হইলেন। এইরূপে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু, ইঁহারা সকলেই একদিকে যেমন প্রচলিত ক্রিয়াবহুল হিন্দুধর্ম্মের সংস্কারের চেষ্টা করেন সেইরূপ অন্যদিকে, বিদেশীয়

প্রতিবাদিগণের সমক্ষে এই ধর্ম্মের সনাতনত্ব ও চিরন্তন আদর্শের অনন্যসাধারণ শ্রেষ্ঠত্বও প্রতিপন্ন করেন। আপনাদিগের পুরাতন ধর্ম্মের যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এইভাবে আমাদিগের মধ্যে ক্রমে জাগিয়া উঠে তাহারই উপরে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতার বা nationalism-এর মূল ভিত্তি স্থাপিত হয়।

বহুবিধ মানসিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির সাহায্যে নবজাত স্বাদেশিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যে ইংরেজি শিক্ষার অনুপ্রাণনে এই নূতন স্বাদেশিকতার উৎপত্তি হয়, সেই শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, একদিকে দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং অন্যদিকে ইংরেজ রাজপুরুষ ও ব্যবসায়িগণের মধ্যে নানাবিষয়ে একটা প্রবল প্রতিযোগিতা জন্মিতে আরম্ভ করে। এই প্রতিযোগিতা নিবন্ধন একদিকে এক অভিনব স্বদেশ-প্রীতি এবং অন্যদিকে একটা বিজাতীয় পরজাতিবিদ্বেষও জাগিয়া উঠে। তদানীন্তন বাংলা সাহিত্যের ভিতর দিয়া এই নূতন স্বজাতি-বাৎসল্য ও পরজাতি-বিদ্বেষ দুই মুখরিত হইয়া উঠে। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শনের" প্রতিষ্ঠা করেন। নব্যশিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে "বঙ্গদর্শন" স্বদেশের প্রাচীন গৌরবস্মৃতি জাগাইয়া, এই নবজাত স্বদেশ-প্রীতিকে বাড়াইয়া তুলিতে আরম্ভ করে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র, রঙ্গলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র, মনোমোহন প্রভৃতির কবিপ্রতিভা নানা দিকে ও নানা ভাবে এই স্বদেশাভিমানকে ফুটাইয়া তুলে। হেমচন্দ্রের "ভারতসঙ্গীত", সত্যেন্দ্রনাথের "গাও ভারতের জয়, হোক্ ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়", গোবিন্দচন্দ্রের "কতকাল পরে, বল ভারতরে", এবং প্রাচীন স্মৃতিবাহিনী "যমুনা লহরী", মনোমোহনের "দিনের দিন সব দীন",—এই সময় এই সকল জাতীয় সঙ্গীত প্রচারিত হয়। দীনবন্ধুর "নীলদর্পণ" ইহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল। উপেন্দ্রনাথের "শরৎ-সরোজিনী" ও "সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" ও "নীলদর্পণে"র

মর্ম্মঘাতিনী উদ্দীপনাতে নূতন ইন্ধন সংযোগ করিয়া দেয়। নব-প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ পুনঃ পুনঃ এই সকল নাটকের অভিনয় করিয়া ইহাদিগের শিক্ষা ও উদ্দীপনাকে জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেয়। এই সময়েই নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" প্রকাশিত হইয়া দেশের নবজাত স্বদেশপ্রীতিকে আধুনিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয়। "ভারত মাতা" প্রভৃতি নূতন গীতি-নাট্য এই অভিনব স্বদেশ-প্রেমকে এক নূতন দেবভক্তির আকারে ফুটাইয়া তুলিয়া চেষ্টা করে। এই স্বজাতি-প্রেম ও স্বদেশ-ভক্তির সুরধুনী-স্রোত যখন শিক্ষিত বঙ্গসমাজের প্রাণকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের মধ্যে এক নূতন চেতনার সঞ্চার করিতে আরম্ভ করে, তখন এই স্বাদেশিকতার তরঙ্গ-মুখে, এই নূতন দেশচর্য্যার পুরোহিত রূপে, সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দণ্ডায়মান হ'ন। আর দৈবকৃপায় দেশ-কাল-পাত্রের এরূপ শুভ যোগাযোগ ঘটিয়াছিল বলিয়াই তাঁহার কর্ম্মজীবন এমন অনন্যসাধারণ সফলতা লাভ করিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার শিক্ষা

কোনো দেশে যখনি কোনো নূতন ভাব ও আদর্শ ফুটিতে আরম্ভ করে, তখন সর্ব্বাদৌ তাহা উদারমতি, বিষয়বুদ্ধিবিহীন, উদ্যমশীল যুবক-মণ্ডলীর চিত্তকেই আকর্ষণ করিয়া থাকে। আমাদিগের দেশের এই নবজাত স্বদেশ-প্রেমও সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষার্থী যুবকগণের চিত্তকে অধিকার করে এবং তাহাদের যৌবনস্বভাবসুলভ কল্পনা ও ভাবুকতাকে আশ্রয় করিয়াই বাড়িয়া উঠে। আর এই জন্য এই অভিনব স্বাদেশিকতা প্রথমে কোনো প্রকারের বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিতে পারে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগী সাহিত্যিকগণ "বঙ্গদর্শনের" সাহায্যে দেশের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্বজাতির প্রাচীন গৌরবস্মৃতি জাগাইয়া কিয়ৎ

পরিমাণে তাঁহাদের নূতন স্বাদেশিকতাকে একটা ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, সত্য। কিন্তু "বঙ্গদর্শন" প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সাহিত্যের এবং সাধারণ সভ্যতার ও সাধনার লুপ্ত-গৌরবের উদ্ধারে যে পরিমাণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্বতন রাষ্ট্রীয় জীবনের আলোচনায় সে পরিমাণে মনোনিবেশ করেন নাই। বিশেষতঃ দেশের আধুনিক রাষ্ট্রীয় আশা ও আকাঙ্ক্ষার বিচার-আলোচনা প্রকাশ্যভাবে 'বঙ্গদর্শনে' কখনো স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। "কমলাকান্তের দপ্তরে" লেখকের অসাধারণ শ্লেষালঙ্কারে আচ্ছাদিত হইয়া, আধুনিক ভারতের অনেক রাষ্ট্রীয় চিন্তা ও আদর্শের গভীর আলোচনা রহিয়াছে, সত্য; কিন্তু অতি অল্প লোকেই সে সময়ে "কমলাকান্তের" বিদ্রূপাত্মক সুরসিকতার নিগূঢ় মর্ম্ম উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হইয়াছিলেন। নব্য শিক্ষাভিমানী লোকেও কেবল তাঁহার অপূর্ব্ব সাহিত্যরসটুকুই আস্বাদন করিতেন, লেখকের অদ্ভুত কৌতুককুশলতা এবং অসাধারণ শব্দসম্পদ দেখিয়াই মুগ্ধ হইতেন, কিন্তু এ সকল ছলাকলার অন্তরালে যে গভীর সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রতত্ত্ব লুকাইয়াছিল, তাহার সন্ধান লাভ করেন নাই। এই সকল কারণে, "বঙ্গদর্শন" নানাদিক্ দিয়া আমাদিগের নবজাত স্বাদেশিকতাকে পরিপুষ্ট করিয়াও বিশেষভাবে ইহাকে বস্তু-তন্ত্র করিয়া তুলিতে পারে নাই। সুরেন্দ্রনাথই প্রথমে এই স্বাদেশিকতার মধ্যে এক অভিনব এবং উন্মাদিনী ঐতিহাসিকী উদ্দীপনার সঞ্চার করেন।

চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগের মধ্যে স্বদেশের ইতিহাসের জ্ঞান ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইংরেজি বিদ্যালয়ে কিয়ৎ পরিমাণে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়া হইত বটে, কিন্তু সে সকল ইতিহাস ইংরেজেরই রচিত ছিল। সেকালে য়ুরোপেও ইতিহাস বলিতে লোকে কেবল কতকগুলি রাজার নাম এবং তাঁহাদের যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণই বুঝিত। ইতিহাস যে সমাজ-বিজ্ঞানের অঙ্গ, ঐতিহাসিক ঘটনার

অন্তরালে যে মানব-প্রকৃতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং তাহার আত্ম-চরিতার্থতা লাভের প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠা বিদ্যমান থাকে, এক যুগের ইতিহাস যে পরবর্ত্তী যুগের জনমণ্ডলীর কর্ম্মজীবনের উদ্দীপনার ও শিক্ষার মূল সূত্রগুলি আপনার পশ্চাতে তাহাদিগের জন্য রাখিয়া যায়, এ সকল কথা সে কালের য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকেরাও ভাল করিয়া ধরেন নাই। ঐতিহাসিক আলোচনার এই পদ্ধতি তখনো ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং আমরা চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্কুলকলেজে যে সকল ইতিহাস পাঠ করিতাম, তাহার ভিতরে কোনো উন্নত আদর্শ কিম্বা কর্ম্মের উদ্দীপনা আছে, ইহা অনুভব করিতে পারি নাই। আর এই কারণে যদিও ভারতবর্ষের ও ইংলণ্ডের—আর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া প্রাচীন গ্রীস্, রোম ও মধ্যযুগের য়ুরোপখণ্ডের—ইতিহাস পাঠ করিতাম, এ সকল আমাদিগের প্রাণে কোনো প্রকারের সজীব স্বদেশ-প্রেমের কিম্বা উদার মানব-প্রেমের সঞ্চার করিতে পারিত না। সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সমক্ষে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসই যে সেই জাতির স্বদেশভক্তির আলম্বন ও প্রতিষ্ঠা এই সত্য প্রচার করিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের একযোগে সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী যুবকবৃন্দকে লইয়া এক ছাত্র-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাত্রসভাই তাঁহার স্বাদেশিক কর্ম্মের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। যে অলোকসামান্য বাগ্মিতা-শক্তির প্রভাব ক্রমে সমগ্র ভারতের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তকে অধিকার করিয়া তাঁহার অনন্য-প্রতিযোগী ঐতিহাসিক প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কলিকাতার এই ছাত্র-সভাতেই তাহা সর্ব্বপ্রথমে স্ফুরিত হয়। এই ছাত্রসভায় সুরেন্দ্রনাথ

"শিখ-শক্তির অভ্যুদয়"— The Rise of the Sikh Power—সম্বন্ধে যে অগ্নিময়ী বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহার স্মৃতি, সেই বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের চিত্ত হইতে কখনই লুপ্ত হইবে না। শিখধর্ম্মের উৎপত্তি, শিখ খালসার প্রতিষ্ঠা, প্রথমে মোগল ও পরে ব্রিটিশ প্রভুশক্তির সঙ্গে শিখ খালসার যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা, সেকালের স্কুলপাঠ্য ভারত ইতিহাসের মধ্যেও ছিল। সুরেন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় যে সকল ঘটনার উল্লেখ করেন, তাহা যে একেবারে অজ্ঞাত ছিল এমন নহে। কিন্তু সেই সকল পূর্ব্বপরিচিত ঘটনার অন্তরালে স্বরাষ্ট্র-প্রীতির যে শক্তিশালীনী উদ্দীপনা বিদ্যমান ছিল, সুরেন্দ্রনাথের তড়িৎসঞ্চারিণী বাগ্মীপ্রতিভাই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নিকট তাহা ফুটাইয়া তুলে। সেই হইতেই এদেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানসচক্ষে আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অভিনব মর্ম্ম ও উদ্দীপনা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। ছত্রপতি মহারাজা শিবাজি আধুনিক ভারতক্ষেত্রে যে এক বিশাল হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার মর্য্যাদা জ্ঞান তখনো আমাদের জন্মায় নাই। সুতরাং সে সময়ে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের উদ্দীপনা আমাদিগের নবজাগ্রত স্বাদেশিকতাকে স্পর্শ করে নাই। আমাদের এই নূতন স্বাদেশিকতা তখন একটা কল্পিত বিশ্বজনীনতার ভাব অবলম্বন করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল। একটা স্বদেশাভিমান মাত্র আমাদের চিত্তকে তখন অধিকার করিয়াছিল। হিন্দু বলিয়া কোনো গৌরবাভিমান তখনো আমাদের মধ্যে জন্মায় নাই। হিন্দুধর্ম্মের প্রচলিত প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ডে আমাদের পুরুষানুগত বিশ্বাস একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। জাতিভেদ-প্রপীড়িত হিন্দুসমাজের প্রতিও গভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। এই সকল কারণে ছত্রপতি মহারাজা শিবাজি ভারতে যে মহা হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম ও উন্নত মর্য্যাদা উপলব্ধি করিবার অধিকার আমাদের ছিল না। অন্য পক্ষে বাবা নানক প্রবর্তিত ধর্ম্মে

একদিকে যেমন কোনো প্রকারের কর্ম্মবাহুল্য ছিল না, অন্য দিকে সেইরূপ গুরুগোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রে জাতিবর্ণগত কোনো বৈষম্যও ছিল না। শিখ খালসা বহুল পরিমাণে ইংলণ্ডের পিউরিট্যান (Puritan) সাধারণ-তন্ত্রের বা Commonwealthএর অনুরূপ ছিল। আর এই জন্যই আমাদের য়ুরোপীয় সাধনায় অভিভূত চিত্তকে শিখ ইতিহাসের উদ্দীপনাতে এমন প্রবলভাবে অধিকার করিতে পারিয়াছিল। টডের রাজস্থান ইহার অনেক পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল বটে এবং রঙ্গলালের পদ্মিনীর উপাখ্যানের ভিতর দিয়া রাজপুত-সমাজের অলৌকিক স্বদেশ-চর্য্যার উদ্দীপনা বাংলা সাহিত্যও প্রবেশ করিয়াছিল সত্য; কিন্তু পদ্মিনীর উপাখ্যান যে একান্তই "পৌরাণিকী" কাহিনীর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে, এই জ্ঞান তখনো খুব স্পষ্ট হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথের মুখে শিখ ইতিহাসের ব্যাখ্যা শুনিয়া আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষু রাজ-পুতনার কীর্ত্তিকাহিনীর উপরেও গিয়া পড়িল। এইরূপে সুরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের নিকটে ভারতের আধুনিক ইতিহাসে এক নূতন প্রাণতার প্রতিষ্ঠা করেন।

যেমন ভারতের ইতিহাস পড়িয়া আমরা এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তাহা হইতে প্রকৃতপক্ষে কোনো প্রকারের সত্য স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা সংগ্রহ করিতে পারি নাই, সেইরূপ য়ুরোপীয় ইতিহাস পড়িয়াও তাহার ভিতরে যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণা আছে, তাহাও ভাল করিয়া ধরিতে পারি নাই। সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মী-প্রতিভাই আমাদের সমক্ষে আধুনিক য়ুরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকে উজ্জ্বল করিয়া ধরে। ম্যাট্-সিনির দৈবী প্রতিভা, গ্যারীবল্ডীর স্বদেশ উদ্ধার করে অদ্ভুত কর্ম্মচেষ্টা, য়ুন ইতালী (Young Italy) সম্প্রদায়ের এবং নব্য আয়র্লণ্ডের (New Ireland) আত্মোৎসর্গপূর্ণ দেশচর্য্যা, এ সকলের কথা সুরেন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথমে এদেশে প্রচার করেন এবং তাঁহার এই সকল ঐতিহাসিক

কতকটা প্রমাণ পাওয়া যাইত, নতুবা এক প্রদেশের সুখ-দুঃখ অন্য প্রদেশের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিত কি না সন্দেহ। কলিকাতার ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান সভা, পুনার সার্ব্বজনিক সভা ও মাদ্রাজের মহাজন সভা, এ সকলই প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠান ছিল। সুরেন্দ্রনাথের প্রেরণায় ও উদ্যোগে যে ভারত সভার বা Indian Associationএর জন্ম হয়, তাহাই সর্ব্ব প্রথমে এই প্রাদেশিকতাকে অতিক্রম করিয়া, সমগ্র ভারতের রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম ও চিন্তাকে এক সূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে চেষ্টা করে। সমগ্র ভারতবর্ষকে এক বিশাল কর্মজালে আবদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়াই ভারত-সভার জন্ম হয় এবং অল্প দিন মধ্যেই উত্তর ভারতের বড় বড় শহরে শাখা সভা সকল গঠিত হইতে আরম্ভ করে। এইরূপে প্রয়াগে, কাণপুরে, মীরাটে ও লাহোরে শাখা ভারত সভার প্রতিষ্ঠা হয়। আজ কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্টীয় শক্তিকে সংহত করিবার জন্য যে চেষ্টা করিতেছে, চৌত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত ভারত সভাই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্ব প্রথমে সেই চেষ্টার সূত্রপাত করে। যে স্বদেশাভিমানকে আশ্রয় করিয়া ভারত সভা দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে বাড়াইয়া ও গড়িয়া তুলিতেছিল, কংগ্রেসের জন্ম নিবন্ধন যদি তাহা একান্ত বহিমুখীন হইয়া না পড়িত, তাহা হইলে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনে আজ প্রজাশক্তি কতটা পরিমাণে যে সংহত ও সুপ্রতিষ্ঠি হইতে পারিত ইহা এখন কল্পনা করাও সুকঠিন।

ফলতঃ কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ভারত-সভার কর্ম্মনায়কগণ একটা বিরাট জাতীয়-সমিতি গঠন করিবার চেষ্টা করেন। এই আদর্শের অনুসরণেই নানা স্থানে শাখা ভারত-সভার প্রতিষ্ঠা হয়। কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গে চতুর রাষ্ট্রনীতিক লাট ডফ্রিণেরও যে কতটা সম্বন্ধ ছিল, ইহা এখন সকলেই জানেন। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ দেশে যে বিপুল প্রজাশক্তি জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই যে কংগ্রেসের জন্ম হয় নাই, এ কথা বলাও কঠিন।

বোম্বাইয়ে গোপনে গোপনে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের আয়োজন হইতেছিল, সে সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন ভারত সভার তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় একটা জাতীয় সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন এবং কংগ্রেসের অধিবেশনের সমকালেই কলিকাতার আলবার্ট হলে জাতীয় সমিতির বা National Conferenceএর অধিবেশন হয়। সুরেন্দ্রনাথ এই কংগ্রেসের সংবাদ রাখিতেন কি না, জানি না। কিন্তু এই কন্‌ফারেন্সে দেশের নানাস্থান হইতে যে সকল লোক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁরা যে কংগ্রেসের কথা কিছুই শুনেন নাই, ইহা জানি। ইহারা সকলেই এই National Conference কে ভারতের রাষ্ট্রীয় একতার এবং ভবিষ্যৎ প্রজাশক্তির আধার বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। আর কংগ্রেস যদি সহসা এই স্থানটী পূর্ণ করিতে অগ্রসর না হইত, তাহা হইলে আজ সুরেন্দ্রনাথের এই National Conference আমাদিগের রাষ্ট্রীয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম শক্তি-কেন্দ্র হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ভারত গবর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান সেক্রেটারী এল্যান ও হিউম্। ইহার পৃষ্ঠপোষক কলিকাতার প্রবীণতম ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বোম্বাইএর প্রধানতম কৌন্সিলী ফিরোজসা মেহেতা, মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ উকীল সুব্রহ্মণ্য আয়ার। কংগ্রেস এইরূপে প্রথম হইতেই অসাধারণ পদবল ও ধনবলের উপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সুরেন্দ্রনাথের কর্ম্মচেষ্টার অন্তরালে তখন এ দু'য়ের কিছুই ছিল না। সুতরাং কংগ্রেস যে সুরেন্দ্র-নাথের প্রতিষ্ঠিত National Conference কে সহজেই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিল, ইহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। আর ইহাতে প্রকৃত পক্ষে আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবনের ক্ষতি হইয়াছে না লাভ হইয়াছে বলা কঠিন নহে। কংগ্রেস যতটা রাতারাতি বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের কন্‌ফারেন্সের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথের এই কর্ম্মচেষ্টা যদি কংগ্রেসের দ্বারা এইরূপে ব্যাহত না হইত, তাহা হইলে দেশে

আজ যে প্রভূত শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় জীবন ও লোকমত গড়িয়া উঠিত কংগ্রেস তাহা যে কেবল গড়িয়া তুলিতে পারে নাই তাহা নহে, কিন্তু সাক্ষাৎভাবে তাহার ব্যাঘাতই জন্মাইয়াছে। কংগ্রেস দেশের অনেক কল্যাণ সাধন করিয়াছে সত্য, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ ভারতের জেলায় জেলায় লোকমত সংগঠনের জন্য যে সকল রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও করিতেছিলেন সেগুলির শক্তি হরণ করিয়া কংগ্রেস দেশের প্রকৃত রাষ্ট্রীয় জীবনকে যে দুর্ব্বল করিয়াছে ইহাও অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কংগ্রেসের প্রধান কীর্ত্তি দুটা—এক লাট ক্রসের ১৮৯২ সালের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট, আর অন্য লাট মর্লে'র আধুনিক কাউন্সিল্ সংস্কার। কিন্তু দেশের জেলায় জেলায় যে সকল রাষ্ট্রীয় সভা গড়িয়া উঠিতেছিল তাহাকে নষ্ট করিয়া কংগ্রেস দেশের যে ক্ষতি করিয়াছে এ সকলের কিছুতেই সেই ক্ষতি পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই ও হইবে না। ফলতঃ কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথের অনন্যপ্রতিযোগী অধিনায়কত্ব লাভের পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তখন হইতে সুরেন্দ্রনাথ কিয়ৎ পরিমাণে কংগ্রেসের অর্থশালী নেতৃবর্গের মুখাপেক্ষী হইয়া, আপনি প্রথমে যে পথে চলিয়া দেশের প্রজাশক্তিকে জাগাইয়া তুলিতেছিলেন, সে পথ অনেকটা পরিত্যাগ করিয়া, বহুল পরিমাণে আপনার কর্ম্মজীবনের সম্পূর্ণ সফলতারও ব্যাঘাত উৎপাদন করেন।

কিন্তু ইহাতে যে দেশের কোনো সংঘাতিক ক্ষতি হইয়াছে, এমনও বলিতে পারি না। সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কর্ম্মচেষ্টা সময়োপযোগী হইয়াছিল মাত্র, সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্বদেশের প্রাচীন সভ্যতার ও সাধনার কিম্বা তাঁহার স্বদেশী লোকপ্রকৃতির অনুযায়ী হয় নাই। সমাজসংস্কারে কেশবচন্দ্র যেমন প্রথম জীবনে বহুল পরিমাণে বিদেশী আদর্শের অনুসরণ করিয়া সমাজের মধ্যে একটা প্রচণ্ড বিরোধই জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন,

কিন্তু কোথায় যে সেই বিরোধের সঙ্গতি ও মীমাংসা হইবে, তাহার নিগূঢ় সন্ধান ও সঙ্কেত ধরিতে পারেন নাই ; সুরেন্দ্রনাথও সেইরূপ ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া শাসনসংস্কার করিতে যাইয়া, শাসক ও শাসিতের মধ্যে বিরোধই জাগাইয়া তুলেন, কিন্তু কোন্ পথে যাইয়া শাসিতেরা যে প্রকৃত পক্ষে আত্মচরিতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে, আর কোন্ সূত্র ধরিয়াই বা এ দেশের শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে বিরোধ জাগিয়াছে, তাহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইতে পারে, এ পর্য্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ সে সন্ধান এবং সঙ্কেত প্রাপ্ত হন নাই। সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজের নিকট হইতেই রাষ্ট্রনীতির যাবতীয় শিক্ষালাভ করিয়াছেন, আর ইংলণ্ডের ইতিহাসে যে পথে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তিকে সংযত করিয়া ক্রমে প্রজাশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ত্তমান প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালীকে গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই পথই সুরেন্দ্রনাথের সুপরিচিত। সুরেন্দ্রনাথের অলোকসামান্য মেধা আছে, কিন্তু চিন্তার মৌলিকতা নাই। যেটী যেমন আছে বা হইয়াছে, তিনি তাহাকে সেইরূপ ভাবেই ধরিতে পারেন, কিন্তু যে মানসিক শক্তি চারিদিকের বিষয় ও বস্তুর পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা কোনো নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারে, সে শক্তি সুরেন্দ্রনাথের নাই। সুতরাং স্বদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের সংস্কার ও বিকাশ সাধনে ব্রতী হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ইংরেজ-রাষ্ট্রনীতির চিরাভ্যস্ত পথ ধরিয়াই চলিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের সভ্যতা, সাধনা ও প্রকৃতির অনুযায়ী নূতন পথের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ইংরেজের ভাষা যে তাঁর স্বদেশের লোকে বুঝিতে পারে না, ইংরেজের ভাব যে তারা ধরিতে পারে না, ইংরেজের পথ যে তাদের একেবারেই অপরিচিত, ইংরেজের প্রকৃতি যে তাহাদের প্রকৃতি হইতে একান্তই ভিন্ন, এ সকল কথা সুরেন্দ্রনাথ এখনও ভাল করিয়া বুঝেন কি না সন্দেহ। আর স্বদেশের সভ্যতার ও সাধনার, স্বদেশের লোকপ্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতির

সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের চিন্তার এবং আদর্শের কোন জীবন্ত যোগ স্থাপিত হয় নাই বলিয়া তাঁহার দীর্ঘ জীবনব্যাপী রাষ্ট্রীয় কর্ম্মোত্তম কেবলমাত্র একটা অসম্বদ্ধ, অনির্দ্দিষ্ট, প্রবল রাষ্ট্রীয় অভাব বোধকেই জাগাইয়াছে ; কিন্তু এখনো দেশের রাষ্ট্রীয় জীবনের কোনো অঙ্গকেই গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। এইরূপ অভাব বোধ হইতে উন্মাদিনী বিপ্লবশক্তির সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু কখন দূরদর্শিনী রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না।

ফলতঃ সুরেন্দ্রনাথ যে পথ ধরিয়া দেশের রাষ্ট্রীয় জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে এদেশের কি হিন্দু কি মুসলমান কোনো সম্প্রদায়েরই প্রাণগত যোগ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। এদেশের হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতিরই ধর্ম্মভাব অত্যন্ত প্রবল। ধর্ম্মই তারা বোঝে, ধর্ম্মের নামেই তারা মাতে, ধর্ম্মের সঙ্গে যার যোগ নাই, এমন কোনো কিছু তাহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহাই এদেশের জনগণের বিশেষত্ব। অথচ সুরেন্দ্রনাথ এবং তাঁহার সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় কর্ম্ম-নায়কগণ সকলেই স্বজাতির রাষ্ট্রীয় জীবনে জনশক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াও কখনই এই সর্ব্বজনবিদিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলেন নাই। তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ এবং রাষ্ট্রনীতি আজি পর্য্যন্ত মোক্ষ সম্পর্ক বিহীন হইয়া পড়িয়া আছে। সুতরাং তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন ও আলোচনা দেশের মুষ্টিমেয় নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরেই যাহা কিছু আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত জনমণ্ডলীর চিত্তকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু যাঁহারা ক্রমে ক্রমে নূতন পথ ধরিয়া, নূতন মন্ত্র সাধন করিয়া, দেশের জনমণ্ডলীর চিত্তে এক নব শক্তির সঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সাক্ষাৎভাবে বা পরোক্ষভাবে নিজেদের স্বাদেশিক উদ্দীপনার জন্য সুরেন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের শিক্ষা-দীক্ষার নিকট চিরঋণী রহিয়াছেন। আজ দেশে যে নূতন আদর্শ ফুটিয়া উঠিতেছে ও

জনগণের চিত্তে যে নূতন শক্তির সঞ্চার হইতেছে তাহা কোনো কোনো দিকে সুরেন্দ্রনাথের আদর্শের এবং কর্ম্মচেষ্টার বিরোধী হইলেও যে সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা-দীক্ষার শ্রেষ্ঠতম ফল, ইহা অস্বীকার করা যায় না। সুরেন্দ্রনাথের অশেষপ্রকারের ত্রুটী দুর্ব্বলতা সত্বেও তিনি যে কাজটী করিয়াছেন তাহা না করিলে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় জীবন যে ভাবে গড়িয়া উঠিতেছে, কখনই সে ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারিত না। তিনি এই জাতীয় জীবনের গঠনে যে কাজটী করিয়াছেন, সে কাজ অপর কেহ করেন নাই, এবং করিতে পারিতেনও না। আর এই জন্যই আধুনিক ভারতের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতি এমন অক্ষয় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙ্গলা দেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম থাকিবে কিনা, জানি না। না থাকাই সম্ভব। ইতিহাস সচরাচর যে সকল বস্তুর স্মৃতিকে সযত্নে রক্ষা করে, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ে সে বস্তু বেশি নাই। যাহা অলোকসামান্য, ইতিহাস তাহাকেই স্মরণীয় করিয়া রাখে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ে এরূপ অলোকসামান্য কিছু নাই। তাঁর অনেক বিদ্যা আছে, কিন্তু অনন্যসাধারণ বিশেষজ্ঞতা নাই। শ্রেষ্ঠ মেধা আছে, কিন্তু অলৌকিক প্রতিভা নাই। তিনি কর্ম্মী; আর তাঁর কর্ম্ম সর্ব্বদা ধর্ম্ম ও নীতি, শাস্ত্র ও লোকাচারের সম্মান করিয়া চলে। এই জন্য যাঁহারা সচরাচর এ সংসারে কলহ কোলাহল-মুখর কর্ম্মজাল বিস্তার করিয়া, সস্তায় একটা ঐতিহ্য কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সে জাতীয় কর্ম্ম-নায়ক নহেন। তথাপি দেশের লোকে তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধা করে। এতটা শ্রদ্ধা বাঙ্গলাদেশের সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের লোকের প্রাণ হইতে আর কাহারো প্রতি অর্পিত হইতেছে কি না সন্দেহ। দেশের লোকে তাঁহার বিদ্যার সম্বর্দ্ধনা করে; তাঁহার বিনয়-সৌজন্যের সমাদর করে; তাঁহার বাহ্যাড়ম্বরশূন্য ধর্ম্ম-নিষ্ঠার ও আত্ম-নিষ্ঠার পূজা করিয়া থাকে। সকল প্রকারের জনহিতকর কর্ম্মে তাঁহার নেতৃত্ব কামনা করে। সকল স্বাদেশিক সাধু অনুষ্ঠানে তাঁহার সহানুভূতি ও সাহচর্য্য, তাঁহার পরামর্শ ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে। কিন্তু তিনি যে তাহাদের চিন্তা ও ভাব, আশা ও আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিয়া, অতি ঘনিষ্ঠভাব তাহাদের অন্তর্জীবনের সঙ্গে জড়িত

হইয়া আছেন, এমনটী অনুভব করে না। আর এ জগতে যাঁহারা মিত্রভাবেই হউক আর শত্রুভাবেই হউক, আপনাদের সমসাময়িক জনমণ্ডলীর জ্ঞান, আশা, আদর্শ, প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া থাকেন, ইতিহাস কেবল তাঁহাদেরই স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিতে চাহে।

ঐতিহাসিক কীর্ত্তির বিশেষত্ব

কিন্তু ইতিহাসে যাঁহাদের নাম থাকিয়া যায়, কেবল তাঁহারাই যে সমাজের শ্রেষ্ঠ জন, কেবল তাঁহাদেরই নিকটে যে সমাজ অশেষ ও অশোধনীয় ঋণজালে আবদ্ধ থাকে, অপরের নিকটে থাকে না, এমন কথা বলা যায় না। ফলতঃ, ইতিহাস যে কেবল ভালকেই মনে করিয়া রাখে, মন্দকে ভুলিয়া যায়, তাহা নহে। রোমের ইতিহাস পুণ্যশ্লোক মার্কাস্ অরিলিয়সের যেমন, তেমনি ক্রূরচিত্ত নীরোরও নামকে স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের প্রাচীন পুরাণ-কথায় রাম আছেন, রাবণও আছেন; যুধিষ্ঠির আছেন, দুঃশাসনও আছেন। ভারতের পুণ্যস্মৃতি জনকের নাম মাথায় করিয়া রাখিয়াছে, বেণ রাজার নামও ভুলিয়া যায় নাই। ইতিহাস কেবল ভালকেই স্মরণীয় করিয়া রাখে, মন্দকে রাখে না, তাহা নয়। ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহা কিছু অলোকসামান্য, ইতিহাস তাহাকেই আঁকড়াইয়া ধরে। মানবের প্রকৃতি হইতেই তো ইতিহাসের বিচার-পদ্ধতির উৎপত্তি। আর যাহা নিত্য; তাহা অপেক্ষা যাহা নৈমিত্তিক; যাহা স্থিতিহেতু তাহা অপেক্ষা যাহা গতি-সহায়; মানুষের মন তাহারই দ্বারা অধিক আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণে যাঁহারা জনসমাজের স্থিতির সহায়, তাঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া, যাঁহারা জনসমাজের গতির হেতু হইয়া উঠেন, ইতিহাস তাঁহাদিগের স্মৃতিকেই বিশেষভাবে জাগাইয়া রাখিতে

চাহে। যে সকল শক্তির সমবায়ে বা সংঘর্ষে সমাজ-জীবন বিবর্ত্তিত হয়, ইতিহাস তাহাকেই ভাল করিয়া লক্ষ্য করে। আর সমাজ বিবর্ত্তনে ভাল ও মন্দ দুই মিশিয়া থাকে। আলো ও ছায়ার সমাবেশ ব্যতিরেকে যেমন তৈলচিত্র ফুটিয়া উঠে না; সেইরূপ ভাল ও মন্দের সংঘর্ষ ব্যতীত সমাজজীবনও গড়িয়া উঠিতে পারে না। ভাল ও মন্দের মধ্যে যে স্বাভাবিক বিরোধ আছে, তাহারই দ্বারা, সেই বিরোধের ফলস্বরূপই, জনসমাজ বিবর্ত্তিত হইতেছে। এই দেবাসুর-সংগ্রাম মানব-সমাজের নিত্য ধর্ম্ম। আর তারই জন্য, এই মানব-সমাজের বিবর্ত্তনের যথাযথ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা যে ইতিহাসের কাজ, সেই ইতিহাস লোকে যাহাকে ভাল বলে কেবল তাহাকেই স্মরণীয় করিয়া রাখে না; কিন্তু ভাল হউক, মন্দ হউক, যাহা কিছু শক্তিশালী, যাহা কিছু অনন্যসাধারণ, যাহা কিছু গতির কারণ, ইতিহাস সর্ব্বদা তাহাকেই নিরপেক্ষভাবে ধরিয়া রাখিতে চাহে।

ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের প্রণালী

আর অলোকসামান্য প্রতিভাই সচরাচর জনমণ্ডলীর প্রাণে নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব, নূতন আদর্শ, নূতন আশার সঞ্চার করিয়া, যুগে যুগে সমাজের এই গতিশক্তিকে প্রবুদ্ধ ও পরিচালিত করিয়া থাকে। এই সকল নূতন ভাব ও আদর্শের প্রেরণায়, যাহা পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই, তাহা পাইবার জন্য জনগণের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। এই লোভ হইতে নূতন কর্ম্মের আয়োজন, এবং এই কর্ম্মচেষ্টা হইতে সমাজের বিবর্ত্তন ও বিকাশ সাধিত হয়। অলোকসামান্য প্রতিভা সমাজের গতি-বেগ বৃদ্ধি করে বলিয়াই ইতিহাসে তাহার এত গৌরব। কিন্তু জনসমাজের কল্যাণকল্পে যেমন তার গতি-শক্তির তেমনি তার স্থিতিশক্তিরও আবশ্যক। যেখানে সমাজের গতি-শক্তি তার সনাতন স্থিতি-শক্তিকে একান্তভাবে অভিভূত

করিয়া ফেলে, সেখানে সমাজ-চৈতন্য একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া, উন্মাদিনী বিপ্লবশক্তির ক্রীড়াপুত্তলি হয় এবং অচিরে বিনাশের মুখে যাইয়া পড়ে। আবার যেখানে সমাজের স্থিতি-শক্তি একান্তভাবে তাহার স্বাভাবিক গতিশীলতাকে চাপিয়া রাখিতে বা পিষিয়া মারিতে চেষ্টা করে, সেখানে কিছুদিনের জন্য সমাজ নিতান্ত স্থবির হইয়া পড়ে এবং শুষ্ক গতানুগতিক পথ ধরিয়া জড়গতিমাত্র প্রাপ্ত হয় বলিয়া জীবন চেষ্টা প্রকাশ করিতে পারে না। আর স্বভাবের গতিরোধ করিয়া কিছুকালের জন্য স্থবিরত্ব লাভ করে বলিয়া, তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ, পরিণামে প্রবল বিপ্লবের মুখে যাইয়া পড়ে। এই জন্য, সমাজের চিরন্তন কল্যাণ কল্পে, তাহার স্বাভাবিক বিবর্ত্তন পথ অবাধ ও প্রশস্ত রাখিতে হইলে, তাহার গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তি উভয় শক্তিকেই আপন আপন অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা আবশ্যক হয়।

সমাজ-জীবনের ত্রিধারা

কারণ, জনসমাজে বিবর্ত্তন চেষ্টা গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তি উভয়কেই সমভাবে অবলম্বন করিয়া চলে। একদল লোক যখন কোনো অভিনব ভাব বা আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগবশত আন্তরিকভাবে সমাজের গতিবেগকে বাড়াইয়া তুলিতে চান; অপর এক দল লোক তখন সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার বিধিব্যবস্থার এবং অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেরও পরিবর্ত্তন যে অপরিহার্য্য হইয়া উঠে এবং এই পরিবর্ত্তনের একান্ত প্রতিরোধ করিলে সমাজের গুরুতর অকল্যাণ সাধিত হয় ইহা বিচার না করিয়া, সমাজস্থিতির দোহাই দিয়া প্রাণপণে এই প্রবুদ্ধ গতিশক্তিকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। আর এই দুই দলই সমাজ-বিবর্ত্তনের প্রত্যক্ষ হেতুরূপে, ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহেন। কিন্তু যাঁহারা এক দিকে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য

হইয়া, এইরূপে সমাজের গতিবেগকে আত্যন্তিক ভাবে বাড়াইয়া তোলেন, তাঁহারা যেমন সমাজের স্থৈর্য্য ও শান্তি নষ্ট করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ প্রাণবস্তুকে পীড়িত করেন; সেইরূপ যাঁহারা অন্যদিকে অভিনব যুগধর্ম্মের ও কালধর্ম্মের প্রতি অমনোযোগী হইয়া, এই প্রবুদ্ধ গতিবেগকে জোর করিয়া প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন, তাঁহারাও সেইরূপ অযথা সংগ্রাম বাধাইয়া, সমাজ-প্রাণকে রক্ষা করিতে যাইয়াই তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হন। কিন্তু যাঁহারা এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া, ধীরভাবে তার পরিণাম লক্ষ্য করিতে থাকেন এবং যতক্ষণ না এই সংগ্রামের নিবৃত্তি হইয়া নূতনের ও পুরাতনের মধ্যে একটা উচ্চতর সন্ধি ও সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ততক্ষণ কোন এক পক্ষকে একান্ত-ভাবে অবলম্বন না করিয়া যথাসম্ভব নিরপেক্ষভাবে এই কলহ-কোলাহলের মধ্যে সমাজের মর্ম্মস্থলে যে সনাতন প্রাণবস্তু আপনাকে লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাকেই কেবল ধরিয়া রহেন,—তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ। কোন সমাজে, কালপ্রভাবে, তাহার পূর্ব্বকৃত ও অধুনা-চেষ্টিত কর্ম্মবশে, এইরূপ সমর-সঙ্কট উপস্থিত হইলে, যাঁহারা নূতনের লোভেও আত্মবিস্মৃত হন না, আর তার ভয়বিভীষিকাতেও বিক্ষিপ্ত হইয়া উঠেন না,—কামবশাৎ নূতনকেও আলিঙ্গন করিতে ধাবিত হন না, আর কার্পণ্যবশাৎ পুরাতনের জীর্ণতাকেও আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহেন না; কিন্তু ইহাদের পরস্পরের গুণাগুণ ও দাওয়া-দাবীর পরীক্ষা হইয়া পরিণামে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইবেই হইবে, ধীরভাবে তাহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন,—প্রত্যেক যুগসন্ধিস্থলে, সমাজের সনাতনী প্রাণশক্তি তাঁহাদিগকেই আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করে। কলহ-কোলাহল-প্রিয় ইতিহাস এই সকল লোকের খোঁজ লয় না। কিন্তু ইতিহাসের দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াও, আসন্ন সমাজ-বিপ্লবের মুখে, এই সকল ধর্ম্মনিষ্ঠ, কর্ম্ম-নিষ্ঠ, আত্মনিষ্ঠ, শান্ত ও

সমাহিত-চিত্ত সুধীজনই অতি সন্তর্পণে সেই সঙ্কটকালে সমাজের সনাতন প্রকৃতিটীকে প্রাণে পূরিয়া বাঁচাইয়া রাখেন।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়

বাঙ্গলার স্বদেশী সমাজ একটা প্রবল বিপ্লব-স্রোতের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছে। আর এই সঙ্কটকালে যে অত্যল্পসংখ্যক ধীর-প্রকৃতি সুধীজনকে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজের সনাতন প্রাণবস্তু আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান। যে বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনার প্রভাবে এই যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সেই শিক্ষা ও সাধনাকে সুন্দররূপেই অধিগত করিয়াছেন। এ দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের তিনি অগ্রণী। যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনার সেতু-স্বরূপ হইয়া আছে, তিনি তাহার অন্যতম অধিনায়ক। কিন্তু সমসাময়িক ইংরেজি-শিক্ষা-প্রাপ্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই যেরূপভাবে এই শিক্ষাদীক্ষা দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কখনো সেরূপ হন নাই। অন্যদিকে যাঁহারা এই শিক্ষাদীক্ষা পাইয়াও, ইহার প্রতি একটা গভীর ও অযৌক্তিক বিরাগ-বশতঃ এই শিক্ষা-দীক্ষাতে দেশমধ্যে যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের স্রোত আনিয়াছে, সর্ব্বতোভাবে তাহার প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হন, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একান্তভাবে তাঁহাদেরও সঙ্গে মিশিয়া যান নাই। মানুষের বিদ্যা তাহার ভৃত্য হইয়াই থাকিবে, তাহার ঈপ্সিতসাধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত হইবে ; ইহাই বিদ্যালাভের সত্য লক্ষ্য। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা আজকালি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যে বিদেশীয় বিদ্যা-অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছি, তাহা অনেক স্থলেই আমাদের ভৃত্য না হইয়া, প্রভু হইয়া বসিতেছে। আমরা অনেকেই এই অভিনব বিদ্যাকে নিজেদের কণ্ঠে

নিয়োগ করিতে পারিতেছি না ; প্রত্যুত এই বিদ্যাই আমাদিগকে ভয়াবহ পর-ধর্ম্মে নিয়োগ করিতেছে। মানুষের শিক্ষা ও সাধনা তাহার আত্মজ্ঞানেরই স্ফুরণ করিবে ; ইহাতেই শিক্ষার সার্থকতা লাভ হয়। কিন্তু বর্ত্তমান বিদেশীয় শিক্ষা ও সাধনা আমাদের আত্মজ্ঞানের স্ফুরণ না করিয়া, অনেক সময় কেবল আত্ম-বিস্মৃতিই জন্মাইয়া দেয়। এই বিদেশী বিদ্যার বলে আত্মলাভ করা দূরে থাক্, অনেক সময় আমরা আত্ম-বিক্রয় করিয়াই বসি। এইরূপ আত্ম-বিস্মৃতি ও আত্ম-বিক্রয় আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাধারণ ধর্ম্ম হইয়া গিয়াছে। সংস্কারক ও সংস্কার-বিরোধী, উভয় দলেরই মধ্যে ইহা দেখা যায়। এক শ্রেণীর সমাজ ও ধর্ম্মসংস্কারক সর্ব্বজনসমক্ষে স্পর্দ্ধাসহকারে নির্লজ্জভাবে, যেমন এই বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারিত করিয়া রহিয়াছেন ; যাঁহারা এই প্রকাণ্ড প্রয়াসের প্রতিরোধ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাঁহারাও গোপনে গোপনে সেই বিজাতীয় ভাবকেই অজ্ঞাতসারে প্রাণমধ্যে বরণ করিয়া তুলিতেছেন। ভগবানকে যেমন মিত্রভাবে ভজনা করিয়া পাওয়া যায়, শত্রুভাবে সাধন করিয়াও পাওয়া যায়, আর শাস্ত্র বলেন, শত্রুভাবে সাধন করিলে যত সত্বর সিদ্ধিলাভ হয়, মিত্রভাবে ভজনায় তত সত্বর হয় না ;—সেইরূপ কোনো বিদেশীয় সভ্যতা-সাধনাকে মিত্রভাবে ও শত্রুভাবে, উভয় ভাবেই পাওয়া যায়। আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকেরা মিত্রভাবে য়ুরোপের ভজনা করিতেছেন। সংস্কার-বিরোধী "পুনরুত্থানকারিগণ" শত্রুভাবে তার সাধনা করিতেছেন। আর, কার্য্যতঃ উভয় পক্ষই সমভাবে তাহার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সংস্কারকগণের উপরে য়ুরোপের প্রভাব প্রত্যক্ষ, সংস্কার-বিরোধিগণের উপরে প্রচ্ছন্ন—দু'এর মধ্যে এইমাত্র প্রভেদ।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কারক ও সংস্কার-বিরোধী

সংস্কারকগণ অসাধারণ অভ্যুদয়সম্পন্ন বিদেশী সমাজের বিধিব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানাদিকে যথাসাধ্য নিজেদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লালায়িত হইয়াছেন। আর এইরূপে বিদেশী সভ্যতা ও সাধনার বাহ্য উপকরণগুলিকে সযত্নে সংগ্রহ করিতে যাইয়া স্বল্পবিস্তর আত্মহারা হইয়া পড়িতেছেন। স্বদেশী সভ্যতা ও সাধনার যে একটা অতি ভাল দিক আছে, এ কথা ইহারা অস্বীকার করেন না। বরং এই ভালটুকুকে রক্ষা করিবার জন্যই যে সংস্কার প্রয়োজন, ইহাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু কোনো সমাজের বহিরঙ্গগুলিকে গ্রহণ করিয়া তার ভিতরকার প্রকৃতিগত আদর্শ ও স্বভাবকে বর্জন করা যে সম্ভব হয় না, এটা তাঁহারা বোঝেন না। বিদেশী সমাজের বাহিরের উপকরণ ও আয়োজনগুলিকে প্রাণপণে সংগ্রহ করিব, আর স্বদেশের সমাজের ভিতরকার প্রাণটাকেও ধরিয়া রাখিব এবং তাহারই মধ্যে পুরিয়া দিয়া একটা উৎকৃষ্টতম সমাজ গড়িয়া তুলিব, ইহা যে অসম্ভব ও অসাধ্য,— এই মোটা কথাটা অনেকেই তলাইয়া দেখেন না। প্রত্যেক জীবের আত্মপ্রয়োজনেই তার দেহটা গড়িয়া উঠে। জীবদেহের বহিরঙ্গগুলি একটা আকস্মিক ঘটনাপাতের অচেষ্টিত ফল নহে। সমাজ-জীবন এবং সমাজ-দেহ সম্বন্ধেও ইহাই সত্য।

প্রত্যেক সমাজের রীতিনীতি, আচার-বিচার, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদি সেই সমাজের আত্মপ্রয়োজনে, তার আভ্যন্তরীণ জীবন-চেষ্টার ফলেই গড়িয়া উঠে, কোন আকস্মিক ঘটনাপাতে আপনা হইতে গজায় না, অথবা অন্য সমাজ হইতেও উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে না। দেহের সঙ্গে দেহীর সম্বন্ধ যেমন অঙ্গাঙ্গী—ইংরেজিতে ইহাকে অর্গানিক রিলেষণ (organic relation) বলে—প্রত্যেক সমাজের রীতিনীতি, বিধি-ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানাদির সঙ্গে সেই সমাজ-জীবনের সম্বন্ধও সেইরূপ

একশ' পঁয়তাল্লিশ

অঙ্গাঙ্গী, আকস্মিক নহে। কান টানিলেই যেমন আপনা হইতে মাথাও সরিয়া আসে, সেইরূপ কোন সভ্যতা ও সাধনার বাহিরের ঠাটকে কোথাও খাড়া করিতে গেলে তার প্রাণটাও যে তার সঙ্গে সঙ্গে আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে, ইহা নিশ্চিত। বিদেশী সভ্যতা ও সাধনার বহিরঙ্গ সাধনে নিযুক্ত হইলে, তার অন্তরঙ্গটুকুও লইতে হইবে। আর এরূপ ভাবে, স্বেচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, তার দেহ ও প্রাণ উভয় বস্তুকেই যদি আত্মসাৎ করিতে হয়, তবে স্বদেশের সত্য প্রাণটাকে কিছুতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। সংস্কারকগণ যে ভাবিতেছেন, তাঁরা বিদেশী সভ্যতা ও সাধনার ভাল অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলিকেই বাছিয়া নিজেদের সমাজে গ্রহণ করিবেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের দেশের সনাতন আদর্শটাকেও বাঁচাইয়া রাখিবেন, ইহা অলীক কল্পনা মাত্র।

প্রত্যেক সভ্যতা ও সাধনাতেই ভাল ও মন্দ দুই আছে। আর এই ভাল ও মন্দ ছায়াতপের ন্যায় পরস্পরের সঙ্গে অচ্ছেদ্যরূপে মিশিয়া আছে। সকল সমাজের রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার মধ্যেই ভাল ও মন্দের এই অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে। যে সমাজে যে সকল রীতিনীতি ও আচার-বিচার, সামাজিক বিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, আপনা হইতে গড়িয়া উঠে, সে সমাজে তার সঙ্গে সঙ্গে লোকচরিত্রের মধ্যে ভালকে রক্ষা করিবার ও মন্দকে রোধ করিবার একটা কৌশলও আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে। অপর সমাজ যদি এই সকল রীতিনীতি বাহির হইতে গ্রহণ করিতে যায়, তাহা হইলে, ভাল মন্দ দুই তাহাকে লইতে হয়। তার ভালটাকে বাড়াইয়া দিয়া মন্দটাকে রোধ করিবার সহজ কৌশলটা সে সমাজ কিছুতে লাভ করিতে পারে না। কারণ এই সহজ কৌশলটা ধার করিয়া পাওয়া যায় না। আর এই জন্যই অনুকরণ-প্রয়াসী সংস্কারচেষ্টা, সমাজের অন্তঃপ্রকৃতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না

বলিয়া, সর্ব্বদাই ভয়াবহ পরধর্ম্ম হইয়া উঠে। আমাদের আধুনিক ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকগণ যেমন এইরূপে বিদেশের সমাজের বহিরঙ্গ সাধনে সচেষ্ট হইয়া, সেই সমাজের ভিতরকার ভাব ও আদর্শের দ্বারা উত্তরোত্তর অভিভূত হইয়া, স্বদেশের সনাতন প্রাণ-স্রোতের বাহিরে যাইয়া পড়িতেছেন; সংস্কার-বিরোধিগণও সেইরূপ অন্যভাবে ও অন্য কারণে, সেই সনাতন প্রাণ-স্রোত হইতে একান্তভাবে সরিয়া যাইতেছেন। সংস্কারকগণ বিদেশী সমাজের বাহিরের আচার অনুষ্ঠানাদির মধ্যে নিজেদের সমাজের প্রাণরূপী সনাতন আধ্যাত্মিক আদর্শটাকে পূরিয়া তাহাকে সময়োপযোগী ও কার্য্যক্ষম করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই পরদেহে যে সে প্রাণ থাকিবে না, থাকিতে পারে না, তার প্রতি ইহাদের দৃষ্টি নাই। সংস্কার-বিরোধিগণ বিপরীত পথ ধরিয়া স্বদেশের সমাজের প্রাচীন ও প্রচলিত রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার মধ্যে বিদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রবল প্রাণটাকে পূরিয়া দিয়া, নিজেদের সমাজের বাহ্য ঠাটকে সতেজ ও সময়োপযোগী করিতে চাহিতেছেন। আমাদের পুরাতন সমাজ-দেহ বিদেশের এই নবীন প্রাণের টান যে কখন সহিতে পারিবে না, তার প্রতি ইহাদের দৃষ্টি নাই। আর এইরূপ উভয় পক্ষই বিদেশী সভ্যতা ও সাধনার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। সংস্কারকগণ নিজেদের সভ্যতা ও সাধনার বহিরঙ্গকে স্বল্পবিস্তর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, বিদেশী সমাজের ছাঁচে নিজেদের সমাজকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন। এই ব্যগ্রতার পশ্চাতে একটা পাদ্রিজন-সুলভ, কল্পিত বিশ্বমানবী প্রেমের প্রেরণা আছে; নিজেদের সমাজ-জীবন ও সমাজ-প্রকৃতির কোনো সত্য ধারণা নাই। অন্যদিকে যাঁহারা প্রাণপণে এই সংস্কার-প্রয়াসের প্রতিরোধ করিয়া, সমাজের "সনাতনী" আকৃতিকে সযত্নে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, তাঁহাদের এই ব্যাকুলতাতে তাঁহাদের সরল স্বদেশপ্রীতিই প্রকাশিত হয়, কিন্তু

নিজেদের সমাজ-জীবন সম্বন্ধে প্রাকৃত জন-সুলভ দেহাত্মধ্যাস যে বিন্দু পরিমাণেও বিচলিত হইয়াছে, ইহা প্রমাণিত হয় না। তাঁহারা সমাজের দেহটাকেই, তার বাহ্য বিধিব্যবস্থা ও আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিকেই সমাজের সনাতন প্রাণ বলিয়া ধরিতেছেন; আর তারই জন্য কালের প্রভাব এবং পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করিয়া, সমাজের বাহিরের ঠাটকে রক্ষা করিলে তার ভিতরকার প্রাণটাও রক্ষা পাইবে ভাবিয়া, যাঁহারা এই ঠাটকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চান, তাঁহাদের সর্ব্ববিধ সংস্কার-চেষ্টার প্রতিরোধ করিতেছেন। এইরূপে আমাদের সংস্কারকদল যেমন সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার নামে দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত সমাজগঠনকে ভাঙ্গিয়া দিয়া, তাহার স্থলে বিলাতী আদর্শের একটা রজত-প্রধান শ্রেণীভেদকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন; সেইরূপ সংস্কার-বিরোধিগণও আশ্রমভ্রষ্ট সুতরাং ধর্ম্মহীন যে বর্ত্তমান বর্ণভেদ সমাজে প্রচলিত আছে, তারই ভিতরে বিলাতী শ্রেণীভেদের প্রাণটাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, প্রাচীন বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ক্ষয়োন্মুখ বহিরঙ্গটাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। একদল বিদেশী সভ্যতা ও সাধনার দেহটাকে, আর একদল তার প্রাণটাকে লইয়া টানাটানি করিতেছেন। সুতরাং, একপক্ষ সজ্ঞানে আর একপক্ষ অজ্ঞাতসারে, কিন্তু উভয় পক্ষই সমভাবে সত্যকার স্বাদেশিকতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, বিদেশী সভ্যতা ও সাধনার দ্বারা অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। আর এই দুই দলই দুই ভিন্ন দিক দিয়া দেশের সত্যিকার সনাতন সভ্যতা ও সাধনার মূল ভিত্তিটাকে ভাঙ্গিয়া দিতেছেন।

মধ্যপথ

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বিদলের কোনটার অন্তর্ভূত নহেন। প্রচলিত অর্থে তাঁহাকে কিছুতেই সমাজ-সংস্কারক বলা সঙ্গত হইবে না। তিনি নিজেই কোন মতে সংস্কার বিরোধী বলিয়া পরিচিত

হইতে রাজি নহেন। মানব-সমাজ যে নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, ইহা তিনি জানেন। মধ্যে মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম হইলেও, মোটের উপরে এই সকল সামাজিক পরিবর্ত্তন যে উন্নতিমুখী, ইহাও তিনি মানেন। সমাজের অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রাচীন রীতিনীতিও যে পরিবর্ত্তনযোগ্য হইয়া পড়ে, ইহা তিনি স্বীকার করেন। "হিন্দুসমাজে সংস্কারের অনেক স্থান আছে, সংস্কারের অনেক কার্য্য আছে"—এ কথা মুক্তকণ্ঠে প্রচার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন।* সুতরাং মোটের উপরে সমাজসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সমাজ-সংস্কারকদিগের সঙ্গে তাঁর মতের মিল আছে। তবে মতে মিল থাকিলেও কার্য্যে মিল নাই। তারই জন্য বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রচলিত অর্থে সমাজ-সংস্কারক বলা সঙ্গত নহে। সমাজ-সংস্কারকেরা সচরাচর সমাজের গতির বেগই বাড়াইয়া দিবার জন্য ব্যস্ত; তার গতির দিকটা স্থির রহিল কি না, তার প্রতি তাঁহাদের তেমন সজাগ দৃষ্টি নাই। আর এইখানেই তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার যাহা কিছু বিরোধ। সাধারণভাবে সমাজ-সংস্কারকদিগের সদুদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি আছে। এইজন্য আপনি নিষ্ঠাবান ও একান্ত স্মৃতি-অনুগত হিন্দু হইয়াও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কখনো শ্রুতি-স্মৃতি-বিরোধী সংস্কারকদিগের নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হন নাই। বরং মনে করেন, তাঁহারা সাধু-ইচ্ছার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সংস্কার-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, আর সে ইচ্ছার সফলতার জন্যই তাঁহাদিগকে "অগ্রপশ্চাৎ ও চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া সাবধানে" চলিতে বলেন।†

হিন্দুর সমাজানুগত্য

এই সংযম ও সম্যক্‌দৃষ্টি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্ম্মজীবনের মূলসূত্র। সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন মত তার প্রাচীন ও

* "জ্ঞান ও কর্ম্ম"—৩১৭ পৃষ্ঠা।

† "জ্ঞান ও কর্ম্ম"—২৮০ পৃষ্ঠা।

প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে। কোন চিন্তাশীল এবং বিশেষজ্ঞ হিন্দুই এ পরিবর্ত্তনের একান্ত বিরোধী নহেন। প্রাচীনকে বর্জন করা যে মহাপাপ, হিন্দুর বিবর্ত্তন-ইতিহাসে এমন অদ্ভুত কথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যাহা প্রাচীন ও প্রচলিত তাহাকে ভাঙ্গাই যে অধর্ম্ম, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এমন মনে করেন না। আবশ্যক হইলে, হিন্দু তাঁর দেবতার মন্দিরও তো ভাঙ্গিয়া থাকেন। কিন্তু সে ভাঙ্গার ভাব ও ধরণ পৃথক। সে ভাঙ্গাতে তাঁর দেবতা লুপ্ত হন না, তাঁর দেবভক্তিও নষ্ট হয় না। দেবতার পীঠস্থান বলিয়াই তো দেবমন্দিরের মাহাত্ম্য ও পবিত্রতা। তারই জন্য তো পাথরের বা ইটকাঠের ঘর ভক্তের ভক্তির বিষয় হইয়া উঠে। হিন্দুর সমাজ সেইরূপ হিন্দুর ধর্ম্মের বহিরাবরণ ও কায়ব্যূহ-স্বরূপ। ধর্ম্মাবহ বলিয়া হিন্দুর শ্রুতি যাঁর বন্দনা করিয়াছেন, তিনি নিতান্ত নিরাকার ভাবমাত্র নহেন। কেবল মানুষের হৃদয়-আকাশেই তাঁর প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় না। যেমন প্রত্যেক মানুষের প্রাণে তার ধর্ম্মবুদ্ধিকে আশ্রয় করিয়া তিনি আত্মপ্রকাশ করেন; সেইরূপ যে সমাজে সে ব্যক্তি বাস করে, সেই সমাজ-দেহে তার রীতিনীতি এবং বিধিব্যবস্থার মধ্যেও তিনি আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। এই জন্য প্রত্যেক সমাজের বিধিব্যবস্থা সেই সমাজের প্রাণগত ধর্ম্মের বহিরঙ্গ ও বহিঃপ্রতিষ্ঠা হইয়া রহে। অতএব হিন্দু আপনার দেহকে যেমন দেবতার মন্দির বলিয়া ভাবেন, তার দেহপুরে যেমন সর্ব্বান্তর্যামী ও সর্ব্বলোকসাক্ষী নারায়ণকেই একমাত্র পুরস্বামীরূপে দেখিয়া সংযত চিত্তে, পবিত্রভাবে দেহের সেবা করেন, সেইরূপ আপনার সমাজকেও হিন্দু সেই ধর্ম্মাবহ পরম-পুরুষের বহিরঙ্গ ও কায়ব্যূহ বলিয়া ভক্তি করেন। এই কারণেই নিষ্ঠাবান হিন্দুর চক্ষে তার সমাজের আনুগত্য ও ধর্ম্মের আনুগত্য একই কথা হয়।

হিন্দুর সমাজ-তত্ত্ব

কারণ, হিন্দুর নিকটে তার সমাজ কতকগুলি মনুষ্যগোষ্ঠির স্বেচ্ছা-নির্ব্বাচিত বা ঘটনাক্রমে সংঘটিত একটা মিলনভূমি মাত্র নহে। মানুষ কখনো কখনো ইচ্ছা করিয়া কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমাজবদ্ধ হইয়া থাকে বটে; কিন্তু এ সকল স্বকৃত-সমাজ তার মূল সমাজেরই অন্তর্গত হয়, কিন্তু সে সমাজের সমধর্ম্ম লাভ করে না। ব্রাহ্মসমাজ, আর্য্যসমাজ, বৈষ্ণবসমাজ, ভারত-সভা, জমিদারী-পঞ্চায়ৎ, জাতীয় মহাসভা বা কংগ্রেস এবং প্রাদেশিক সমিতি—এগুলি স্বেচ্ছাবদ্ধ সমাজ। কিন্তু মানুষকে সামাজিক জীব বলিয়া আমরা যে সমাজের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া থাকি, সে সমাজ এই জাতীয় সমাজ নহে। ফরাসী বিপ্লবের অধিনায়কগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একটা কল্পিত সামাজিক সর্ত্তের বা সোশিয়াল্ কনট্র্যাক্টের (social contract) উপরে মানবসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—এই সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া, সেই সর্ত্তের উপরেই জনমণ্ডলীর সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বত্ব-স্বাধীনতাকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু বহুদিন সে কল্পিত সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হইয়াছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও এখন আর মানবসমাজকে এইরূপ একটা স্বেচ্ছাবদ্ধ ও স্বকৃত মিলনভূমি বলিয়া মনে করেন না। হিন্দু কখনো এরূপ অদ্ভুত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করিতে যায় নাই। হিন্দু চিরদিনই এটা জানে যে মানুষ যেমন আপনার খুসি বা খেয়ালমত এই ভৌতিক দেহ ধারণ করে না, সেইরূপ সে আপনার ইচ্ছামত সমাজ-বিশেষেও জন্মগ্রহণ করে না। তার জন্মসম্বন্ধীয় সর্ব্ববিধ ব্যাপারই তার প্রাক্তন কর্ম্মবশে সংঘটিত হইয়া থাকে। তার প্রাক্তন কর্ম্মই তাকে আপনার নির্দ্দিষ্ট ফল-অনুযায়ী ভৌতিক দেহেতে আবদ্ধ করে। আর সেই প্রাক্তন কর্ম্মবশেই মানুষ সমাজ-বিশেষে জন্মগ্রহণ করিয়া, সেই সমাজের কর্ম্মজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই দেহের সঙ্গে যেমন তার

নিজের সমাজের সঙ্গেও সেইরূপ, মানুষের যাবতীয় সম্বন্ধ আকস্মিক নহে কিন্তু অঙ্গাঙ্গী। যেখানে সে ঘটনাবশে, পরজীবনে সমাজান্তর গ্রহণও করে, সেখানেও তার মূল ও জন্মগত সমাজ-প্রকৃতিটাকে সে সঙ্গে লইয়াই যায়। সেই স্বেচ্ছানির্ব্বাচিত নূতন সমাজে, নূতন কর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া, কালক্রমে এই প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটিলেও, যে সমাজে তার জন্ম হইয়াছিল, সেই সমাজের মূল ছাপটা তার অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিরাচরণ হইতে কখনো একেবারে মুছিয়া যায় না। প্রত্যুত বংশপরম্পরায় তার বৈজিক গুণ সংক্রামিত হইয়া, এই স্বেচ্ছাগৃহীত নূতন সমাজেও, চিরদিনের জন্য না হউক অন্ততঃ বহুদিন পর্য্যন্ত, তার বংশধরগণের চিন্তাতে ও চরিত্রে, সেই মূল সমাজের কতকগুলি বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়া থাকে। আর ইহাতেই সমাজের সঙ্গে সেই সমাজান্তর্গত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধ যে আকস্মিক নহে—অঙ্গাঙ্গী, এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমাজের সঙ্গে সমাজান্তর্গত জনগণের যে সম্বন্ধ তাহা অপরিহার্য্য ও অঙ্গাঙ্গী বলিয়া, হিন্দু কখনো আপনার সমাজকে নির্জীব মনে করে নাই। তাহার দেহে যেমন একটা প্রাণবস্তু আছে, যাহা চক্ষে দেখা যায় না, কিন্তু দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত—যে সম্বন্ধকে অবলম্বন করিয়া সর্ব্ববিধ দৈহিক চেষ্টা প্রকাশিত হইতেছে, তাহারই মধ্যে এই প্রাণবস্তু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; তেমনি তাহার সমাজেও একটা প্রাণবস্তু আছে, হিন্দু এ কথা চিরদিনই বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। এই সমাজ-প্রাণটাকেও চক্ষে দেখা যায় না। কিন্তু সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহারই বিবিধ চেষ্টার ভিতরে এই সমাজ-প্রাণও প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আর হিন্দুর এ সিদ্ধান্তকে য়ুরোপীয়দের পক্ষেও আজিকালি একটা অদ্ভুত কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। কারণ, য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরাও এখন এই কথাই বলিতেছেন। আধুনিক

সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণ মানবসমাজে জীবধর্ম্ম আরোপ করিয়া তাহাকে নিঃসঙ্কোচে জীব-উপাধি প্রদান করিয়াছেন। সোসিয়াল্ অর্গেনিজম্ (social organism) বা সমাজ-জীব কথাটা য়ুরোপীয় চিন্তায় সর্ব্বথা গৃহীত হইয়াছে। আর এটা যদি কেবল একটা কথার কথা না হয়, এর পশ্চাতে যদি কোনো প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে, তবে জনসমাজের ভিতরে একটা আত্মস্ফুরিত প্রাণন-চেষ্টারও প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। জীব বলিলেই তার একটা ব্যক্তিত্ব বা নিজত্ব আছে, এটী বোঝায়। এই ব্যক্তিত্ব বা নিজত্ব সাধারণ জীবধর্ম্ম। জীব-মাত্রেরই একটা নিজস্ব লক্ষ্য ও সেই লক্ষ্য লাভের জন্য যথোপযুক্ত উপায় নির্ব্বাচন ও সেই উপায় অবলম্বনে আপনার সফলতালাভের প্রয়াস করিবার একটা আভ্যন্তরীণ শক্তিও আছে। জীবের সর্ব্ববিধ জীবন-চেষ্টার ভিতর দিয়া তার জীবনের এই চরম লক্ষ্যটী নিয়ত ফুটিয়া উঠে। জীবের ভিতরকার ও বাহিরের বিভিন্ন সম্বন্ধ ও সর্ব্ববিধ বিধিব্যবস্থা এই লক্ষ্যটীর সন্ধানেই চলে।

জনসমাজেরও সমষ্টিভাবে একটা গতি, একটা ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন চেষ্টা, একটা নিয়ম আছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু গতি আছে, তথাপি নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য নাই; বিধান আছে, তথাপি কোনো স্থির লক্ষ্য নাই; নিয়ম আছে, তথাপি সে নিয়ম কোন কিছু স্থিরভাবে আয়ত্ত, প্রকাশিত বা প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে না,—ইহা কুত্রাপি জীবধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হয় না। এরূপ অসঙ্গতি বুদ্ধিতে আসে না, কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু জনসমাজকে কেবল অর্গেনিজম্ বলিলেই যথেষ্ট বলা হয় না। জনসমাজে শুদ্ধ জীবত্ব আরোপ করিয়াই, তার প্রকৃতি ও গতির সম্যক্ অর্থ প্রকাশ করা যায় না। জনসমাজকে এই জন্য কেবল অর্গেনিজম্ না বলিয়া "বিইংই" (Being) বলিতে হয়। ইতালীয় মনীষী মহামতি ম্যাট্‌সিনী মানবসমাজকে এই 'বিইং' উপাধি প্রদান করিয়াছেন।

য়ুরোপীয়দের মধ্যে আধুনিক কালে বোধ হয় ম্যাট্‌সিনীই মানবসমাজের মূল প্রকৃতিটী অতি পরিষ্কার রূপে ধরিয়াছিলেন। Humanity is a Being—আধুনিক যুগে ম্যাট্‌সিনীই প্রথমে অকুতোভয়ে এ কথাটা বলিয়াছেন। আর "বিইং" (Being) বস্তু অচেতন নহে, সচেতন। তাহা স্বপ্রকাশ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। তার আত্ম-জ্ঞানই তার গতির কারণ ও স্থিতির ভূমি হইয়া আছে। পাশ্চাত্যেরা যাহাকে বিইং (Being) বলেন, হিন্দু তাহাকে আত্মা বলেন। আমরা যাহাকে "আমি" বলি, যাহাকে অপর মানুষে তুমি বা তিনি বলে, এই অহং-প্রত্যয়বাচক বস্তুই আত্ম-বস্তু। তাহাই স্বপ্রকাশ ও স্বপ্রতিষ্ঠ। এ বস্তু আপনি আপনার গতি-হেতু ও স্থিতি-ভূমি। হিন্দুর শাস্ত্রে জীবান্তর্যামী এই আত্ম-বস্তুকেই নারায়ণ বলিয়াছেন। "জীবহৃদে জলে বসে সেই নারায়ণ।" এই নারায়ণই ব্যষ্টিভাবে জীবান্তর্যামী—পরমাত্মা। আর এই নারায়ণই সমষ্টিভাবে মহাবিষ্ণুরূপে সমগ্র মানবসমাজেরও আত্মা। ম্যাট্‌সিনী যে বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া "হিউম্যানিটী ইজ এ বিইং" (Humanity is a Being) এই কথা বলিয়াছেন, সেই বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়াই হিন্দু সাধক মহাবিষ্ণু নাম দিয়াছেন। এই হিউম্যানিটির ভাব বা আদর্শকে য়ুরোপের নিকট হইতে ধার করিয়া, বিশ্ব-মানব উপাধি দিয়া নিজেদের জাতীয় সাধনায় বা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করা হিন্দুর পক্ষে একান্তই অনাবশ্যক।* আমাদের মহাবিষ্ণুতে এই ভাবটী যেমন সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে, য়ুরোপের হিউম্যানিটীতে এখনো তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। কোথাও কোথাও খৃষ্টীয়-সাধনায় খৃষ্টেতে বরং এ ভাবটী ফুটিয়াছে। এই

---

* বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে মাতৃ-মূর্ত্তি প্রদর্শন করিবার সময়ে মাকে মহাবিষ্ণুর অঙ্কে স্থাপন করিয়াছেন। ইহাই মা'র নিত্যমূর্ত্তি। মহাবিষ্ণুর অঙ্ক হইতেই মা ক্রমে জগদ্ধাত্রী, কালী, দুর্গা রূপে সমাজ-বিবর্ত্তনে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মহাবিষ্ণুই য়ুরোপীয়দিগের হিউম্যানিটী।

মহাবিষ্ণুই বিশ্ব-আত্মা। এই দেহ নারায়ণেরই কায়ব্যূহ। তিনিই হৃষীকেশ,--এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্তা। তিনিই আমাদের অন্তরস্থ পর-আত্মা বা পরমাত্মা,—বিজ্ঞান-চৈতন্যের আশ্রয় ও প্রতিষ্ঠা। তিনিই কর্ম্মাধিপ,—দেহমনের সর্ব্ববিধ চেষ্টার নিয়ামক ও ফলদাতা। আবার সমষ্টিগতভাবে মহাবিষ্ণুরূপে এই নারায়ণই সমাজ-দেহে বাস করিতেছেন। জনসমাজ এই মহাবিষ্ণুরই কায়ব্যূহ-স্বরূপ। তিনিই ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ, সমাজ-নিয়মের একমাত্র নিয়ন্তা। সমাজ-বিবর্ত্তনের তিনিই একমাত্র প্রবর্ত্তক ও পরিচালক। ম্যাট্‌সিনী যে হিউম্যানিটীকে "বিইং" বলিয়াছেন, সেই তত্ত্বই বস্তুতঃ আমাদের শাস্ত্রোক্ত নারায়ণ বা মহাবিষ্ণু। আর আপনার সমাজকে হিন্দু এই সর্ব্বান্তর্যামী, এই সমাজান্তর্যামী, এই বিশ্ব-আত্মা মহাবিষ্ণুর বহিঃপ্রকাশ ও কায়ব্যূহরূপে দেখেন বলিয়াই তাঁহার নিকটে সমাজের আনুগত্য ও ধর্ম্মের আনুগত্য একই কথা হইয়াছে।

হিন্দু সমাজতত্ত্বে গতি-শক্তির স্থান

কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দু যে কখনো আপনার সমাজের প্রাচীন ও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হন না, এবং এই সকল পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করিবার সময় প্রচলিত সমাজ-বিধির আনুগত্য অস্বীকার করেন না, এমন নয়। হিন্দুর চক্ষে সমাজ দেহমাত্র, নারায়ণই এ দেহের প্রাণ। আর প্রাণের প্রয়োজনেই দেহ; দেহের প্রয়োজনে তো প্রাণ নয়। প্রাণ দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়াও সর্ব্বদাই দেহ অপেক্ষা বড় হইয়া রহে। নারায়ণ সর্ব্বদাই সমাজ হইতে বড়। আর সমাজের রীতিনীতি যখন কালবশে নারায়ণের আত্মপ্রকাশের অনুপযোগী হইয়া তাঁর আত্মপ্রয়োজনেই পরিবর্ত্তনযোগ্য হইয়া উঠে, তখন তিনি স্বয়ং সাধু মহাজনগণেতে আবিষ্ট বা অবতীর্ণ হইয়া, এই সকল পরিবর্ত্তনযোগ্য বিধি-ব্যবস্থা রহিত করিয়া, নূতন বিধি-ব্যবস্থা

প্রবর্ত্তিত করেন। তখন হিন্দু নিঃসঙ্কোচে এই মহাজন-পন্থার আনুগত্য গ্রহণ করিয়া, প্রচলিত ও পুরা প্রতিষ্ঠিত পরিবর্ত্তনযোগ্য সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই প্রণালীতে যেখানে সমাজের সংস্কার সাধিত হয়, সেখানে এই সংস্কার-চেষ্টা শুদ্ধ সমাজের ব্যক্তিগণের স্বাভিমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সমাজ-সংস্কারের নামে তখন সমাজের জনগণ মধ্যে অসংযত ব্যক্তিত্বাভিমান জাগ্রত হইয়া, তাহাদিগকে স্ব-স্ব-প্রধান করিয়া সমাজ-শাসনকে শিথিল করিয়া দেয় না। সেখানে প্রাকৃতজনের অশোধিত বিচারবুদ্ধি ও অসংযত ভোগলালসার দ্বারা প্রচলিত রীতিনীতির পরিবর্ত্তনযোগ্যতাও প্রমাণিত হয় না এবং প্রাচীন ও প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার বশ্যতা অস্বীকার করিতে যাইয়া, সমাজ-সংস্কার চেষ্টা সমাজ মধ্যে অরাজকতা আনয়ন করিতে পারে না। যুগে যুগে এই ভাবেই হিন্দু সমাজের সংস্কার ও বিবর্ত্তন ঘটিয়া আসিয়াছে। মহাজন-পন্থার অনুসরণ করিয়াই হিন্দু সর্ব্বদা আপনার সমাজের সংস্কার ও শোধন করিয়াছে। আর এই কারণেই, প্রাচীন ও প্রচলিত সমাজবিধিকে অগ্রাহ্য করিয়াও হিন্দু প্রকৃতপক্ষে কখনো সর্ব্বধর্ম্মমূল যে সমাজানুগত্য তাহাকে একান্ত ভাবে বর্জ্জন করে নাই, করিবার প্রয়োজনও কদাপি হিন্দুসমাজে উপস্থিত হয় নাই।

মহাজন-পন্থার প্রণালী

কিন্তু কোনো সমাজের সকল লোকই সর্ব্বদা সেই সমাজের মূল প্রকৃতিকে সজ্ঞানে আয়ত্ত করিতে পারে না। সকলেই তার শ্রেষ্ঠতম বিধান বা উৎকৃষ্টতম আদর্শানুযায়ী আপনাদিগের জীবনকে গড়িয়া তোলে না। এই জন্য কালবশে যুগে যুগে যখনি সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে, তখন সকল হিন্দুই যে এই মহাজন-পন্থা আশ্রয় করিয়াছে, এমন বলা যায় না। আর কোনো যুগেই যুগপ্রবর্ত্তক

মহাজনেরা সেই যুগের প্রারম্ভেই আবির্ভূত হন না। প্রথমে নানা কারণে সমাজ-মধ্যে নূতন আদর্শ ও নূতন শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করে। তখন অল্পে অল্পে নূতনে ও পুরাতনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া, সমাজ-মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করিতে থাকে। আর তখন হইতেই এই সকল যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণের আগমনের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়োজনও আরম্ভ হয়। কিন্তু এই সকল সামাজিক বিশৃঙ্খলার একান্ত আতিশয্য না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহারা আবির্ভূত হন না। কারণ ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুদয় একটা বিশেষ মাত্রা লাভ না করিলে, যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণ আত্মপ্রকাশ করেন না। সুতরাং প্রত্যেক যুগসন্ধি স্থলেই, এক দল লোকে মহাজন পদাশ্রয় লাভ না করিয়াও শুদ্ধ আপনাদের বিচারবুদ্ধির প্রেরণাতে সমাজের প্রবুদ্ধ গতিশক্তিকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। সে সময়ে আর একদল লোক সমাজ-স্থিতি রক্ষার্থে প্রাচীন ও প্রচলিত রীতিনীতিকেই আশ্রয় করিয়া রহেন। কিন্তু যথাসময়ে মহাজনেরা আবির্ভূত হইলেই যে সকলে বা অনেকে একযোগে তাঁহাদিগকে আশ্রয় করেন, তাহাও নহে। তখনো একদল লোকে প্রাচীনকেই ধরিয়া রহেন। হিন্দু সমাজের বিবর্ত্তন ইতিহাসেও এটা সর্ব্বদা দেখা গিয়াছে। ভগবান বুদ্ধদেবের সমসাময়িক আর্য্যগণ সকলে বা অধিকাংশ তাঁহার শরণাপন্ন হন নাই। কেহ কেহ যেমন তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি কেহ কেহ তাঁহার শিক্ষা ও সাধনার আত্যন্তিক প্রতিরোধও করিয়াছিলেন। আর বহুসংখ্যক লোক তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার প্রতিপক্ষতাও করেন নাই, কেবল যাহা ছিল, তাহাকেই ধরিয়া রহিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সময়ে, আমাদের এই বাঙ্গালাদেশেও তাহাই দেখা গিয়াছে। আর আমাদের এ কালেও যে যুগভাব প্রবর্ত্তক মহাজনের আবির্ভাব হয় নাই, এমনো তো নয়। কিন্তু

সকলেই কি তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছেন, বা করিতে পারিয়াছেন ?

ফলতঃ এরূপ সর্ব্বদা হইয়াছে ও সর্ব্বদা হইবে। কারণ, সকল মানুষের প্রকৃতি সমান নয়। কারো প্রকৃতি তামসিক, কারো বা রাজসিক, আর কারো বা শুদ্ধ সাত্ত্বিক। যাঁরা নিতান্ত তামসিক, তাঁরা এ মহাজন-পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। তাঁহাদের অবিবেক, তাঁহাদের জড়তা, তাঁহাদের ভয়প্রমাদাদি এ পথে চলিবার একান্ত অন্তরায় হইয়া রহে। সেইরূপ যাঁহারা নিতান্ত সাত্ত্বিক, যাঁহাদের তমঃ ও রজঃ উভয়ই অন্তরস্থ সত্ত্বগুণের দ্বারা একান্ত অভিভূত হইয়াছে, সেই সকল সহজসিদ্ধ বা কৃপাসিদ্ধ সাধু-সজ্জনেরা যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাজনগণের প্রতি ভক্তিমান হইয়াও প্রয়োজনাভাবে প্রত্যক্ষরূপে তাঁহাদের ঐকান্তিক আনুগত্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের কর্ম্মস্রোতে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দেন না। যাঁহাদের অন্তঃপ্রকৃতি রজোপ্রধান, তাঁহারাই প্রত্যেক যুগসন্ধিস্থলে, সমাজের প্রবুদ্ধ গতি-শক্তিকে আশ্রয় করিয়া আপনাদের প্রকৃতির চরিতার্থতা অন্বেষণ করেন। আর ইঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের অন্তরস্থ রজোগুণ বর্দ্ধীয়মান সত্ত্বের দ্বারা অভিভূত হইতে আরম্ভ করে, তাঁহারাই যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণকে একান্তভাবে অবলম্বন করিতে অগ্রসর হন। কারণ, যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণ আপনারা ত্রিগুণাতীত হইলেও, চতুঃপার্শ্বস্থ রজোগুণপ্রধান লোকদিগকে অবলম্বন করিয়াই স্ব স্ব আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধি করিয়া থাকেন। যুগপ্রবর্ত্তক মহাজনগণের প্রথম শিষ্যেরা সকলে না হউন, অনেকেই রজোপ্রভাবে তাঁহাদের শরণাপন্ন হইয়া, প্রাচীন ও প্রচলিত পন্থাকে পরিহার করিয়া, নূতন সাধন ও শাসন গ্রহণ করেন। ক্রমে এই নূতন সাধন ও শাসনের ফলে তাঁহাদের অন্তরস্থ সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইয়া প্রথমে তাঁহাদের রজোগুণকে অভিভূত করে, পরে ইহাদের মধ্যে যাঁহারা বিশেষ সুকৃতিসম্পন্ন, তাঁহারা

ক্রমে ত্রিগুণাতীত হইয়া, ভাগবতী তনু লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু পরিণামে সত্ত্বাধিক্য হইলেও, আদিতে নূতন পন্থা অবলম্বন সময়ে, রজো-গুণের আতিশয্য থাকা একান্তই আবশ্যক হয়। নতুবা সকলে যুগ-প্রবর্ত্তক মহাজন-পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন না। আর এই কারণেই হিন্দুর যাবতীয় যুগাবতার ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব। কেবল এক পরশুরামই অবতারগণমধ্যে ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তিনিও ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন মাত্র; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই; পরন্তু ত্রিভুবনকে নিঃক্ষত্রিয় করিবার জন্যই তাঁহাকে রজঃ-প্রধানা রাগাত্মিকা ক্ষত্রিয়প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া ক্ষাত্রবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। হিন্দুর কিম্বদন্তি-প্রসিদ্ধ যুগাবতারগণের ক্ষত্রিয়ত্বের পশ্চাতে সমাজবিজ্ঞানের একটা নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

মহাজন-পন্থা

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যে কখনো এই রজোগুণের কোনো প্রকারের আতিশয্য দেখা যায় নাই। "কল্মনাং অশমঃ স্পৃহা"—ইহাই রজের প্রধান লক্ষণ। এই গুণ "তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভবং।" ইহা "রাগাত্মিকা।" বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্ম্ম-চেষ্টা আছে। এখন পর্য্যন্ত জনহিতকর কর্ম্মে তাঁর বিন্দু পরিমাণ আলস্য বা ঔদাসীন্য দেখা যায় না। কিন্তু কর্ম্মচেষ্টা থাকিলেও কখনো কর্ম্মে তাঁর অশম স্পৃহা দেখা যায় নাই। তাঁর কর্ম্মচেষ্টা তৃষ্ণাসঙ্গ-সমুদ্ভব নহে, ধর্ম্মবুদ্ধি-প্রণোদিত। সুতরাং আমাদের অপরাপর কর্ম্মনায়কগণের মধ্যে প্রায়শঃই যে একটা আত্ম-প্রতিষ্ঠার ভাব ও ফল-সন্ধিৎসু চাঞ্চল্য লুকাইয়া থাকে, তাঁহাতে তাহা লক্ষিত হয় নাই। আর তাঁর প্রকৃতির ভিতরে এই রজোগুণের আতিশয্য নাই বলিয়া, যে মহাজনপন্থা অবলম্বন করিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে যুগে যুগে হিন্দু-সমাজের বিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে, যাহাকে আশ্রয় করিয়া হিন্দুসমাজ প্রত্যেক যুগসন্ধিসময়ে আপনার গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির

মধ্যে সুন্দর ও সহজ সন্ধি ও সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিয়াছে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার কর্ম্মজীবনে বা ধর্ম্মজীবনে কোথাও একান্তভাবে সেই মহাজন-পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন নাই। তাঁর ভিতরকার প্রকৃতিই এমন যে তিনি বৌদ্ধযুগের আদিতে জন্মিলে একান্তভাবে ভগবান বুদ্ধদেবের শরণাপন্ন হইতে পারিতেন না, তাঁর প্রতিবাদীও হইতেন না, কিন্তু বুদ্ধদেবের শিক্ষা ও সাধনার প্রতি অন্তরে ভক্তিমান হইয়াও সেকালের ক্রিয়া-বহুল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও বৈদিক পন্থাকেই ধরিয়া রহিতেন। মহাপ্রভুর সময়ে, এই বাঙ্গলাদেশে জন্মগ্রহণ করিলেও তিনি তাহাই করিতেন। সে কালের বহুসংখ্যক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থদিগের ন্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও হয় ত মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত ও সাধন গ্রহণ করিতেন। কিন্তু কখনই তাঁহার একান্ত অনুগত হইয়া, সমাজের প্রচলিত স্মৃতি-আনুগত্য বর্জ্জন করিতে পারিতেন না। আর আমাদের এই কালে, বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের গতিশক্তি যে সকল মহাজনকে আশ্রয় করিয়া সমাজের পরিবর্ত্তনযোগ্য রীতিনীতির সংস্কার-সাধনের প্রয়াসী হইয়াছে, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইঁহাদের সকলেরি প্রতি ভক্তিমান, কাহাকেও অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করেন না; কিন্তু আবার কাহাকেও একান্ত-ভাবে আশ্রয় করিয়া সমাজের পরিবর্ত্তন-যোগ্য রীতিনীতির আনুগত্যও পরিত্যাগ করিতে অগ্রসর হন নাই।

লৌকিকাচার

মোট কথা এই যে—

> "যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞঃ সমুদ্রলঙ্ঘনক্ষমঃ।
> তথাপি লৌকিকাচারং মনসাহপি ন লঙ্ঘয়েৎ ॥"

"যোগী ত্রিকালজ্ঞ এবং সমুদ্র-লঙ্ঘনক্ষম হইলেও, কদাপি আপনার মনেও লৌকিকাচারকে উল্লঙ্ঘন করিবেন না"—ইহাই গুরুদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কর্মজীবনের মূলসূত্র হইয়া আছে। মোটের উপরে তিনি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অনেক বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতির পরিবর্ত্তন যে আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে, ইহা জানেন ও মানেন। আর এ সকল মত প্রচার করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু যতদিন না সমাজ সমষ্টিগত ভাবে এগুলিকে গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ যতদিন না এগুলি লৌকিকাচারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ততদিন তিনি এ সকল সংস্কার কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত নহেন। কিছুকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এদেশের হিন্দু সমাজে অতি অল্প বয়সে বালক-বালিকাদের বিবাহ হইত; তিনি তার প্রতিবাদী। চতুর্দ্দশ কি পঞ্চদশ বর্ষেই সচরাচর "স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সংসর্গ লিপ্সার" উদ্রেক হয়; আর যে বয়সে এই প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়, তখনই তাহাকে "নির্দ্দিষ্ট পাত্রে ন্যস্ত করিয়া নিবৃত্তিমুখী করিবার জন্য" নরনারীকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করা কর্ত্তব্য—বিবাহের বয়স সম্বন্ধে তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। * কিন্তু কার্য্যতঃ বালিকাদের বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া তিনি দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষ পর্য্যন্তই তাহাদের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁর নিজের বুদ্ধি ও বিচার মতে চতুর্দ্দশ হইতে পঞ্চদশ বর্ষই বালিকাদের বিবাহের নিম্নতম কাল নির্দ্ধারিত হওয়া বিধেয়। "অসামান্য পবিত্র ও সংযতচিত্ত" নরনারীর পক্ষে আরো অধিক বয়সে বিবাহ করিলেও ধর্ম্মহানি হয় না, এ কথা তিনি অস্বীকার করেন না। তথাপি কেবল লৌকিকাচারের মুখাপেক্ষী হইয়া তিনি দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষই বালিকার বিবাহের উপযুক্ত বয়স বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ত্রিশ বৎসর পরে, বাঙ্গলার হিন্দুসমাজের লৌকিকাচারে যদি অষ্টাদশ বা উনবিংশ বর্ষের যুবতীগণের বিবাহ প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়, তখনো যে তিনি এই দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষের নিয়মকেই ধরিয়া থাকিবেন, এমন বোধ হয় না।

* জ্ঞান ও কর্ম্ম—২৮৪ পৃষ্ঠা।

যেমন বাল্য বিবাহের সংস্কার সম্বন্ধে, সেইরূপ হিন্দুসমাজের প্রচলিত জাতি-বিচার সম্বন্ধেও, লোকাচারে যে পরিমাণ শিথিলতা বা ঔদার্য্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তিনি কেবল তাহাই গ্রহণ করিতে রাজি আছেন। পরমার্থ দৃষ্টিতে যে জাতি-বিচারের স্থান নাই, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইহা স্বীকার করেন।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি
শুনিচৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"
গাভী হস্তী কুকুরকে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে।
পণ্ডিতেরা সমভাবে দেখেন সকলে॥"

রামচন্দ্র স্বয়ং গুহক চণ্ডালের সহিত মিত্রতা করিয়াছিলেন। অতএব হীনজাতি বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করা হিন্দুর কর্ত্তব্য নহে।" * গীতার এই উক্তি অনুসারে, আর গুণকর্ম্ম বিভাগের দ্বারা প্রথমে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি হয়, এই কৃষ্ণোক্তি স্মরণ করিয়া, হিন্দুসমাজে এখন যে আকারে জাতিবিচার প্রতিষ্ঠিত আছে, সঙ্গত বলিয়া তাহার সমর্থন সম্ভব নহে; তিনি ইহা জানেন। কিন্তু সমাজের লোকমত এখনো এতটা অগ্রসর হয় নাই। তবে বাঙ্গলার হিন্দুসমাজে আজিকালি জাতিবিচারটা কেবল পানাহার ও বিবাহেতেই আবদ্ধ হইয়া আছে। সুতরাং, মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর "লৌকিকাচারং মনসাঽপি ন লঙ্ঘয়েৎ"—এই আদেশ মনে রাখিয়াই যেন তিনি "আহার ও বিবাহ বাদ দিয়া" অন্যান্য বিষয়ে জাতির প্রাচীর যে ভাঙ্গা যাইতে পারে, ভাঙ্গাই যে কর্ত্তব্য, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। আর যে যুক্তি অবলম্বনে † বিবাহ ও আহার এই দুই বিষয়েই এখন জাতি বিচার মানিয়া চলা কর্ত্তব্য, অন্য বিষয়ে নহে, তিনি এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া লৌকিকাচারই যে তাঁহার সামাজিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে প্রধান ও সম্ভবতঃ একমাত্র তৌলদণ্ড, এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায়।

---

* জ্ঞান ও কর্ম্ম—৩৫৪ পৃষ্ঠা। † জ্ঞান ও ধর্ম্ম—৩৫৫ পৃষ্ঠা।

সামাজিক সিদ্ধান্ত

আর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতন এমন সম্যক্‌দর্শী, এত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সদ্বিচারক মনীষীর সিদ্ধান্তেও সামান্য লৌকিকাচার যে এতটা প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করাও কঠিন নহে। প্রথমতঃ, তিনি আযৌবনকাল আইনকানুন লইয়াই দিন কাটাইয়াছেন। আর সকল সভ্যদেশের ব্যবহার-শাস্ত্রেই লোকাচার অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। যে সকল লোকাচারের আরম্ভকাল জনগণের স্মৃতি হইতে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, সকল সভ্য সমাজে সে জাতীয় লৌকিকাচারকে প্রত্যক্ষ আইনের সুস্পষ্ট বিধানের সমান মর্য্যাদা দেওয়া হয়। বিবাহ, দায়ভাগ প্রভৃতি সামাজিক স্বত্বাস্বত্ব নির্দ্ধারণে এইরূপ লৌকিকাচার শ্রুতি স্মৃতি অপেক্ষাও বলবত্তর বলিয়া গণ্য হয়। আর ব্যবহার-শাস্ত্রে লৌকিকাচারের এতটা প্রভুত্ব দেখিয়া ব্যবহারজীবী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাণে তাহার প্রতি এমন মর্য্যাদা বোধ জন্মিয়াছে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যবহারবিদ্‌ (jurist) ও নীতিবিদ্‌ (moralist) দু'ই। কেবল ব্যবহারবিদ্‌ বলিলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হইবে, জানি। কিন্তু তথাপি তাঁর সাধনায় ও সিদ্ধান্তে ব্যবহারবিদের দিক্‌টা যে পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে, নীতিবিদের দিক্‌টা ঠিক সে পরিমাণে ফুটিয়া উঠিয়াছে কি না সন্দেহ। তাঁর জীবনের গুরুতর সমস্যা সকলকে কতটা পরিমাণে যে তিনি সমীচীন ব্যবহারবিদের চক্ষে দেখেন ও সর্ব্বদা ব্যবহার-তত্বের যুক্তিপ্রণালী অবলম্বনে এ সকলের যথোপযোগী মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁর "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থের প্রায় সর্ব্বত্রই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

একদিকে যেমন তাঁর ব্যবসায়ের দীর্ঘ অভ্যাস, অন্যদিকে সেইরূপ তাঁর তত্ব-সিদ্ধান্তও তাঁর এই লোকাচার আনুগত্যকে গড়িয়া তুলিয়াছে। তত্ব সম্বন্ধে তিনি শঙ্কর-বেদান্তাবলম্বী। শঙ্কর-বেদান্ত মতে, বিশেষতঃ

যে মায়াবাদ শঙ্কর-সিদ্ধান্ত বলিয়া এদেশে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে জীব ও জগতের সত্য ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়, এই জীব ও জগতের পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান পরমার্থতঃ মিথ্যা। মায়াতেই এই সংসারের উৎপত্তি, মায়াতেই ইহার স্থিতি। সংসারের বিবিধ সম্বন্ধসকলের কোনো নিত্য লক্ষ্য বা পারমার্থিক প্রতিষ্ঠা নাই। সুতরাং প্রচলিত শঙ্কর-সিদ্ধান্তে সমাজ-ধর্ম্ম ও সামাজিক উন্নতি-অবনতি, সকলই নীচের কথা। সাধনার্থীর নিকটে ইহার মূল্য থাকিলেও সিদ্ধ পুরুষের নিকটে ইহার কোনো সত্য, কোনো মূল্য নাই। ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য প্রভৃতির ব্যবহারিক সত্য ও সার্থকতা আছে মাত্র ; পারমার্থিক সত্য ও সার্থকতা নাই। অতএব দেহশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম, মনঃসংযম, উপরতি, তিতিক্ষা, এ সকল সাধন সম্পদ লাভের জন্য উপযোগী অভ্যাসের ক্ষেত্র বলিয়াই সংসার প্রয়োজনীয়। সাধন সম্পদ লাভ হইয়া ক্রমে বিবেক বৈরাগ্যাদি ও সর্ব্বশেষে ব্রহ্মাত্মৈকত্ব অনুভূতি বা কৈবল্য সিদ্ধি হইলে, সর্পের খোলস যেমন আপনা হইতে অনাবশ্যক বলিয়া খসিয়া পড়ে, সেইরূপ জীবের সংসার ও তাহার যাবতীয় সামাজিক সম্বন্ধাদিও তাহার মন হইতে আপনি খসিয়া পড়িয়া যায়। কিন্তু কেবল মায়াবাদীর নিকটেই যে সংসারের সম্বন্ধসকল অনিত্য, ও অনিত্য বলিয়া পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলীক, তাহা নহে। কোনো হিন্দু সিদ্ধান্তেই এ সকলের অনিত্যতা অস্বীকৃত হয় নাই। যাঁরা মায়াবাদী নহেন, তাঁরাও এগুলিকে নিত্য বা সত্য বলেন না। সুতরাং এ সকল ক্ষণস্থায়ী সম্বন্ধের অতীত হইবার চেষ্টা সকল সাধনেই আছে।

তবে মায়াবাদী এ সকলের পশ্চাতে কোনো স্থায়ী রস প্রত্যক্ষ করেন না। আর যাঁরা মায়াবাদী নহেন, তাঁরা সংসারের সর্ব্ববিধ অনিত্য সম্বন্ধের মধ্যেও কতকগুলি স্থায়ী রসের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং এই সকল রসকে রস-স্বরূপ যে পূর্ণব্রহ্ম তাঁহারই নিখিলরসামৃতসিন্ধুর উপরিস্থ

তরঙ্গভঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন। এ সংসারে পিতাপুত্রের যে কায়িক সম্বন্ধ তাহা প্রত্যক্ষতঃ অনিত্য। প্রাকৃত জনে যে বাৎসল্য রস আস্বাদন করে তাহা অস্থায়ী, সন্তানের জন্মের সঙ্গে তাহার উৎপত্তি হয়, আর সন্তান গত হইবার পরে সচরাচর তাহা ক্ষীণ হইয়া দীর্ঘকাল পরে লুপ্তপ্রায় হয়। কিন্তু এই সম্বন্ধের পশ্চাতে একটা স্থায়ী বাৎসল্য রস আছে। এই স্থায়ী রসই দেশকালের অধীন এই সংসারে লৌকিক পিতামাতার সঙ্গে পুত্রকন্যার যে সম্বন্ধ তাহার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এ রস ভগবৎ-প্রকৃতির অন্তর্গত, সুতরাং পারমার্থিক ও নিত্য। সংসারের বিভিন্ন সম্বন্ধ এই স্থায়ী ভাগবত লীলা-রসকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল সম্বন্ধের অন্তরালে, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চ স্থায়ী রস বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এই জন্য এই পঞ্চ স্থায়ী রসের প্রকাশ ও আলম্বন বলিয়া সংসারেরও একটা পারমার্থিক সত্য ও মাহাত্ম্য, মর্য্যাদা ও মূল্য আছে। জীব ও সংসার অত্যন্ত অনিত্য নহে, অত্যন্ত নিত্যও নহে, কিন্তু নিত্যানিত্য-মিশ্রিত। ইহাকে পরিণামী নিত্য বলা যায়। আর পরিণামী নিত্য বলিয়া এই সংসার ভাগবতী লীলার আশ্রয় হইয়া আছে। এই লীলা-প্রয়োজনেই মনুষ্যসমাজ মহাবিষ্ণু বা নারায়ণের কায়বূ্যহ হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপের আত্মচরিতার্থতার জন্য সেই অদ্বৈত-স্বরূপের মধ্যে যে একটা দ্বৈত সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, যে দ্বৈত-সম্বন্ধ বা ভেদাভেদকে অবলম্বন করিয়া ভগবান নিত্যলীলাপর হইয়া আছেন, শঙ্কর-সিদ্ধান্তে এই তত্ত্বের কোনো স্থান ও সঙ্গতি নাই। সুতরাং ভগবদ্-লীলারসপর বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তে যে ভাবে ও যে অর্থে মহাজন-পন্থা আশ্রয় করিয়া সমাজের গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তির মধ্যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, শঙ্কর সিদ্ধান্তে তাহা হয় নাই, হওয়া সম্ভব নহে। এখানে লৌকিকাচারের পন্থা অবলম্বন করিয়া এই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিদ্বয়ের মধ্যে

স্বাভাবিক বিরোধ ভঞ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তাহার আর অন্ত পথ নাই।

সংসার মায়ামাত্র। সমাজ সম্বন্ধ সকল মায়িক। মানুষের স্নেহমমতা, প্রেয় ও শ্রেয়বোধ, ভালমন্দ জ্ঞান, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার, সকলই অবিদ্যাবদ্-বিষয়াণি। সুতরাং নিজের বিশ্বাসের সঙ্গে কার্য্যের যে একটা সঙ্গতি রাখিতে হইবে, এখানে এমন কোনো কথা নাই। আমাদের এ সকল মতামত যখন মিথ্যা, কার্য্যাকার্য্য যখন মিথ্যা, মতের সঙ্গে কার্য্যের মিলন বা বিরোধও যখন মিথ্যা, তখন বিশ্বাসের সঙ্গে কাজের মিল হইল কি না হইল, তাহাও মিথ্যা। এ সকলের ব্যবহারিক সত্য থাকিলেও পারমার্থিক মর্য্যাদা নাই। এ সকল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে প্রয়োজনীয় হইলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে অলীক। প্রচলিত শঙ্কর-সিদ্ধান্তে সংসার ধর্ম্মের কোন পারমার্থিক সত্য ও মর্য্যাদা নাই। চিত্তশুদ্ধি করিয়া ক্রমে সর্ব্ববিধ দ্বৈতবোধ নষ্ট করা শঙ্কর-বেদান্ত মতে সমাজ ধর্ম্ম ও সমাজ বন্ধনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়ে। সমাজ বন্ধন ও সামাজিক সম্বন্ধ সকল জীবের বহির্মুখীন ও বহুমুখী প্রবৃত্তি সকলকে সংযত ও নিবৃত্তিমুখী করিয়া এই পারমার্থিক উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে। আর একমাত্র সংযম ও নিবৃত্তি সাধনই যখন সমাজ ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়, তখন লৌকিকাচারের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া, যে কোনো উদ্দেশ্যে ও যে কোনো আকারে সমাজের বিরুদ্ধে দ্রোহীভাব অবলম্বন করা হউক না কেন, তাহাতেই সমাজ বন্ধনের এই মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির বিষম ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। সমাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গেলে কোনো না কোনো আকারে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। এরূপ আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ জনগণের পক্ষে আপনার ইচ্ছা ও প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া রাখা একান্ত কঠিন হইয়া পড়ে। আর সর্ব্ববিধ আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের মধ্যে যে কলহ বিরোধ জাগিয়া থাকে, তাহাতে অন্তরের দ্বৈতভাব ও

ভেদবুদ্ধিকে জাগাইয়াই রাখে, নষ্ট করিতে সাহায্য করে না। সুতরাং লৌকিকাচারকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ-সংস্কার করিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা মোক্ষপথের অন্তরায় হইয়া উঠে। এই জন্য শঙ্কর মতাবলম্বী সাধু সন্ন্যাসী সমাজে একদিকে প্রচণ্ড জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞানপন্থার প্রতি ঐকান্তিক পক্ষপাতিত্ব, অন্যদিকে তামস প্রকৃতিসুলভ নিশ্চেষ্টতা ও লৌকিকাচারের আত্যন্তিক আনুগত্য, এ দুই দেখা গিয়া থাকে। একদিকে বিচারে চিন্তায় সাধনায় ও সিদ্ধান্তে—এ সকলে সর্ব্ববিধ দ্বৈতভাব ও ভেদবুদ্ধির নিন্দা করিয়াও কার্য্যকালে ইঁহারা প্রায় সর্ব্বদাই সমাজ-প্রচলিত সর্ব্বপ্রকারের ভেদ ও বৈষম্যের সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রাখিয়া চলিবার জন্য ব্যগ্র হন। শঙ্কর স্বয়ং ইহার অন্যথাচরণ করেন নাই। মধ্যযুগের হিন্দুয়ানী লৌকিকাচারকে যে এমন করিয়া ধর্ম্মের আসনে বসাইতে চাহিয়াছে, শঙ্কর-বেদান্তের সঙ্গে ইহার ঘনিষ্ঠ যোগ আছে বলিয়া মনে হয়। আর আজিও হিন্দুসমাজের সকল সম্প্রদায় মধ্যেই শঙ্কর-সিদ্ধান্তের প্রভাব, প্রত্যক্ষভাবে হউক আর প্রচ্ছন্নভাবে হউক, নিরতিশয় প্রবল রহিয়াছে বলিয়া আমাদের শ্রেষ্ঠতম মনীষীগণও লৌকিকাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ করিতে এত ভয় পাইয়া থাকেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লৌকিকাচারের ঐকান্তিক আনুগত্যের অন্তরালে শঙ্কর-বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে।

লৌকিকাচারকে কেবল মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীই যে ধর্ম্মের আসনে বসাইয়াছে, তাহা নহে। বর্ত্তমান কালে কোনো কোনো য়ুরোপীয় সিদ্ধান্তেও তার প্রায় অনুরূপ মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অষ্টাদশ খৃস্ট শতাব্দীর য়ুরোপীয় চিন্তা অতিপ্রাকৃত শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জ্জন করিয়াও সমাজ-স্থিতিরক্ষার্থে একটা বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি-প্রতিষ্ঠ মরালিটীর বা ধর্ম্ম-নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইয়া, ফলতঃ লৌকিকাচারকেই ধর্ম্মের আসনে বসাইয়াছে। প্রত্যক্ষবাদী কোমত্-সিদ্ধান্তে আমাদের শঙ্কর-

বেদান্তের ন্যায় সমাজ-বিবর্ত্তনে সমাজের গতি-শক্তি ও স্থিতি-শক্তির মধ্যে একটা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য লৌকিকাচারই প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কোমত্-সিদ্ধান্তবাদিগণ ইংরেজিতে যাঁহাদিগকে পজিটীভিষ্ট (Positivist) সম্প্রদায় বলে,—একদিকে যেমন সামাজিক উন্নতির জন্য লালায়িত, সেইরূপ অন্যদিকে সমাজের স্থিতিভঙ্গ নিবারণের জন্যও একান্ত ব্যগ্র হইয়া থাকেন। তাঁরা কিছুতেই কার্য্যতঃ সমাজের প্রচলিত বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতির প্রভাব নষ্ট করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের নিকটে সমাজই ধর্ম্মের কায়ব্যূহ-স্বরূপ। ক্যাথলিক্ খৃষ্টীয় মণ্ডলীর মধ্যে চার্চ্চ বা রোমক খৃষ্টীয় সঙ্ঘ যে মর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়, ধর্ম্মের বহিঃপ্রকাশ বলিয়া সকলে যেরূপ এই চার্চ্চের বা সঙ্ঘের আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলে, প্রত্যক্ষবাদী কোমত্-মতাবলম্বিগণ মধ্যে সমাজ সেইরূপ মর্য্যাদাই প্রাপ্ত হয়, এবং সমাজের আনুগত্য মানিয়া চলা কোমত্-মতে নিতান্ত নীতিসঙ্গত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

কোমত্ মতের সঙ্গে মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর এই সমাজানুগত্য বা লৌকিকাচার অনুগত্যের একটা যে ঐক্য আছে, বাঙ্গালী হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁরা কোমত্ মত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের শিক্ষায় ও চরিত্রে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। খিদিরপুরের জমিদার স্বর্গীয় যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, "ষ্টেশন" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ইঁহারা দু'জনেই কোমত্ মতাবলম্বী ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় জীবনের শেষভাগে এই মত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কি না, জানি না। যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যে পরিত্যাগ করেন নাই, ইহা সকলেই জানেন। আর এঁরা দু'জনই একদিকে ঘোরতর প্রত্যক্ষবাদী ও যুক্তিবাদী হইয়াও হিন্দুসমাজের রীতিনীতি ও সংস্কারাদির ঐকান্তিক আনুগত্য গ্রহণ করিতে কদাপি কুণ্ঠিত হন নাই। ইংরেজ কোমত্-বাদিগণ মধ্যে স্যার হেনরী কটন্ প্রভৃতি প্রায় সকলেই হিন্দুর এই লৌকিকাচারের

আনুগত্যকে কখনই ভাঙ্গিয়া দিতে চান নাই; বরং সর্ব্বদাই তাহাকে সঙ্গত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহারা পারলৌকিক ধর্ম্মের দিক দিয়া হিন্দু রীতিনীতির পোষকতা করেন নাই। সে ধর্ম্মে তাঁদের আদৌ বিশ্বাস ছিল না। কেবল শুদ্ধ সমাজের কল্যাণ কামনায়, সমাজ স্থিতি-রক্ষার্থে, সমাজ-নীতি বা মরালিটীর দিক দিয়াই এ সকলের সমর্থন করিতেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কোমত্-মতাবলম্বী নহেন। কিন্তু সমাজ নীতি সম্বন্ধে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লৌকিকাচারের ঐকান্তিক আনুগত্য যে কোমত্ মতের দ্বারা সমর্থিত হইয়া আধুনিক য়ুরোপীয় নীতিবিজ্ঞানের সঙ্গে ইহার একটা সঙ্গতি সাধনে তাঁহার বিশেষ সাহায্য করিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। তাহার জন্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আধুনিক শিক্ষা এবং সাধনা তাঁহার চরিত্রগত মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর ঐকান্তিক লৌকিকাচার-আনুগত্যকে নষ্ট করিতে পারে নাই।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এই রক্ষণশীলতার আরো একটী বিশেষ কারণ আছে। তিনি একদিকে য়ুরোপের আধুনিক সাধনা ও অন্যদিকে স্বদেশের সনাতন সাধনা উভয়েরই মূল প্রকৃতিটা ভাল করিয়া ধরিয়াছেন। এই দুই সাধনা ও সভ্যতার মধ্যে যে বিশাল বৈষম্য আছে, ইহা তিনি জানেন। আর যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির, সেইরূপ প্রত্যেক সমাজের ধর্ম্মও যে সর্ব্বদা তার ভিতরকার মূল প্রকৃতি হইতে সেই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, এবং এই জন্য কি ব্যক্তির পক্ষে কি সমাজের পক্ষে সকলের পক্ষে যে পরধর্ম্ম ভয়াবহ হয়, ইহাও তিনি বিশ্বাস করেন। আমাদের সমাজ সংস্কার প্রয়াস যে অনেক বিষয়ে ভারতের প্রাচীন সমাজ-প্রকৃতিকে উপেক্ষা করিয়া য়ুরোপের রীতিনীতির স্বল্পবিস্তর অনুকরণ-চেষ্টায় চলিয়াছে, ইহা তিনি দেখিতেছেন। য়ুরোপ যে পথে যাইয়া অসংযত বিষয়-

ভোগলালসায় বিক্ষিপ্ত হইয়া, আপনার জীবন সমস্যাকে বিষম জটিল করিয়া তুলিতেছে, নূতন নূতন পন্থার অনুসরণ করিয়া, সমাজের বুকে সমস্যার উপরে সমস্যা স্তূপাকার করিয়া তুলিতেছে, একটীরও সমীচীন মীমাংসা করিতে পারিতেছে না, কখনো পারিবে কি না তাহারও স্থিরতা নাই; এ সকলই জানেন। আর, আমরা যে সমাজের হিতেচ্ছু হইয়া এ সকল না বুঝিয়া, সংস্কারের নামে অনেক সময় নিজেদের সমাজের উপরে এই ভয়াবহ পরধর্ম্মের বোঝা চাপাইয়া দিতেছি, ইহাও তিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আর, এই জন্যই অজ্ঞাত ও অপরীক্ষিত পন্থায় সমাজকে চালাইবার পূর্ব্বে, সে পথ সমাজের অন্তঃপ্রকৃতির অনুযায়ী হইবে কি না, ইহা দেখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা এই লৌকিকাচারের মুখাপেক্ষী হইয়া চলিতে চাহেন। কারণ, কি ব্যক্তি কি সমাজ উভয়ই সর্ব্বদা আপনার প্রকৃতিকেই প্রাপ্ত হয়। ইহাকেই আধুনিক জীবতত্ত্বে বা বায়লজিতে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়ম কহে। এই নিয়মাধীন হইয়া সামাজিক রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থার বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। কদাপি যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না, এমন নহে। কিন্তু যেখানে ব্যতিক্রম ঘটে, সেখানে সমাজ পরধর্ম্মবশে আত্মহারা হইয়া বিপ্লবমুখী ও বিনাশোন্মুখ হইয়া উঠে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রক্ষণশীলতার অন্তরালে এই বিপ্লবের ভয়ই জাগিয়া আছে। বর্ত্তমান সময়ে রক্ষণশীল হিন্দু বলিয়া অনেকেই পরিচিত। কিন্তু ইহাঁরা অনেকেই প্রাচীন সমাজের জীর্ণ দেহকে রক্ষা করিবার জন্য যত ব্যস্ত, তার ভিতরকার সনাতন প্রাণবস্তুকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তত ব্যস্ত নহেন। হিন্দুয়ানীর বাহ্য ঠাট বজায় থাকিলে হিন্দুর সব রহিল, সেই ঠাটের ভিতরকার প্রাণটা হিন্দু কি অহিন্দু, ভারতীয় কি বিলাতী হইয়া যাইতেছে, এ চিন্তা তাঁহাদিগকে স্পর্শ করে না। এক গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ই, বোধ হয়, আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুদের মধ্যে হিন্দুর সনাতন প্রাণবস্তুকে অক্ষত

ও অক্ষয় রাখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন। আর এই ব্যগ্রতার জন্য হিন্দু সমাজের সনাতন প্রাণবস্তু এবং ধর্ম্মবস্তুও আজ তাঁহাকে ও তাঁহার মতন ধর্ম্মনিষ্ঠ ও কর্ম্মনিষ্ঠ, সংযত ও সম্যক্‌দর্শী সুধীজনকে আশ্রয় করিয়া, আসন্ন বিপ্লব-মুখে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রত্যেক বস্তুর স্থিতির ভূমি যাহা, তাহা অতি নিগূঢ় ভাবে চক্ষের অন্তরালে বসিয়া থাকে। তাহার গতির কারণ যাহা তাহাই বাহিরে ফুটিয়া উঠে। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত লোকনায়কগণ সমাজের স্থিতির সহায় বলিয়া, তাঁহাদের প্রভাব সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ হয় না; নতুবা তাঁহাদের শক্তি ও মাহাত্ম্য যে সামান্য, তাহা নহে। ইঁহারা আছেন বলিয়াই হিন্দুর সমাজের সমাজত্ব ও হিন্দুর ধর্ম্মের ধর্ম্মত্বটুকু এখনো আমাদের মধ্যে বাঁচিয়া রহিয়াছে।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা হইতে আমাদের রাষ্ট্রীয় ও স্বাদেশিক কর্ম্মক্ষেত্রে একটা নূতন বস্তুর আমদানী হইয়াছে। ইহার নাম নেতা বা নায়ক বা "লীডার"। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এ কথা আমরা শুনি নাই। কৃষ্ণদাস পাল জমিদার-সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন না, মুখপাত্র বা প্রতিনিধি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বা আনন্দমোহন, শিশিরকুমার বা কালীচরণ, ইঁহাদের কেহই সেকালে নেতা উপাধি লাভ করেন নাই, কিন্তু দেশের নব্য শিক্ষা-প্রাপ্ত সমাজে ইঁহাদের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। আমার মনে হয় যে, সে সময়ে আমরা যে ব্যক্তিস্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শ ধরিয়া চলিতেছিলাম, তাহা কোন লোকবিশেষের নেতৃত্বের দাবী সহ্য করিতে পারিত না বলিয়া সে যুগে আমাদের মধ্যে নেতার বা নায়কের বা লীডারের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে নাই। এখন যে বস্তুকে আমরা নেতা বলি সে বস্তু তখনও ছিল। মনের ভাবে তো আর সংসারে কোথাও বস্তু-বিপর্য্যয় ঘটে না। তবে আমরা তখন সে বস্তুকে নেতা বা নায়ক বা লীডার বলিয়া ডাকিতাম না, ইহাই কেবল সত্য।

আর আজ আমরা এই সকল নামকরণ করিতেছি বলিয়া যে নূতন বস্তু লাভ করিতেছি, এমনই কি বলা যায়? সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কর্ম্মী ও মনীষীগণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র এবং প্রতিনিধি তখন ছিলেন, এখনও আছেন। আমরা এখন তাঁহাদিগকে প্রতিনিধি না বলিয়া নেতা বলিতে বেশি ভালবাসি; কিন্তু তাই বলিয়া যে আমাদের কথার জোরে তাঁরা নেতা বা নায়ক হইয়া উঠেন, এমনও বলা যায় না। ফলতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত নায়কত্ব লাভ করা সহজ ব্যাপারও নহে।

আমরা লেখাপড়া জানি কিম্বা না জানিলেও জানি বলিয়া আমাদের যে অভিমান জন্মিয়াছে, তাহার দরুণ কেহ আমাদের প্রকৃত নেতা হইতে পারেন না। আমরা বিচার করি, যুক্তি করি, পরখ করি, লাভালাভ গণনা করি; তার পরে যাঁর কথা আমাদের মনোমত হয়, তাঁহাকে আমাদের মুখপাত্র বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু কাহারও কথায় আমরা উঠিতে বসিতে পারি না। কাহারও পশ্চাতে যাইয়া দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে জানি না। কাহারও মান বা প্রাণ রক্ষার জন্য আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে পারি না। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত লোকের মধ্যে, কচিৎ ধর্ম্মের ব্যাপারে সম্ভব হইলেও, সাধারণ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রে ইহা সম্ভবপর নহে। এই জন্য কেবল ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে যাঁহাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে লোক-প্রতিনিধি বলা যায়, কিন্তু লোক-নায়ক বলা যায় না।

বস্তুতঃ আমাদের বর্ত্তমান কর্ম্মিগণের মধ্যে কেবল একজনমাত্র প্রকৃত লোকনায়ক আছেন বলিয়া আমার মনে হয়, তিনি বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত।

অশ্বিনীকুমার শিক্ষিত, কিন্তু কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন; সদ্বক্তা, কিন্তু দৈবী প্রতিভাসম্পন্ন বাগ্মী নহেন। সুললিত বাক্য যোজনা করিয়া তিনি বহু লোককে উপদেশ দিতে পারেন, কিন্তু শব্দ ও ভাবের বন্যা ছুটাইয়া তাহাদিগকে আত্মহারা করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিতে পারেন না। তিনি সাহিত্যিক,—তাঁর 'ভক্তিযোগ' বাংলাভাষায় একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ; কিন্তু যে সাহিত্য-সৃষ্টির দ্বারা সমাজে নূতন আদর্শ ও নূতন উৎসাহ ফুটিয়া উঠে, সে সৃষ্টি-শক্তি তাঁর নাই। তিনি দরিদ্র নহেন, পিতৃদত্ত সম্পত্তি দ্বারা তাঁর সাংসারিক সচ্ছলতা সম্পাদিত হয়; কিন্তু যতটা ধনের অধিকারী হইলে, সেই ধনের শক্তিতে লোকে সমাজপতি হইয়া উঠে, অশ্বিনীকুমারের সে বিভব নাই। অশ্বিনীকুমার বি, এল, পাশ

করিয়া কিছুদিন ওকালতি করিয়াছিলেন ; সে দিকে মনোনিবেশ করিলে তিনি আধুনিক ব্যবহারজীবিগণের অগ্রণীদলভুক্ত হইতে পারিতেন না যে, এমনও মনে হয় না। কিন্তু অশ্বিনীকুমার সে দিকে বিধিমত চেষ্টা করেন নাই। সুতরাং বড় উকীল কৌন্সিলী হইয়া লোকে সমাজে যে প্রতিপত্তি ও প্রভাব লাভ করে, অশ্বিনীকুমার তাহা পান নাই। সরকারী কর্ম্মে কৃতিত্বের দ্বারাও সমাজে এক জাতীয় নেতৃত্ব লাভ করা যায়। অশ্বিনীকুমারের পিতা উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন ; ইচ্ছা করিলে অশ্বিনী-কুমারও সহজেই একটা ডেপুটিগিরি জুটাইতে পারিতেন, আর তাঁর বিদ্যা ও চরিত্রগুণে রাজকার্য্যে তিনি যে খুবই কৃতিত্ব এবং উন্নতি লাভ করিতে পারিতেন, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এ সকলের কিছুই করেন নাই। যে গুণ থাকিলে, যে কর্ম্ম ও কৃতিত্ব-বলে সচরাচর আমাদের মধ্যে লোকনেতৃত্ব লাভ হয়, অশ্বিনী-কুমার তার কিছুরই দাবী করিতে পারেন না। তথাপি, তাঁর মতন এমন সত্য ও সাচ্চা লোক-নায়ক বাংলার প্রসিদ্ধ কর্ম্মিগণের মধ্যে আর একজনও আছেন বলিয়া জানি না।

ফলতঃ আমার মনে হয় যে, আমাদের চিন্তানায়ক অনেক আছেন, কিন্তু লোকনায়ক নাই। কেহ বক্তা, কেহ কবি, কেহ মসীজীবী, কেহ ব্যবহারজীবী ; কেহ বা ধনে, কেহ বা পদে বড়। এই সকল লোকে মিলিয়া দেশের মনের গতি ও কর্ম্মের আদর্শ বদলাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। ইঁহারা না থাকিলে বাংলা আজ যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, সেখানে যাইতে পারিত না। ইহারা দেশের প্রাণতা বাড়াইয়া দিয়াছেন, লোক-চরিত্রকে উদার ও উন্নত করিয়াছেন। কিন্তু ইঁহারা কেহই সত্য অর্থে লোকনায়ক নহেন। লোকে ইঁহাদের পুস্তক আনন্দে পড়ে, ইঁহাদের বক্তৃতা আগ্রহে শোনে ; ইঁহাদের গুণগান প্রাণ খুলিয়া করে ; ইঁহাদিগকে সভাসমিতিতে উচ্চ আসনে লইয়া

গিয়া বসায়, পথে দেখা হইলে সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দেয়; দেশহিতকর অনুষ্ঠানাদিতে ইঁহাদিগকে আদর করিয়া পৌরোহিত্যে বরণ করে। এ সকলই করে; করে না কেবল সত্যভাবে ইঁহাদের অনুবর্ত্তন। যতদিন লোকের মনের সঙ্গে ইঁহাদের কথা মিলিয়া যায়, লোকের ভাবের সঙ্গে ইঁহাদের উপদেশ মিশ খায়, লোকে যাহা আপনা হইতে চাহে যত দিন ইঁহারা সে পথে নিজেরা চলিতে ও তাহাদিগকে চালাইতে রাজি থাকেন, ততদিন ইঁহাদিগকে সকলে মাথায় করিয়া রাখে। কিন্তু মতভেদ উপস্থিত হইলেই ইঁহাদিগকে অবলীলাক্রমে ছাড়িয়া আসিতে দ্বিধা বোধ করে না। ইহাকে প্রকৃত লোকনায়কত্ব বলে না, বা বলা সঙ্গত নহে।

প্রকৃত লোক-নায়ক এদেশে ক্রমে লোপ পাইয়া যাইতেছে। এক সময়ে, হিন্দু ও মুসলমান সমাজে, যে জাতীয় লোকনায়ক স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা আর আজ দেখিতে পাই না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আমাদের আধুনিক শিক্ষাতে আমাদিগকে দেশের লোকের প্রাণ হইতে ক্রমশঃই যেন দূরে লইয়া গিয়া ফেলিতেছে। প্রথমতঃ আমাদের পিতৃ-পিতামহেরা যে ভাবে আপন আপন গ্রামের সঙ্গে একাত্ম হইয়া বাস করিতেন, আমরা আর তাহা করি না। তাঁরাও সময় সময়, বিষয়-কর্ম্মের খাতিরে গ্রাম ছাড়িয়া দূরান্তে বাস করিতেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলে তাঁহাদের স্ত্রীপুত্রেরা গ্রামেই থাকিতেন। যেক্ষেত্রে তাঁহারা পরিবার সঙ্গে লইয়া কর্ম্মস্থলে যাইতেন সেখানেও গ্রামের সমাজের সঙ্গে তাঁহাদের প্রাণগত অন্তরঙ্গ যোগ নষ্ট হইত না। বিদেশে প্রবাসে তাঁরা অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, গ্রামে আসিয়া আপনার আত্মীয়কুটুম্ব প্রতিবেশী ও বন্ধুবর্গের মধ্যে সে অর্থ ব্যয় করিতেন। পরোক্ষভাবে দশে তাঁহাদের অর্থের ভাগী ও ভোগী হইত; সাক্ষাৎভাবে তাহারা তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা দ্বারা সময়ে

অসময়ে অনেক সাহায্য লাভ করিত। বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া-কর্ম্মে, দোল দুর্গোৎসবাদি নৈমিত্তিক পূজা পার্ব্বণে, নিত্য দেবসেবা ও অতিথি-সেবার ভিতর দিয়া, গ্রামের লোকের সঙ্গে তাঁহাদের একটা নিকট সম্বন্ধ জমাট হইয়া যাইত। আর এই জন্য তাঁরা যেখানে যাইয়া দাঁড়াইতেন, শত শত লোকে সেখানে যাইয়া তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া দাঁড়াইত। তাঁরা যে কাজ করিতে যাইতেন, সকলে সে কাজে রত হইত। তাঁরা যে পথ দেখাইতেন, সকলে বিনা ওজরে, বিনা বিচারে, সে পথ ধরিয়া চলিত। তখন দেশে সত্যকার লোকনেতৃত্ব ছিল। ইঁহারাই সেকালে প্রকৃত লোক-নায়ক ছিলেন।

আর আজ—'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ'। সেদিন নাই- সে সমাজও নাই! লোকে লেখাপড়া শিখিয়া, যারা লেখা পড়া জানে না তাহাদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে শিক্ষিত ও 'অশিক্ষিতে'র, বিজ্ঞের ও অজ্ঞের মধ্যে এককালে এ সাংঘাতিক ব্যবধান ছিল না। গ্রামের বিদ্যাভূষণ বা তর্কসিদ্ধান্ত বা ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাড়ীতে আপামর সাধারণ সকলের অবাধ গতিবিধি ছিল। তাঁদের চতুষ্পাঠীতে যখন তাঁরা শিষ্যমণ্ডলী-বেষ্টিত হইয়া ব্যাকরণ বা স্মৃতি বা ন্যায়ের অধ্যাপনা করিতেন, তখন গ্রামের চাষী ও ব্যবসায়ী তাঁদের কাছে যাইয়া নীরবে বসিয়া থাকিত এবং তামাকাদি সাজিয়া তাঁদের সেবাশুশ্রূষায় নিযুক্ত হইত। তাঁদের সঙ্গে এসকলের বিদ্যার ব্যবধান যাই থাকুক না কেন, প্রাণের ব্যবধান বড় বেশি ছিল না; আর এই একপ্রাণতা নিবন্ধন, দেশের আপামর সাধারণে এ সকল উদারচরিত পণ্ডিতদের শাস্ত্রজ্ঞান লাভ না করিয়াও তাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবে, কথাবার্ত্তার গুণে অনেকটা সুশিক্ষিত হইয়া উঠিত। এ শিক্ষা স্কুল-পাঠশালায় মিলে না। আমরা একটু আধটু লেখাপড়া শিখিয়া, চিন্তায় ভাবে আদর্শে অভ্যাসে সকল বিষয়ে দেশের লোক হইতে এতটা পৃথক

হইয়া পড়িয়াছি যে, তাহাদের কথা আমাদের মিষ্টি লাগে না, আমাদের কথাও তাদের বোধগম্য হয় না। তাদের আমোদপ্রমোদে আমরা গা ঢালিয়া দিতে পারি না; আমাদের উৎসবাদিতেও তারা আমাদের কাছে ঘেঁষিতে পারে না। আমাদের বাড়ীতে তারা সাহস করিয়া আসে না, আমরাও আমাদের ক্রিয়াকর্ম্মে তাহাদিগকে আদর করিয়া ডাকি না। ইংরেজকে তারা যে ভাবে দেখে, যেরূপ সম্মান করে, আমাদিগকেও প্রায় সেইরূপ করে। আর এই জন্য দেশের লোকে যেমন ইংরেজের শাসন মানিয়া চলে, কিন্তু আপনা হইতে প্রাণের টানে এই সরকারের অনুবর্ত্তন করে না, আমাদের আন্দোলন-আলোচনাদিতেও এখন দেশের লোকে ঠিক ঐ ভাবেই আসিয়া যোগদান করে;—খাতিরে করে, বড়লোক ভাবিয়া আমাদের "মাস-মিটিংএ" আসিয়া জনতা করে, কিন্তু আপনার জন বলিয়া, অন্তরের টানে আমাদের কাছে তারা আসে না। এ অবস্থায়, প্রকৃত লোকনায়কত্বের প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভবে না।

তবে অশ্বিনীকুমারের পক্ষে ইহা অনেকটা সম্ভব হইয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, অশ্বিনীকুমার কখনও সাধারণ ইংরেজি-নবিশদিগের মত জীবনটা কাটান নাই। তিনি লেখাপড়া শিখিয়া কর্ম্মের খাতিরে, যশের লোভে বা সখের দায়ে, আপনার দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসেন নাই। বরিশালেই তিনি তাঁর কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতে আরম্ভ করেন। বহুদিন পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারের একবার কলিকাতায় আসিয়া বাস করিবার প্রস্তাব হয়, এরূপ শুনিয়াছি। প্রবীণ সাহিত্যিক, ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তখন জীবিত ছিলেন। অশ্বিনীকুমার প্রায়ই দেওঘরে যাইয়া বসু মহাশয়ের সহিত মিলিত হইতেন। অশ্বিনীকুমারের কলিকাতায় আসিবার কথা শুনিয়া, রাজনারায়ণ বসু তাঁহাকে এমন আত্মঘাতী কর্ম্ম করিতে নিষেধ করেন। অশ্বিনীকুমার যদি এ নিষেধ

না শুনিতেন, আমাদের দশজনের মতন যদি কলিকাতায় আসিয়া বসবাস করিতেন, তাহা হইলে বাংলার আধুনিক কর্ম্মজীবনের ইতিহাসে তিনি আজ যে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সে স্থান কিছুতে পাইতেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়।

প্রথম যৌবনেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া অশ্বিনীকুমার বরিশালে যাইয়া স্বদেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। সে সময়ে লাট রিপন্ প্রবর্ত্তিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বা Local Self-Governmentএর খুব প্রাদুর্ভাব ছিল। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজ, বিশেষতঃ দেশের ব্যবহার-জীবিগণ এই স্বায়ত্তশাসনেই দেশের ভবিষ্যতের স্বাধীনতার পত্তন হইল ভাবিয়া উৎসাহ সহকারে মিউনিসিপ্যালিটি এবং ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অশ্বিনীকুমারও সেই পথ ধরিয়াই নিজের সহরের এবং জেলার সেবাতে নিযুক্ত হন। এবং ক্রমে ওকালতি পরিত্যাগ করিয়া লোকশিক্ষার কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যতদূর আমার মনে আছে, বোধ হয় তিনি বহুকাল ধরিয়া আপনার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। ক্রমোন্নতি সহকারে অশ্বিনীকুমারের উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় কলেজে পরিণত হয়, এবং অশ্বিনীকুমার একজন মনীষাসম্পন্ন স্বার্থত্যাগী লোকশিক্ষকের খ্যাতিলাভ করেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে বিশেষভাবে আমাদের মধ্যে অল্প বেতন লইয়া উচ্চ শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। আজিকালি দেশে এ শ্রেণীর অনেকগুলি বে-সরকারী স্কুল-কলেজ হইয়াছে, কিন্তু এক বিদ্যাসাগর মহাশয় ব্যতীত বে-সরকারী স্কুল-কলেজের প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রায় অপর সকলেই এগুলিকে জীবিকা উপার্জ্জনের একটা প্রশস্ত উপায় রূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার তাহা করেন নাই। সে প্রয়োজনও তাঁর ছিল না। ফলতঃ আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরে, অশ্বিনীকুমারের মতন আর কেহ এতটা নিঃস্বার্থভাবে

স্বদেশীয়দিগের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রচার করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন নাই। এইজন্য আজি পর্য্যন্ত অশ্বিনীকুমারের স্কুল ও কলেজের পরিচালনা কার্য্যে কোন প্রকারের ব্যবসাদারীর পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অশ্বিনীকুমার লোকশিক্ষার জন্য বহু বৎসর ধরিয়া আপনার সময়, শক্তি এবং অর্থ অকাতরে দান করিয়াছেন, কখনো তাহার এক কপর্দ্দকের প্রতিদানের প্রত্যাশা করেন নাই। এই জন্যই বোধ হয় তাঁহার শিক্ষার ও চরিত্রের প্রভাব এ দেশের, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের, শিক্ষা প্রাপ্ত যুবকমণ্ডলীর মধ্যে এতটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রধানতঃ অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরাই পূর্ব্ববঙ্গের জেলায় জেলায় সাচ্চা স্বদেশীর পুরোহিত হইয়া বসিয়া আছেন। স্বদেশী যে পূর্ব্ববঙ্গে এতটা শক্তিশালী হইয়াছিল, এবং এখনো হইয়া আছে, তাহার প্রধান কারণ অশ্বিনীকুমারের চরিত্র ও শিক্ষা। স্কুল ও কলেজ খুলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট গ্রন্থাবলী পড়াইয়াই যুবকগণের শিক্ষার কাজ শেষ হইল, অশ্বিনীকুমার কখনো এমনটা মনে করেন নাই। ছাত্রদিগের চরিত্র-গঠনের জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। চরিত্র-গঠনের উপায় কেবলমাত্র উপদেশ নহে, কিন্তু সদনুষ্ঠান। অশ্বিনীকুমার আপনার স্কুল ও কলেজের যুবকমণ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে বিবিধ সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিতে আরম্ভ করেন। চরিত্র-গঠনের মূল পরার্থপরতা সাধন। লোকসেবার ভিতর দিয়া যে ভাবে ও যে পরিমাণে এই পরার্থপরতা সাধন করিতে পারা যায়, আর কোনও উপায়ে তাহা যায় না। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা দল বাঁধিয়া বরিশালের আর্ত্তজনের সেবায় নিযুক্ত হইতেন।

বহু দিন হইতে বরিশালে মাঝে মাঝে বিসূচিকার নিরতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের স্কুল এবং কলেজের যুবকেরা সে সব সময়ে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে লোকের ঘরে ঘরে যাইয়া রোগীর শুশ্রূষা

করিয়াছেন। মামলা-মোকদ্দমা উপলক্ষে পল্লীগ্রাম হইতে বহু লোক সর্ব্বদা বরিশালে যাতায়াত করে। বরিশাল মুসলমানপ্রধান স্থান। সহরের এই সকল অভ্যাগতদিগের মধ্যে মুসলমানদিগের সংখ্যাই বেশী হয়। ইহারা সহরে আসিয়া মোসাফেরখানায় বা হোটেলে আশ্রয় লইয়া থাকে। এই সকল হোটেলে স্বাস্থ্য রক্ষার কোনো ব্যবস্থা যে নাই, ইহা বলা বাহুল্য; বিশেষতঃ পরিবার পরিজন হইতে দূরে আসিয়া এরূপ বন্ধুহীন স্থানে বিসূচিকা দ্বারা আক্রান্ত হইলে লোকের কত না দুর্গতি হয়, ইহা সহজে অনুমান করা যায়। অশ্বিনীকুমারের ছাত্ররা সর্ব্বদা নিতান্ত আপনার জনের মত এই সকল অসহায় রোগীর সেবা করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বৈদ্য এবং কায়স্থ সন্তানেরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া ইহাদিগের মলমূত্র পরিষ্কার করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ অকাতরে এই সকল বিপন্ন লোকের ঔষধ এবং পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়াছেন। বরিশালের এই সেবকদল অনেক বন্ধুহীন লোকের মৃতদেহের সৎকার করিয়াছেন। সহরের বারাঙ্গনাগণ পর্য্যন্ত ইহাদের এই সেবা হইতে বঞ্চিত হয় নাই। অশ্বিনীকুমারের শিষ্যেরা বিপন্ন রোগীর শুশ্রূষা করিতে যাইয়া কোনো দিন কোনো প্রকারের জাতিবর্ণের বিচার করেন নাই। আকালে, অন্নকষ্টে, ইহারা সম্পন্ন লোকদিগের নিকট হইতে দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিয়া হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বিপন্ন জনের ক্ষুন্নিবারণের উপায় করিয়া দিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের লোক-সেবা কেবল যে সহরে আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। বহু দিন হইতে অশ্বিনীকুমারের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। কতকটা নিজের শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য, আর কতকটা আপনার বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে তিনি আপনার জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নৌকাযোগে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকেন। এই সকল সফরের সময় দেশের গরীব লোকেরা সর্ব্বদা নানা বিষয়ে তাঁহার সাহায্য এবং সেবা পাইয়া আসিয়াছেন; অশ্বিনীকুমারের নৌকা কোথাও

আসিয়াছে, শুনিলেই সে স্থানের গরীব লোকেরা আপন আপন শরীর-মনের বোঝা লইয়া নিতান্ত আপনার জন ভাবিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। রোগী ঔষধ চায়, দরিদ্র অর্থ চায়, জিজ্ঞাসু উপদেশ চায়, আর যাহার চাহিবার কিছু নাই, সেও তাঁহাকে কেবল চক্ষে দেখিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য তাঁহার কাছে যাইয়া উপস্থিত হয়। সকলের অভাব বা প্রার্থনা যে তিনি পূরণ করিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। ভগবানের নিকটেও মানুষ সর্ব্বদা কত কি চায়, কিন্তু যাহা চায় তাহাই যে পায়, এমন নহে; তথাপি ঈপ্সিত লাভ না হইলেও তাহাদের প্রাণে শান্তিলাভ হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমারের সম্বন্ধেও কতকটা তাই হয়। সকলের প্রার্থনা পূরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত, কোনো মানুষই তাহা পারে না। তবে মিষ্ট কথায়, স্নেহসিক্ত সম্ভাষণে অন্তরের সহানুভূতি ও সমবেদনা দিয়া প্রতি মানুষই অপর মানুষের প্রাণটা ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পারেন। অশ্বিনীকুমার এটী সর্ব্বদাই করিয়াছেন। এই জন্য বরিশালের জনসাধারণের সঙ্গে বহুদিন হইতে তাঁহার একটা গভীর প্রাণের যোগ গড়িয়া উঠিয়াছে।

কি সহজ উপায়ে তিনি লোকের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, আমাদের পক্ষে অনেক সময় তাহা কল্পনা করিয়া উঠাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। একটী সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়িল। সে বেশী দিনের কথা নয়; স্বদেশী আন্দোলনের তখন খুব প্রাদুর্ভাব। বরিশালে একটা অতি বিস্তৃত ও স্বল্পবিস্তর সঙ্গতিসম্পন্ন নমঃশূদ্র সমাজ আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ খৃষ্টীয়ান হইয়া গিয়াছেন; কেহ কেহ লেখা পড়াও শিখিয়াছেন। এই সকল সূত্রে পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রভাবও কিয়ৎপরিমাণে এই নমঃশূদ্র সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। নমঃশূদ্রেরা কোনও বিষয়ে দেশের অপরাপর শূদ্রগণ অপেক্ষা হীন নহেন; অথচ ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি তথাকথিত উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা স্বচ্ছন্দে

অপর শূদ্রদের জল গ্রহণ করেন; নমঃশূদ্রের জল গ্রহণ করেন না। নমঃশূদ্রেরা এ জন্য আপনাদিগকে অযথা অপমানিত মনে করিয়া এই প্রথার বিরুদ্ধে একটা প্রবল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছেন। স্বদেশীর মুখে নমঃশূদ্রদিগের এই আন্দোলনটা বেশ বাড়িয়া উঠে। স্বদেশীদলে আত্মবিরোধ বাধাইবার জন্য স্বদেশীর বিরোধিগণ নমঃশূদ্রদিগের এই আন্দোলনে নানা ভাবে ইন্ধন প্রদান করিতে আরম্ভ করেন। বরিশালের একজন নিষ্ঠাবান স্বদেশসেবক নমঃশূদ্রকে একদিন কেহ বলেন, "বাবুরা ত 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া ভাই ভাই একঠাঁই করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন কেন? ভদ্রসমাজে তোমাদের জল চলে না, হুঁকা চলে না, তবুও তোমরা তাদের ভাই? কথাটা মন্দ নয়!" এ কথা শুনিয়া এই ব্যক্তির মনে একটা খট্‌কা বাধিয়া যায়। সে সময়ে অশ্বিনীকুমার সেই অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন। আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্য এই নমঃশূদ্র স্বদেশসেবক অশ্বিনীকুমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্বে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অশ্বিনীকুমার আপনার নৌকায় নিজের শয্যার উপরে বসিয়া ছিলেন। শয্যার নিকটেই একটা ফরাশ পাতা ছিল। নমঃশূদ্রটী অশ্বিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন; অশ্বিনীকুমারও অমনি দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতিনমস্কার করিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠের ভিতরে তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার পরিচয় লইয়া তাহার সঙ্গে যাইয়া সেই ফরাশে বসিলেন। তার পর অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নমঃশূদ্রটী বলিলেন—"বাবু, আমি আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করা এখন অনাবশ্যক; আমার প্রশ্নের উত্তর আমি পাইয়াছি। আপনি যখন আমাকে লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথা কহিয়াছেন তাহাতেই বুঝিয়াছি, 'বন্দেমাতরম্' সত্য এবং আমরা আপনাদের ভাই।"

ঘটনাটী ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে কি সহজ ও স্বাভাবিক উপায়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে সর্ব্বসাধারণের চিত্তের উপরে আপনার অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়।

দুই

সে কালের অধিকাংশ ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মতন প্রথম যৌবনে অশ্বিনীকুমারও ব্রাহ্মসমাজের চিন্তা ও আদর্শের দ্বারা স্বল্পবিস্তর অভিভূত হইয়াছিলেন। এমন কি এক সময়ে তাঁর যৌবন-বন্ধুরা ভাবিয়াছিলেন যে বুঝি বা অশ্বিনীকুমার প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদ এবং ধর্ম্মের আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াও অশ্বিনীকুমার তাহার সমাজ-দ্রোহিতার সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া যোগদান করিতে পারেন নাই। এই জন্য দেশে ফিরিয়া, পিতার আদেশে খাঁটি হিন্দু পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। আমি যতদূর জানি, মত ও বিশ্বাসে অশ্বিনীকুমার এখনও অনেকটা ব্রাহ্মভাবাপন্নই হইয়া আছেন; কিন্তু এ সত্ত্বেও বোধ হয় এপর্য্যন্ত প্রচলিত হিন্দুসমাজের নিতান্ত বিরোধী কোন আচার ব্যবহারে লিপ্ত হন নাই। খাদ্যাখাদ্য ও আচার-বিচার সম্বন্ধে তিনি চিরদিনই উদার হিন্দুর মতন জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারকে যাঁরা পছন্দ করেন না, তাঁরা ইহাকে তাঁর কাপুরুষতার লক্ষণ বলিয়া প্রচার করেন। তাঁর বন্ধুরা বলেন, অশ্বিনীকুমার নিতান্ত সত্যবাদী ও ধর্ম্মভীরু বলিয়াই সমাজবিধি মানিয়া চলেন। আমার মনে হয় যে, যে উপাদানে দ্রোহী-চরিত্র রচিত হয়, অশ্বিনীকুমারের মধ্যে সে বস্তু কোন দিন ছিল না। থাকিলে তিনি যেমনটী হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছেন ও যে কাজটী করিয়াছেন, তাহা করিতে পারিতেন বলিয়া বোধ হয় না।

একটা ছবির মধ্যে যেমন আলো ও ছায়ার যথাযোগ্য সমাবেশে তার সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, মানুষের চরিত্রেও সেইরূপ ভালমন্দ মিশিয়া, তার বিশিষ্টতাকে গড়িয়া তোলে। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে যে কিছু দুর্ব্বলতা লোকে লক্ষ্য করে, তাহার সঙ্গে তাঁর চরিত্রের অনন্যসাধারণ শক্তিও অতি ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া আছে। এক্ষেত্রে মন্দটুকুকে ছাঁটিয়া ভালটুকু রাখা সম্ভব হয় না। দ্রোহিতা মাত্রেই প্রবল রাজসিকতার ফল। সমাজ-সংস্কারকেরা সকলেই রাজসিক স্বভাবের লোক। এমন কি, পুরাতনকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে সকল যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ বা অবতার নব যুগধর্ম্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁদের সকলকেই স্ব-কার্য্য সাধনের জন্য এই রজোধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই রাজসিকতা হইতে সর্ব্বপ্রকারের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রেরণা আসে। আর সংস্কার, বিদ্রোহ, সকলই এই আত্মপ্রতিষ্ঠার রূপান্তর ও নামান্তর মাত্র। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে কোন দিন এই আত্মপ্রতিষ্ঠার বা এই সংগ্রামশীলতার বা এই প্রখর রাজসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। এগুলি থাকিলে তাঁর চরিত্র এমন মোলায়েম ও তাঁর জীবন-ব্রত এতটা সফল হইতে পারিত না।

অশ্বিনীকুমার প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত না হইলেও বহুদিন পর্য্যন্ত ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ এবং ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতাই ব্রাহ্মমতের মূল ভিত্তি। এই দুইটী সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্ম আচার্য্যগণের প্রকৃতিগত আস্তিক্যবুদ্ধি বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্মকে গড়িয়া তুলিয়াছে। আর এই যুক্তিবাদ ও অনধীনতার আদর্শ উভয়ই ইংরেজি শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল। ইংরেজি শিখিয়া আমরা সকলেই এগুলির দ্বারা একদিন স্বল্পবিস্তর অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম। অশ্বিনীকুমারও এ প্রভাবকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু বয়োবৃদ্ধি সহকারে অন্তর্দৃষ্টি জাগিতে আরম্ভ করিলে এবং সংসারের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইয়া

সকল বিষয়ের চারিদিক অনুধাবন করিবার শক্তি জন্মিলে, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকে প্রথম যৌবনের এই নিরঙ্কুশ অনধীনতা ও যুক্তিবাদের প্রভাব হইতে অল্পবিস্তর মুক্ত করিয়া দিতে থাকে। প্রথম যৌবনে আমরা নিজেদের বিচারবুদ্ধিকে সত্যাসত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্মের একমাত্র মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। তখন বুঝি নাই যে এ পথে যাইলে বস্তুতঃ সত্যে ও মতে কোন পার্থক্য থাকে না, আর ধর্ম্মের ও সত্যের কোন সনাতন সার্ব্বভৌমিক প্রতিষ্ঠাও মিলে না। আমার বিচার-বুদ্ধি যদি সত্যাসত্যের একমাত্র কষ্টিপাথর হয়, তবে তোমার বিচার-বুদ্ধিই বা তাহা হইবে না কেন, ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদ এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারে না। এ পথে য়ুরোপে ক্রমে একটা মানসিক অরাজকতা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই কারণে সেখানে সমাজবন্ধন ও রাষ্ট্রবন্ধন উভয়ই শিথিল হইয়া আধুনিক সভ্যতা ও সাধনার মূল ভিত্তিকে পর্য্যন্ত বিধ্বস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে। অশ্বিনীকুমার বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভ করেন। আর তদবধি তাঁর ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবন উভয়ই এক অভিনব পথ ধরিয়া ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

এই সদ্‌গুরু তত্ত্বটী যে কি ইহা এখনও আমাদের নব্য শিক্ষিত সমাজ ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। গতানুগতিক পন্থা অবলম্বনে যাঁরা গুরুকরণ করিয়া এদেশে ধর্ম্মসাধন করেন, তাঁরাও কেবল নিষ্ঠাগুণে কোন কোন স্থলে সাধনপথে বিশেষ অগ্রসর হইলেও, প্রকৃত গুরুতত্ত্ব যে কি ইহা বুঝেন বলিয়া মনে হয় না। গুরুকরণ ও গুরুশক্তিকে তাঁরা একটা অতিলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ব্যাপার বলিয়া মনে করেন, আর গুরুনির্ব্বাচনেও প্রায় কোন প্রকারের বিচার বিবেচনা করেন না। অধিকাংশ লোকে কুল-গুরুকেই সদ্‌গুরু বলিয়া মনে করেন, অপর কেহ কেহ বা কুল-গুরু ত্যাগ করিয়া কোন সাধুপুরুষের নিকটে দীক্ষা লইয়া,

দীক্ষা-গুরুকেই সদ্‌গুরু বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কুল-গুরু বা দীক্ষা-গুরু এঁদের দু'এর কেহই সদ্‌গুরু নহেন। কুল-গুরুতে আর সদ্-গুরুতে যে প্রভেদ অনেক, একথা আজি কালি একটু আধটু ধর্ম্মচর্চ্চা যাঁরা করেন, তাঁরা সকলেই স্বল্পবিস্তর বুঝিয়া থাকেন। জন্মনিবন্ধন যে কেহ অপরের ধর্ম্মপথের সহায় ও নায়ক হইতে পারে না, এই মোটা কথাটা এদিনে আর কাহাকেও বুঝাইতে হয় না। শিক্ষিত লোকেরা এখন আর কুল-গুরু গ্রহণ করেন না; অধিকাংশ লোকে কোন গুরুই গ্রহণ করেন না; যাঁরা করেন তাঁরা কোন সাধুসন্তের নিকটে মন্ত্রদীক্ষা লইয়া ধর্ম্মসাধন করিবার চেষ্ট করেন। দীক্ষা-গুরু কুল-গুরু অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হইলেও কেবল ধর্ম্মসাধনেই তিনি শিষ্যের সহায় হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপ্রকট ও অব্যক্ত ভগবদ্বস্তুকে আত্মপ্রভাবে শিষ্যের অন্তরে প্রকট ও ব্যক্ত করিবার অধিকার তাঁরও নাই। দীক্ষাগুরু সাধক বা সিদ্ধপুরুষ হইতে পারেন; তিনি পথ দেখাইয়া দিতে পারেন, আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে শিষ্যের চিত্তকে অধিকার করিয়া, তাঁহার অন্তরে সাধনের ও ভক্তির প্রেরণা প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু সাধ্য-বস্তুকে প্রকাশ করিতে পারেন না। এটা কেবল সদ্‌গুরুরই কর্ম্ম। আর এই জন্য সদ্‌গুরুকে লোকে ও শাস্ত্রে ভগবানের বিগ্রহ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। কুলগুরু বা দীক্ষাগুরুর এই অধিকার নাই। এক অর্থে মানুষ মাত্রই মানুষের গুরু; আর কেবল মানুষই বা বলি কেন, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদির নিকটও মানুষ কত শিক্ষালাভ করে বলিয়া তাহারাও গুরুপদবাচ্য। আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—জড় জীব সকলেই এক অর্থে ভগবানের প্রকাশও বটে; সকলেই সেই অব্যক্তকে নিয়ত ব্যক্ত করিতেছে। সকলেই তাঁর অবতার। কিন্তু এইরূপ ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে সদ্‌গুরুকে ভগবানের বিগ্রহ বলা যায় না। ঈশ্বর নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ।

তিনি আমাদের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে রহিয়াছেন। তিনি পরমাত্মা, তিনি সর্ব্বাত্মা, তিনি বিশ্বাত্মা। কিন্তু জীব তাঁহাকে দেখে কই? সকল জ্ঞানকে যিনি উদ্‌বুদ্ধ করিতেছেন, জ্ঞান তাঁহাকে ধরিতে পারে না। পারে না এইজন্য যে তিনি জ্ঞানের মূলেই আছেন, জ্ঞানের বিষয়রূপে, জ্ঞেয়রূপে সকলের প্রত্যক্ষ হন না। ভগবান সদ্‌গুরুরূপেই জীবের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। যিনি অন্তর্যামী, তিনিই সদ্‌গুরু। ভাগবত ভগবানকেই আচার্য্য বলিয়াছেন—আচার্য্যকে মনুষ্যজ্ঞানে কখনও অসূয়া করিবে না। আর দ্বিবিধরূপ ধারণ করিয়া শ্রীভগবান জীবের সর্ব্বপ্রকারের অমঙ্গল নিরস্ত করিয়া, তাহার সদ্গতি করিয়া থাকেন। ইহার এক অন্তর্যামী রূপ, আর এক মোহান্ত বা সদ্‌গুরু রূপ। কেবল অন্তরবৃত্তি বা আত্ম-প্রত্যয় বা সহজজ্ঞান বা ইন্‌টুইষণের দ্বারা আমরা কোন জ্ঞানলাভ বা রসাস্বাদন করি না। অন্তরে যার ছাঁচ আত্মপ্রত্যয়রূপে রহিয়াছে, তার অনুরূপ বস্তু যতক্ষণ না বাহিরে প্রকাশিত হয়, ততক্ষণ সেই অন্তরের আত্মপ্রত্যয় জাগিয়া উঠে না। ভিতরের ঐ ছাঁচে বাহিরের বস্তু পড়িলেই আমাদের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। অন্তরের ঐ আত্মপ্রত্যয়কে ইংরেজিতে subjective intuition বলে—কেবল intuitionও বলিয়া থাকে। আর বাহিরের বস্তুকে object বলে। ইন্‌টুইষণ বা আত্মপ্রত্যয়কে forms of knowledge, আর বাহিরের বিষয়কে contents of knowledge বলে। এই ছাঁচের বা forms এর সঙ্গে এই contents বা বস্তুর মিলন হইয়া সর্ব্বপ্রকারের জ্ঞান ফুটিয়া উঠে। আমাদের সদ্‌গুরু তত্ত্ব এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত। ভিতরে ঈশ্বরের জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়রূপে আছে, ইহা সত্য। কিন্তু এ জ্ঞান আমাদের গোচর নহে। যখন বাহিরে ঈশ্বরের ধর্ম্মসম্পন্ন কোনও বস্তুর সাক্ষাৎ-কার লাভ করি, তখনই কেবল আমাদের ভিতরকার ঐ ঈশ্বরজ্ঞান জাগিয়া উঠে। বাহিরে সংসারে পিতাকে দেখিয়া ভগবানের পিতৃত্ব,

এখানে মাতাকে দেখিয়া তাঁহার মাতৃত্ব, এখানকার সখাসখীদের সখ্য আস্বাদন করিয়া তাঁহার সখ্য, এখানকার মাধুর্য্য সম্ভোগ করিয়া তাঁহার মাধুর্য্যের জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। এ সকল জ্ঞান ভিতরের বস্তু বটে, কিন্তু বাহিরের সংস্পর্শ লাভ না করিলে এই ভিতরের জ্ঞান জাগে না। এইজন্য "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে", একদিকে যেমন এই কথা অতি সত্য, সেইরূপ অন্যদিকে, যাহা দেখি না ব্রহ্মাণ্ডে তাহা জাগে না ভাণ্ডে, এই কথাও ঠিক ততটা সত্য। ভাণ্ড সত্যের আধখানা, ব্রহ্মাণ্ড তার অপরার্দ্ধ। এই দুই'এতে সত্য পূর্ণ ও প্রকট হয়। এখন প্রশ্ন এই—ভগবানকে আমরা জানিতে পারি, না জানিতে পারি না। কেবল অন্তর্যামিরূপে তাঁহাকে জানিলে, তাঁর আধখানা মাত্র জানা হয়। ফলতঃ বাহিরে তাঁর যে সকল প্রকাশ হয় ও হইতেছে, সেগুলিকে ছাড়িয়া তাঁর অন্তর্যামী রূপে কোন সত্য ও অর্থ প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্তরে আমাদের যে সদসদজ্ঞান বা ধর্ম্মবুদ্ধিকে তিনি জাগাইয়া দেন, তার সঙ্গে বাহিরের বিষয়-রাজ্যের ও সমাজ-জীবনের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অঙ্গাঙ্গী। আমাদের ধর্ম্মাধর্ম্ম আমরা যে সমাজে বাস করি, বা যে সকল বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে বিবিধ সম্বন্ধে আবদ্ধ হই, তারই আশ্রয়ে ফুটিয়া থাকে। বাহিরে যার প্রকাশ হয় না, ভিতরে তার জ্ঞান জাগে না, জাগিতে পারে না। ভগবানকে বাহিরে দেখিলে তবে ভিতরে তাঁর সত্য জ্ঞানলাভ করা সম্ভব হয়। এইজন্য ভগবানের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ যে সকল মহাপুরুষের মধ্যে হয়, তাঁহারাই জগতে সকল ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ আশ্রয় হইয়া রহেন। ইহাই অবতারের মূল অর্থ ও মুখ্য প্রয়োজন। ইহাই সদ্গুরুতত্ত্বেরও প্রতিষ্ঠা। যাঁহার মধ্যে শিষ্যের অন্তরের আত্মপ্রত্যয়-নিহিত ভগবদ্ভাব ও ভগবদাদর্শ প্রকট হইয়া, তাহার ভক্তি ও আনুগত্যকে একান্তভাবে টানিয়া লয়, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সদগুরুপদবাচ্য। তাঁহাকে দেখিয়াই শিষ্য ও সাধক, আপনার সাধ্য বস্তুর প্রত্যক্ষ লাভ

করেন। অবতারেরা যুগে যুগে প্রকাশিত হন, সদ্‌গুরুতে ভগবান নিত্য অবতীর্ণ। এই সদ্‌গুরুতত্ত্বেতেই স্বাধীনতা ও আনুগত্যের, স্বানুভূতি ও শাস্ত্রের, মত ও সত্যের, আত্মপ্রত্যয় ও বিষয়-প্রত্যক্ষের, সকল সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হইয়া থাকে। এখানেই সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় হয়। অশ্বিনী-কুমার প্রথম যৌবনের ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদের অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিয়া সদ্‌গুরুচরণাশ্রয় পাইয়াই ক্রমে স্বাধীনতার সঙ্গে আনুগত্যের সমন্বয় পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন।

অশ্বিনীকুমার এই উদার ও গভীর গুরুতত্ত্ব বুঝিয়া, পরে গুরুকরণ করিয়াছিলেন, ইহা মনে হয় না। দীক্ষা গ্রহণের পূর্ব্বে অতি অল্পলোকেই এই তত্ত্বের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন। বিশেষতঃ আমরা আজি কালি যেরূপ শিক্ষাদীক্ষা পাইয়া থাকি, তাহাতে এই গভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা কিছুতে সহজ নহে। এই তত্ত্ব গুরুগ্রহণের পরে, গুরুকৃপাতেই কেবল ক্রমে ক্রমে শিষ্যের প্রাণে ফুটিয়া উঠে। একালে অধিকাংশ শিক্ষিত লোকেই সাধু মহাপুরুষ বিশেষের উন্নত ও উদার চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁদের শরণাপন্ন হন। অশ্বিনীকুমারও, বোধ হয়, এই ভাবেই তাঁর গুরুদেবের চরণে যাইয়া প্রথমে উপস্থিত হন। একদিকে তাঁর সহজ ধর্ম্মপিপাসা মামুলি ব্রাহ্মধর্ম্মের রূপকোপাসনা ও মানস-কল্পিত সাধনভজনে মিটাইতে পারে নাই; অন্যদিকে মামুলি ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তের যুক্তিবাদ সত্যের সম্যক্ প্রামাণ্যও প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। ইহাতে জ্ঞান ও ভাব, দু'এর কিছুই পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। আর এই দ্বিবিধ অভাব পরিপূরণের আশাতেই, বোধ হয়, অশ্বিনীরকুমার গুরুগ্রহণ করেন। প্রথম যৌবনে, ইংরেজি শিক্ষার ও য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের বা র‍্যাশনিলিজমের (Rationalism) প্রভাবে যারা ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয়ে আসিয়া, পরে গুরুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁদের প্রায় সকলের ভিতরকার কথা ইহা। অশ্বিনীকুমারের অন্তর্জীবনের কাহিনী যে অন্যরূপ এরূপ

অনুমানের কোনও হেতু আছে বলিয়া বোধ হয় না। আর এই পথে আসিয়া গুরুগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া, অশ্বিনীকুমার একেবারে যে আমাদের দেশের প্রাচীন গুরুতত্ত্বটা পূর্ণমাত্রায় বুঝিয়াছিলেন, এমন কল্পনা করা কঠিন।

সদ্‌গুরুতত্ত্ব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, গুরুর চরণে একান্ত আত্মসমর্পণ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। যিনি অন্তর্যামী তিনিই সদ্‌গুরু। অন্তরে যাঁর প্রেরণা জাগে, বাহিরে তিনিই আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া, সেই প্রেরণার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করেন, এই কথাই আমাদের দেশের পুরাতন গুরুতত্ত্বের মূল কথা। এই কথাটা বুঝিলে, আত্মপ্রত্যয়ের হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া, আর শ্রীগুরুর হাতে আপনাকে ছাড়িয়া দেওয়া দুই এক হইয়া দাঁড়ায়। ভিতরে যিনি ধর্ম্মাবহ, অন্তরে আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধির ভিতর দিয়া যিনি সর্ব্বদা আমাদিগকে ভালমন্দের উপদেশ দান করেন, তিনিই যখন বাহিরে, চাক্ষুষ মোহান্ত গুরুরূপে প্রকাশিত হন, তখন এই গুরুর আদেশ আর ইংরেজিতে যাহাকে কনস্থান্স (Conscience) এবং আমাদের আধুনিক বাঙ্গলা ভাষায় যাহাকে বিবেক বলে, এই উভয়ই এক হইয়া যায়। সুতরাং বিবেক-বাণী আর গুরুবাক্য সমান মর্য্যাদা ও প্রামাণ্য প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত গুরুতত্ত্ব এই কথাই বলে। তবে ভিতরের Conscience বা বিবেকবাণী আর বাহিরের গুরুবাক্যের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে, কোন্‌টা বলবত্তর হইবে, একথা ওঠে বটে। সদ্‌গুরুতত্ত্ব বলে, এরূপ বিরোধ অসম্ভব। ফলতঃ সদ্‌গুরু কে আর সদ্‌গুরু কে নহেন, এখানেই তার প্রকৃত পরীক্ষাও হইয়া থাকে। সদ্‌গুরু স্বয়ং অন্তর্যামী। তিনি শিষ্যের অন্তর জানেন; কেবল ইহাই নহে, তার অন্তরে যে সকল প্রেরণা জাগে তারও প্রেরয়িতা তিনি আপনি। শিষ্যের অন্তরে তিনিই জিজ্ঞাসার উদয় করান, আবার বাহিরে মোহান্তরূপে বা

আচার্য্যরূপে তিনিই শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিয়া, সে জিজ্ঞাসার নিবৃত্তিও আপনিই করিয়া থাকেন। কোন্ পথে, কি ভাবে, শিষ্যের জীবন ফুটিয়া উঠিয়া, ক্রমে সে চরম সাধ্য লাভ করিবে, ইহা তিনি জানেন। জানিয়া সেই পথে অন্তরের প্রেরণা ও বাহিরের উপদেশাদির দ্বারা তিনি তাহাকে অলক্ষিতে লইয়া যান। এই প্রকৃত গুরুপন্থা ত্রিগুণাতীত। এপথে সংসারের লৌকিক ভালমন্দের বাহ্য বিচার-বিধানের প্রয়োগ চলে না। লৌকিক বিচারে যাহা নিতান্ত মন্দ, তার ভিতর দিয়াও নিয়তই ত মানুষের জীবনে অদ্ভুত ভাল ফুটিয়া উঠে। গুরুতত্ত্ব যাঁরা মানেন না, তাঁরাও ত এই কথাটা অস্বীকার করেন না। মানুষ মন্দ করে, পাপ করে, অশেষবিধ অহিতাচারে নিযুক্ত হয়, অথচ ভগবান সেই মন্দের, সেই অহিতের, সেই পাপের ভিতর দিয়াই, অপূর্ব্ব কৌশলে, অযাচিত করুণাগুণে, তাহাকে কল্যাণের ও পুণ্যের পথে লইয়া গিয়া দাঁড় করান, একথা সকলেই কহেন। হয় বলিতে হয় যে এ সকল স্থলে ভগবানের বিশেষ বিধান সার্ব্বজনীন কার্য্যকারণ সম্বন্ধকে বাতিল করিয়া পাপীর মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া দেয়, না হয়, ঐ মন্দের মধ্যেই এই ভালর, ঐ পাপের ভিতরেই এই পুণ্যের বীজ লুকাইয়া ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হয়। পাপ পাপই প্রসব করে; পুণ্য হইতে পুণ্যই উৎপন্ন হয়;—যুক্তি ও নীতি এই কথাই বলে। আর ইহাই যদি এ ক্ষেত্রে শেষ কথা হয়, তাহা হইলে খৃষ্টিয়ানী অনন্ত নরকবাস, কিম্বা বৌদ্ধ কর্ম্মবাদ ভিন্ন আর কোনও কিছুর প্রতিষ্ঠা হয় না। আর নরকবাদ এবং কর্ম্মবাদ, উভয়ই ভাগবতী করুণাকে সঙ্কুচিত ও অসমর্থ করিয়া রাখে। যাঁরা ভগবানের করুণায় বিশ্বাস করেন, তাঁরা মন্দের ভিতর দিয়া ভাল, অকল্যাণের ভিতর দিয়া কল্যাণ, পাপের ভিতর দিয়া পুণ্যের প্রকাশ হয়, এই কথা সর্ব্বদা মানিয়া লন। আর এই সত্যকে প্রামাণ্য সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে

গেলেই, আমাদের ভালমন্দ সকল প্রেরণাই অন্তর্যামী পুরুষ হইতে আসে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ফলতঃ পারমার্থিক দৃষ্টিতে ভাল-মন্দের ভেদাভেদ থাকিতে পারে না। সে দৃষ্টি সমদৃষ্টি। সে ভাব দ্বন্দ্বাতীত। আর সুখদুঃখ যেমন দ্বন্দ্ব, ভালমন্দ, পাপপুণ্য এগুলিও সেইরূপ দ্বন্দ্ব। সম্যক্ দৃষ্টির নিকটে সুখ আর দুঃখ দুই' একই বস্তুর দুইদিক মাত্র, সেইরূপ ভাল এবং মন্দও এই বস্তুর দুই দিক ভিন্ন আর কিছু নহে। আজি যাহা মন্দ, কাল তাহা ভাল হয়। আজ যাহা ভাল কাল তাহা মন্দ হইয়া পড়ে। দেশ, কাল, পাত্রের বিভিন্নতার দ্বারা এ সকল ভালমন্দের বৈষম্য ও বিচার হইয়া থাকে। ফলতঃ যাহাকে conscience বা ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেকবাণী বলি, তাহাও ত সর্ব্বদা এক কথা কহে না। এই ধর্ম্মবুদ্ধিরও বিকাশ হয়। এই ধর্ম্মবুদ্ধিও আজ এক কথা, কাল এক কথা বলে। সুতরাং গুরু আজ যাহাকে যে উপদেশ দান করেন, কাল যদি তাহাকে অন্যতর উপদেশ দেন, অথবা একজনকে যাহা আদেশ করেন, অন্যকে যদি তার বিপরীত আদেশ করেন, তাহাতে তাঁর উপদেশের মর্য্যাদা বা প্রামাণ্য নষ্ট হয় না ও হইতে পারে না। তবে প্রকৃত সদ্‌গুরুর উপদেশের সঙ্গে শিষ্যের অন্তরগত প্রেরণার কখনও কোনও গুরুতর বিরোধ হয় না ও হইতে পারে না। হয়না এই জন্য যে তিনি ঐ অন্তর দেখিয়াই উপদেশ করেন। যে উপদেশ শিষ্য গ্রহণ করিতে পারিবে না, এমন উপদেশ করিয়া সদ্‌গুরু কদাপি শিষ্যকে বিব্রত ও অপরাধী করেন না। বরং তিনি তার অন্তরে অন্তর্যামিরূপে যে ভাব বা যে আকাঙ্ক্ষা বা যে জিজ্ঞাসা জাগাইয়া দেন, বাহিরে মোহান্তরূপে সেই ভাবের, আকাঙ্ক্ষার বা জিজ্ঞাসার উপযোগী উপদেশ দিয়া তাহাকে ধর্ম্মপথে লইয়া চলেন। কিন্তু আমরা মানুষের মধ্যে যে ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। এইজন্য আমরা সদ্‌গুরু দেহধারী মানুষ বলিয়া, তিনিই যে আবার

অন্তর্যামীও, একথা কিছুতে ধারণা করিতে পারি না। আর এই অক্ষমতা-নিবন্ধনই সদ্গুরুর আশ্রয় পাইয়াও আমরা একান্তভাবে গুরুচরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না। অশ্বিনীকুমারও এটি পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁর গুরু যে কেবল বাহিরের উপদেষ্টা নন, কিংবা তাঁর গুরুকৃপা যে একটা অলৌকিক উপায়ে ভগবানের শক্তি ও দয়াকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাঁর কল্যাণ সাধন করে না, অপিচ ভগবানই যে ঐ গুরুদেহকে আশ্রয় করিয়া, "চৈত্যবপুষা"—অন্তর্যামিরূপে ও মোহান্তরূপে ভিতর বাহিরে দুইদিকে তাঁহার জীবনকে চালাইয়া লইয়া যাইতেছেন, এ সকল কথা তিনি ভাল করিয়া ধরিয়াছেন কি না সন্দেহ। আমাদের কাহারই এ পর্য্যন্ত এ ভাগ্য হয় নাই। আর হয় নাই বলিয়া আমরা সংসার তরঙ্গে পড়িয়া দিবানিশি এমন হাবুডুবু খাইয়া থাকি।

অশ্বিনীকুমার এ পর্য্যন্ত খৃষ্টীয় নীতিবাদকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি খৃষ্টীয়ান্ সাধকের চক্ষেই তাঁর গুরুকে দেখেন, প্রকৃত হিন্দু সাধকের চক্ষে দেখিতে শিখেন নাই। আধুনিক খৃষ্টীয়ানেরা যিশুখৃষ্টকে গুরুরূপে বরণ করেন। এই গুরু-খৃষ্টবাদ আর আমাদের সদ্গুরুতত্ত্ব মূলে একই সিদ্ধান্তের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইলেও দু'এতে প্রভেদ বিস্তর। কোনও হিন্দু আপনার গুরুকে জীবনের আদর্শরূপে বরণ করেন না। খৃষ্টীয়ান সাধকেরা যিশুকে তাঁদের জীবনের আদর্শ বলিয়া নিঃসংকোচে গ্রহণ করিয়া থাকেন। যিশুর অনুকরণ করা আধুনিক খৃষ্টীয়ান সাধকের মুখ্য চেষ্টা। যিশুচরিত্র লাভ এই সাধনার চরম সাধ্য। কিন্তু হিন্দু সাধক কোনও দিন ভগবানকে বা আপনার গুরুকে অনুকরণ করেন না। ভগবানকে তাঁরা ভক্তি করেন, গুরুর উপদেশ তাঁরা পালন করেন, কিন্তু ভগবানকে বা গুরুকে আপনাদের জীবনের আদর্শরূপে কোনও দিন কল্পনা করেন না। তাঁরা অধিকারীভেদ মানেন। জীবের অধিকার এক আর ভগবানের অধিকার

অন্য। শিষ্যের অধিকার এক আর গুরুর অধিকার অন্য। ভগবান বিশ্বে কতভাবে লীলা করিতেছেন। তিনি সৃষ্টি করেন, রক্ষা করেন, বিনাশ করেন, সকলই করেন। তিনি মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে নির্ম্মমভাবে নষ্ট করেন। তাঁর শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই পাপী পাপ করে; আবার পুণ্যাত্মারা সেই শক্তির প্রেরণাতেই পুণ্যকর্ম্ম করেন: এ সকলই তাঁর দ্বারা হইতেছে। জীবের পক্ষে ভগবচ্চরিত্র লাভ কেবল অসাধ্য যে তাহা নয়, ভগবানের অনুকরণের ইচ্ছামাত্র মহাপাপ। সদ্‌গুরু সম্বন্ধেও ঐ কথা। সদ্‌গুরু ভাগবতী তনু লাভ করিয়া ভগবল্লীলা রসে নিমগ্ন হইয়া, কত প্রকারের আপাত বিসদৃশ কথা বলেন ও কর্ম্ম করেন। ভিন্ন ভিন্ন শিষ্যকে তাঁরা বিভিন্ন উপদেশ দেন। একজনকে যাহা বিহিত ও ভাল বলিয়া আচরণ করিতে বলেন, অন্যজনকে তাহা মন্দ ও অবিহিত বলিয়া বর্জ্জন করিতে উপদেশ দেন। এ অবস্থায় শিষ্যের পক্ষে আপনার অধিকারকে উল্লঙ্ঘন না করিয়া গুরুর অনুসরণ করা অসম্ভব। এরূপ প্রয়াসেও গুরুতর অপরাধ হইয়া থাকে। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা এ সকল নিগূঢ় কথা ভাল করিয়া ধরিতে পারে না। আমাদের নীতিবাদ সকল মানুষকে ভগবচ্চরিত্র লাভ করিতে উপদেশ দেয়। কিন্তু গুরুর অনুকরণ করা নহে, অনুগত হওয়াই শিষ্যের প্রধান ধর্ম্ম। হিন্দু শিষ্য সেজন্য কেবল এই বলিয়া প্রার্থনা করেন—

> জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ
> জানাম্যধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
> ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
> যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।

কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া যে সকল যুক্তি ও সিদ্ধান্তের সাহায্যে আমরা একালে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিমার্জ্জিত করিয়া থাকি, তাহার দ্বারা

হিন্দুর এই সদ্‌গুরু-তত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম ও রহস্য ভেদ করা সহজ নহে।

খৃষ্টীয়ান সাধনাতেও এই তত্ত্ব যে একেবারে ফুটিয়া উঠে নাই, তাহা নহে। বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর য়ুরোপীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান কিয়ৎপরিমাণে এই তত্ত্বের উপরেই খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। আধুনিক বিজ্ঞান যখন অতিলৌকিক শাস্ত্রের প্রাচীন প্রামাণ্য নষ্ট করিয়া ধর্ম্মতত্ত্বকে মানুষের সহজবুদ্ধি বা আত্মপ্রত্যয় বা ইনটুইষণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিল, তখন খৃষ্টীয়ান দার্শনিকেরা এই আত্ম-প্রত্যয়বাদের অপূর্ণতা দেখাইয়া, এই আত্মপ্রত্যয়কে পূর্ণ করিবার জন্যই যিশুখৃষ্টকে ভগবানের বহিঃপ্রকাশ রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। বাহিরে সত্যের প্রকাশ না হইলে ভিতরে তার যে সহজ জ্ঞান রহিয়াছে তাহা ফোটে না ও জাগে না, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। কার্য্যকারণ সম্বন্ধের একটা সহজ জ্ঞান বা আত্মপ্রত্যয় আমাদের প্রকৃতির ভিতরে, প্রত্যেকের অন্তরে নিহিত রহিয়াছে ইহা যেমন সত্য, যতক্ষণ বাহিরে বিষয় রাজ্যে কোনও বিশেষ কারণ হইতে একটা বিশেষ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে না দেখা যায়, ততক্ষণ এই আত্মপ্রত্যয় যে জাগে না, ইহাও তেমনি সত্য। অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধে কেবল একটা আত্মপ্রত্যয় আছে, ইহা মানিলেই ঈশ্বরসত্তার প্রতিষ্ঠা হয় না। এই আত্মপ্রত্যয়কে জাগাইবার জন্য তাহার উপযোগী বহির্বিষয়ের প্রকাশও অত্যাবশ্যক হয়। কেবল মনোগত অস্তিক্যবুদ্ধিতে ভগবৎপ্রতিষ্ঠা হয় না। ভগবানকে বাহিরেও দেখিতে হয়। এই জন্যই তাঁর অবতারের প্রয়োজন। অবতার ব্যতীত সত্য ও প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। যিশুখৃষ্ট মানুষের ঐশ্বরিক আত্মপ্রত্যয়ের বহির্বিষয় রূপে প্রকট হইয়া, ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

এই ভাবেই বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর উদার ও উন্নত য়ুরোপীয় ধর্ম্মবিজ্ঞান আত্মপ্রত্যয়বাদের সঙ্গে অবতারবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া, ধর্ম্মের

অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্যকে সংশোধন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছে। আর এখানে এই আধুনিক খৃষ্টতত্ত্ব আমাদের পুরাতন সদ্‌গুরু-তত্ত্বের সঙ্গে অনেকটা মিলিয়া গিয়াছে। আধুনিক উন্নত খৃষ্টীয় সিদ্ধান্তে যিশুখৃষ্টই সদ্‌গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কিন্তু আমরা যে খৃষ্টীয়ান সিদ্ধান্তের কথা সচরাচর এদেশে শুনিতে পাই, তাহাতে এ সকল গভীর কথার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। মামুলি খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মে এ তত্ত্ব এখনও ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে নাই। প্রচলিত য়ুরোপীয় দর্শনাদিতেও এই সত্যটা এখন পর্য্যন্ত পরিস্ফুট হয় নাই। সুতরাং আমরা ইংরেজি শিখিয়া ইহার কোন পরিচয় পাই না। আমাদের আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা এখনও খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদকে অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে।

খৃষ্টীয় সমাজেও এখন অনেক লোকে যিশুখৃষ্টকে কেবল একজন আদর্শ পুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিছুদিন হইতে এই ভাবটা য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রধান হইয়া উঠিয়াছে। খৃষ্টেতে ঐকান্তিক আত্মসমর্পণ অপেক্ষা আপনার সাধনবলে খৃষ্ট-চরিত্রের অনুশীলন ও অনুকরণ করিয়া ঐ উদার ও বিশুদ্ধ চরিত্রলাভ এখন খৃষ্টীয় সাধনের সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টীয়ান সাধু ও সাধকেরা আপনাদের কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে এখন—"যিশু এই অবস্থায় কি করিতেন ?"—এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়া থাকেন, আর তিনি যাহা করিতেন, যেরূপ চলিতেন, তাহা করিতে ও সেইরূপ চলিতে চেষ্টা করেন। অশ্বিনীকুমারও আমার মনে হয়, কতকটা এরূপভাবে আপনার গুরুদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আপনার ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। তাঁর বিস্তৃত কর্ম্মজীবনে যখনই যে সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে, তখনই—এ অবস্থায় তাঁর গুরুদেব কি করিতেন, তিনি এই প্রশ্ন তুলিয়া, তার যথাসাধ্য মীমাংসা করিয়া আপনার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ

করিতে গিয়াছেন। আর এই জন্য সময় সময় লোকে তাঁর কর্ম্মজীবনে কতকটা দুর্ব্বলতা, এমন কি অব্যবস্থিততা এবং অসামঞ্জস্যের পরিচয় পাইয়াছে বলিয়া ভাবিয়াছে।

হিন্দুর নিকটে ইহা গুণের কথা না হইয়া, অত্যন্ত দোষের কথাই হয়। হিন্দুর সাধনার একটা অতি মামুলি কথা আছে যে দেবতাদের উপদেশেরই অনুসরণ করিবে, কদাপি তাঁহাদের কর্ম্মের অনুকরণ করিবে না। আমাদের বিদেশী ভাবাপন্ন বিচার-বুদ্ধি প্রায়ই এ কথাটাকে উপহাসাস্পদ বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে; কখনও কখনও ইহাকে অতিশয় হীন বাক্য বলিয়াও ঘৃণা করিয়া থাকে। ইংরেজি প্রবাদ বাক্যে বলে উপদেশ অপেক্ষা আচরণ শ্রেষ্ঠ। এই হিসাবে দেবতাদের আচরণ যদি ধর্ম্মবিগর্হিত হয়, তবে তাহাদের আদেশের বা উপদেশের কোনও মূল্য ও সত্য থাকে না। কিন্তু য়ুরোপীয় সাধনা আমাদের অধিকারীভেদ মানে না। অথচ এই অধিকারীভেদই হিন্দুর সাধনার মুখ্য কথা। আমাদের সকল সাধনভজন, কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, বিধিনিষেধাদি এই অধিকারীভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এইজন্য দেবতার অধিকারে যা সাজে ও যাহা ধর্ম্ম, মানুষের তাহা সাজে না, মানুষের পক্ষে তাহা অধর্ম্ম। ঈশ্বরকে মানুষের আদর্শ করিলে, সমাজ-ধর্ম্ম ও লোকধর্ম্ম সকলই উলটপালট হইয়া যায়। হিন্দু একেশ্বরবাদী; অদ্বৈততত্ত্বের উপরে হিন্দুর সকল সিদ্ধান্তের ও সাধনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বৈষ্ণব, বৈদান্তিক, শাক্ত, শৈব, সকল সিদ্ধান্তই কোন না কোন আকারে এই অদ্বৈততত্ত্বকে মানিয়াছেন। আর মূলতত্ত্ব এক বলিয়া, বিশ্বের বহুধা প্রকাশের বা অভিব্যক্তির মধ্যে আপাতত বিরোধ ও বৈষম্য যাই থাকুক না কেন, মূলে একটা সমন্বয় এবং সামঞ্জস্য আছেই আছে। একান্ত ভাল বা একান্ত মন্দ, একান্ত পাপ বা একান্ত পুণ্য বলিয়া কোন কিছু জগতে

নাই। এক ক্ষেত্রে যাহা ভাল অন্য ক্ষেত্রে তাহা মন্দ। এক অবস্থায় ও এক অধিকারে যাহা পাপ, অন্য অধিকারে তাহা পাপ নহে। এ সকল কথা হিন্দু সাধনার গোড়ার কথা। সুতরাং মানুষের চক্ষে ও মানুষের পক্ষে যাহা পাপ, দেবতার পক্ষে তাহা দোষাবহ হয় না। জগতের সকল কর্ম্মের মূল কর্ত্তা যখন ঈশ্বর, তখন সকল কর্ম্মাকর্ম্মই তাঁহার কৃত। তিনি আদি কারণ, তিনি অনাদি কারণ। তিনি সর্ব্ব কারণ। কর্ম্মাকর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকলেরই মূল ও কর্ত্তা তিনি। এ অবস্থায় তিনি জীবের আদর্শ হইতে পারেন কি? মানুষ ভগবানের অনুকরণ করিতে গেলে, তার ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই লোপ পায়। এইজন্য হিন্দু এমন কথা কখনও বলে না। হিন্দু ভগবানকেও যেমন আপনার জীবনের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে না, তার গুরুকেও সেইরূপ আদর্শ রূপে ভাবে না। গুরুর উপদেশই মান্য, তাঁর কর্ম্ম অনুকরণীয় নহে। শিষ্যকে তার আপন অধিকার মতন তিনি চালাইয়া লইয়া যান, আর নিজে আপনার অধিকার মতন চলিয়া থাকেন। ভাগবতী তনু লাভ না করিলে কেহ সদ্‌গুরু হইতে পারেন না। আর যাঁরা ভাগবতী তনু লাভ করিয়া সংসারে ভগবানের লীলা-বিগ্রহ রূপে বিচরণ করিয়া জীবকে ভগবানের দিকে লইয়া যান, স্বয়ং ভগবানের চরিত্র যেমন প্রাকৃতজনের অনুকরণীয় নহে, তাঁহাদের চরিত্রও সেইরূপ লোকের অনুকরণীয় হয় না। খৃষ্টীয় দশ-আজ্ঞার মাপকাঠির দ্বারা এ সকল লোকোত্তর মহাপুরুষের চরিত্রের কালি কষা যায় না। লৌকিক নীতির বন্ধনে তাঁরা আবদ্ধ নহেন, তাঁরা নিজেরাই এ সকল নীতির প্রতিষ্ঠা করেন। গুরুচরণে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁরা ভিতরে যে প্রেরণা প্রেরণ করেন ও বাহিরে যে সকল ব্যবস্থা ও ঘটনার যোগাযোগ সাধন করেন, তাহার অনুগমন করাই শিষ্যের একমাত্র কর্ত্তব্য। কিন্তু ইংরেজি শিখিয়া আমাদের পক্ষে এরূপ বশ্যতা স্বীকার করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

তারই জন্য আমরা গুরুর চরিত্র অনুকরণ করিতে যাইয়া পদে পদে ভয়াবহ পরধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকি।

আমাদের সকলেরই এই দশা। হিন্দুয়ানী ও খৃষ্টিয়ানীর একটা অদ্ভুত মিশ্রণে আমাদের চরিত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। অশ্বিনীকুমারের মধ্যে এই দুইটী ভাবই পাশাপাশি দেখিতে পাওয়া যায়। আর এই কারণে সময় সময় তাঁর আচার-আচরণে দুর্ব্বলতা ও অসামঞ্জস্য ফুটিয়া উঠে।

অশ্বিনীকুমারের মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি নাই। কোন একটা সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সিদ্ধান্ত গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। সেই জন্য এ পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার চরিত্রে এই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের একটা যথাযথ সঙ্গতি ও সমন্বয় সাধন করিতে পারেন নাই। পাশ্চাত্যের দৃষ্টি দিয়া তিনি এ পর্য্যন্ত প্রাচ্যকে দেখেন নাই বা প্রাচ্যের দৃষ্টি দিয়া পাশ্চাত্যকে বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই। ফলে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবের বিশিষ্ট প্রভাব তাঁহার চরিত্রে পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যা-মন্দিরে, যুবকবৃন্দের শিক্ষাগুরু রূপে, প্রচারক রূপে, শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের স্বত্বাধিকারের রক্ষিরূপে তাঁহার চরিত্রে আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব দেখিতে পাই। অপরপক্ষে, বিশেষতঃ অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে ভগবানের নাম সংকীর্ত্তনে, ভাগবত আবৃত্তিতে এবং ভক্তিযোগ বা কর্ম্মযোগের সাধনে—তাঁর চরিত্রে প্রাচ্য ভাব বেশী ফুটিয়া উঠে।

আর এই হিন্দুভাব লইয়া আজ অশ্বিনীকুমার অনন্যলভ্য লোক-নায়কের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র একজন লোক-শিক্ষক এবং আধুনিক জন-নায়ক হইলে তাঁহার প্রতিপত্তি ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত। সে হিসাবেও তাঁর ভক্ত সংখ্যা কম নহে। আমার বোধ হয় যশোহর হইতে সুদূর শ্রীহট্ট পর্য্যন্ত পূর্ববঙ্গের নব্যশিক্ষিত যুবকসমাজে তাঁহার অনন্যপ্রতিদ্বন্দ্বী

প্রভাব প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে দলে দলে ছাত্র আসিয়া তাঁহার বরিশালস্থ কলেজে তাহাদের জীবনের উৎকৃষ্ট অংশটুকু অতিবাহিত করিয়া গিয়াছে। তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার চরিত্রের এবং শিক্ষার প্রভাব কেহই অতিক্রম করিতে পারে নাই। তত্রাচ, এ কথা কিছুতে অস্বীকার কথা যায় না যে, অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর চিত্তের উপরে তিনি যে ভক্তির আসন লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহাকে এতটা বড় করিয়া তুলিয়াছে। তাঁর হিন্দুত্বেই অশ্বিনীকুমারের লোকনায়কত্বের মূল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে শাক্ত অপেক্ষা বৈষ্ণব প্রভাবই বলবত্তর। আধুনিক সাধনায় মানুষকে অতি বড় করিয়া তুলিয়াছে। মানুষের মনুষ্যত্বের উপরেই আজিকার দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত। নর-সেবাই দেব-সেবা। আর ইহার সঙ্গে আমাদের বৈষ্ণব সাধনার অতি সুন্দর মিল রহিয়াছে। নরের মধ্যে নারায়ণকে দেখাই বৈষ্ণব সাধনার মূল সাধ্য--"অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ মানুষীং তনুমাশ্রিতং" ইহাই বৈষ্ণবতত্ত্বের মূলসূত্র। অন্য কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় এমন স্পষ্ট ও নির্ভীকভাবে মানবের ঈশ্বরত্বের কথা প্রচার করে নাই। মানবের দেহ এবং চিত্তবৃত্তিকে এতটা প্রাধান্য দেওয়া, পিতা-পুত্র, নায়ক-নায়িকা, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির সম্বন্ধকে ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া, বৈষ্ণবতত্ত্ব এবং বৈষ্ণব সাধনার বিশেষত্ব। মানবের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি এবং তাহার চিত্তবৃত্তির বিনাশ বা নিরোধ নহে, কিন্তু এ সকলকে একটা চরম আধ্যাত্মিক আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত করাই বৈষ্ণবধর্ম্মের মূলমন্ত্র। এই ভাব অশ্বিনীকুমারের সামাজিক আচার ব্যবহারে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ অশ্বিনীকুমার হিন্দু সমাজের সমস্ত বিধিনিষেধের পরিপোষক, কিন্তু কর্ত্তব্যের প্রেরণায় তিনি সকল সংস্কারের গণ্ডী কাটাইয়া উঠেন। জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি কখনও বক্তৃতা দেন নাই,

কিন্তু সামাজিক কর্তব্য এবং মানবের কল্যাণের জন্য অনেক স্থলেই তিনি জাতিভেদ প্রথার গ্রন্থি শিথিল করিয়াছেন। বহুবৎসরের নিঃস্বার্থ সামাজিক সেবাই জনসাধারণের হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার জন্য এক অক্ষয় স্বর্ণ-সিংহাসনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহাদের কাছে তিনি একজন প্রসিদ্ধ বাগ্মী, ম্যাজিষ্ট্রেটের সহচর বা কমিশনরের বিশ্বস্ত বন্ধু নহেন; তাহারা তাঁহাকে তাহাদেরই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, দুর্দ্দিনের সহায়, এবং দুঃখে কষ্টে একান্ত প্রিয়জন বলিয়াই জানে। অগাধ অর্থ দিয়া নহে, বাগ্মিতার মোহিনী শক্তি বলে নহে, জ্ঞানগরিমার প্রভাবেও নহে, কিন্তু জনসাধারণের সহিত চিন্তায়, ভাবে ও কার্য্যে সম্পূর্ণ এক হইয়া যাওয়াই যথার্থ জননায়কের বিশেষত্ব। আমরা এদেশে অধুনা একমাত্র অশ্বিনীকুমার দত্তেই এই লোকনেতৃত্বের কতকটা আভাস পাই। তত্রাচ, এ ভাব এ দেশে নূতন নহে, ইহা বহু পুরাতন। দেশ-কাল-পাত্রোচিতভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে—এই মাত্র।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

আমাদের বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ কতটা পরিমাণে যে আমরা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি, দেশের লোকে যেন সে কথা ক্রমে ভুলিয়া যাইতেছে। নতুবা এত লোকের স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য কত চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের নামে একটা বাৎসরিক স্মৃতি-সভার আয়োজন পর্য্যন্ত হয় না কেন?

উপাধ্যায় সন্ন্যাসী ছিলেন। কিন্তু আমাদের বড় বড় সন্ন্যাসীদের যেমন শিষ্যসেবক থাকে, উপাধ্যায় মহাশয়ের সেরূপ শিষ্য-সেবক কেহ ছিল না। সে আকাঙ্ক্ষাও উপাধ্যায় মহাশয়ের ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁর সন্ন্যাস অন্য ধরণের ছিল। গীতা যাহাকে সর্ব্বকর্ম্মন্যাস বলিয়াছেন, উপাধ্যায় মহাশয়ের সন্ন্যাস সে জাতীয় ছিল। আপনার বলিতে সংসারে তিনি কিছুই রাখেন নাই। আজন্ম ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিয়া, তিনি এমন একটা অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁর অহং-জ্ঞানটা ব্যক্তিগত জীবনের সংকীর্ণতর সম্বন্ধ সকলকে একান্তভাবে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বে ছাইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের আধুনিক কর্ম্মনায়কগণের মধ্যে উপাধ্যায় মহাশয়ের মতন আর কেহ এতটা পরিমাণে সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানি না।

সন্ন্যাসের অন্তরালে অনেক সময় একটা বুজুরগী লুকাইয়া থাকে। উপাধ্যায় মহাশয়ের অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল। কিন্তু তাঁর প্রাণটা অতি বড় হইলেও, কোনও মতেই তাঁহাকে প্রচলিত অর্থে "বুজুরগ্" বলা যাইত না। অতিলৌকিক কোনও কিছুর দাবী তিনি কখনও করেন নাই। এমন কি আপনি সংসার করেন নাই বলিয়া

সংসারী লোকের প্রতি তাঁহাকে কখনও কটাক্ষপাত করিতেও দেখি নাই।

সন্ন্যাসের সঙ্গে সচরাচর সমাজ-জীবনের একটা বিরোধ জাগিয়া উঠে। সন্ন্যাস লইয়া লোকে প্রায়ই সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যায়। উপাধ্যায় মহাশয় সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারত্যাগী হন নাই। ফলতঃ তাঁর মধ্যে চিরদিনই এমন একটা প্রবল ও সজীব সমাজানুগত্যের ভাব দেখিয়াছি, যার সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগের হিন্দুয়ানীর সন্ন্যাসের আদর্শের কোন প্রকারের আন্তরিক সঙ্গতিসাধন সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় নাই। আমাদের সন্ন্যাসীরাও কোনও কোনও বিষয়ে একান্তভাবে লৌকিকাচারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলেন, সত্য। কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের সমাজানুগত্যের সঙ্গে ইঁহাদের সমাজানুগত্যের একটা জাতিগত প্রভেদ ছিল বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রাচীন মতের সন্ন্যাসীগণ লোকসংগ্রহার্থে, কর্ম্মাসক্ত জনগণের বুদ্ধিভেদ যাহাতে না জন্মায়, তার জন্য লৌকিকাচারের অনুবর্ত্তিতা করিয়া চলেন। উপাধ্যায় মহাশয়ের সমাজানুগত্যের অন্তরালে কোন লোকসংগ্রহেচ্ছা কখন দেখিতে পাই নাই। তাঁর অকৈতব স্বদেশভক্তির উপরে এই অদ্ভুত সমাজানুগত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আর ইহাই উপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাদেশিকতার বিশেষত্ব ছিল। উপাধ্যায় মহাশয় তাঁর নিজের দেশকে ও সমাজকে যে চক্ষে দেখিতেন, আমরা আজি পর্য্যন্ত সে চক্ষু লাভ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমাদের স্বদেশপ্রেম অতি হাল্‌কা বস্তু। আমরা এ পর্য্যন্ত গোটা দেশটাকে ভালবাসিতে শিখি নাই। আমরা দেশটাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দেখি। কিয়দংশ বা তার ভাল, আর কিয়দংশ বা তার মন্দ, এরূপ ভাবে স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার ভাল-মন্দের মধ্যে আমরা একটা ভাগ-বাটোয়ারা করিয়া, যেটুকু আমাদের চক্ষে বা বিচারে ভাল

লাগে, তাহাকেই ভালবাসি; আর যেটুকু লাগে না, তাহাকে ঘৃণা করিয়া, তাহা হইতে নিজেদের যথাসাধ্য দূরে রাখিতে চেষ্টা করি।

কিন্তু প্রকৃত প্রেমের ধর্ম্ম এ নহে। ভাল-ও-মন্দ-জড়িত যে প্রেমের পাত্র প্রেমিকের চিত্তকে আকর্ষণ করে, প্রেমিক তাহাকে গোটাভাবেই দেখে এবং গোটাভাবেই তাহাকে প্রীতি করে। যার এ প্রেম নাই, সে ভালমন্দ-মিশ্রিত বস্তু বা ব্যক্তির ভালকে ভাল করিয়া বোঝে না; মন্দকেও ভাল করিয়া ধরে না। প্রেমকে লোকে অন্ধ বলে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রেমের মতন এমন চক্ষুষ্মান আর কিছু নাই। প্রেম অপরের চাইতে কম দেখে না বেশী দেখে। আর বেশী দেখে বলিয়া প্রেমপাত্রের মন্দের মধ্যেও যে ভালটুকু লুকাইয়া আছে, সে তাহাকেও দেখে, শুধু মন্দটুকুকে দেখিয়া তাহা হইতে ফিরিয়া আসে না।

উপাধ্যায় মহাশয় ভারতবর্ষকে এবং ভারতবর্ষের পুরাগত সভ্যতা ও সাধনাকে এইরূপ প্রেমের চক্ষে দেখিতেন বলিয়া তাঁর নিকটে স্বদেশ-বস্তু যেরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আমাদের মধ্যে অতি অল্পলোকের নিকটেই সেরূপ করিয়াছে। অনেক সময় এ বিষয়ে উপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমার গুরুতর মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। তিনি যে চক্ষে স্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে দেখিতেন, আমি সে চক্ষে ঠিক দেখিতাম না। অথচ উপাধ্যায় মহাশয় যে নিরতিশয় রক্ষণশীল ছিলেন, বা যেটী যেমন আছে, সেটী ঠিক তেমনি থাকুক, ইহা যে চাহিতেন, এমন কথাও বলিতে পারি না। তিনি সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। যে সমাজ যুগে যুগে বিবর্ত্তিত হয় না তাহা মৃত, জড়; তার ভূতগৌরব যাহাই থাকুক না কেন, ভবিষ্যৎ আশা যে কিছু নাই, আমরা যেমন ইহা বুঝি, উপাধ্যায় মহাশয়ও ঠিক সেইরূপ বুঝিতেন। তাঁহাকে প্রকৃত অর্থে কিছুতে "রি-অ্যাকষণারী" (Re-actionary) বলা সঙ্গত

হইত না। অথচ, অন্যপক্ষে তিনি যে প্রচলিত অর্থে সংস্কারক বা Reformer ছিলেন, তাহাও নহে।

কারণ তিনি স্বদেশকে যে ভাবে, যতটা ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন, কোনও সংস্কারকের পক্ষে তাহা আদৌ সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। সংস্কারকের অন্তঃপ্রকৃতিটা যে কি, তাহা নিজের জীবনে, আর যৌবন-কালের চারিপাশের বন্ধুবান্ধবদিগের জীবনে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। সংস্কারক সমাজের দোষভাগের প্রতি যতটা সজাগ থাকেন, তার গুণভাগের প্রতি ততটা থাকিতেই পারেন না; থাকিলে তাঁর সংস্কার-বাসনার বেগটা কমিয়া যায়। আর যে প্রতিনিয়ত কেবল কোনও ব্যক্তির বা সমাজের হীনতারই আলোচনা করে, এবং এইরূপ আলোচনা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া ভাবিয়া থাকে তার পক্ষে সে ব্যক্তির বা সে সমাজের প্রতি সত্য ভালবাসা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে না। ভালবাসা সুন্দরের সাক্ষাৎকারেই জন্ম, সুন্দরকেই চায়, সুন্দরের সন্ধানেই ফিরে। কুৎসিতের ধ্যানে বা দর্শনে বা চিন্তনে ভালবাসা জন্মিতে পারে না, বাড়িয়া ওঠা বা বাঁচিয়া থাকা তো বহু দূরের কথা। অথচ সমাজ-সংস্কারক প্রায়ই মক্ষিকাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া সমাজ-দেহের ক্ষতস্থান গুলির চারিদিকেই সর্ব্বদা ভন ভন করিয়া বেড়ান; এরূপ না করিলে তাঁর ব্যবসায় টিকিয়া থাকিতে পারে না। এই কারণে এই জাতীয় সমাজ-সংস্কারক অনেক সময়ই আত্ম-সম্ভাবিত ও মদান্বিত হইয়া উঠেন। আর এ অবস্থায় ইহাদের পক্ষে স্বদেশকে বা স্বদেশের সমাজকে সত্যভাবে বা গভীররূপে ভালবাসা যে অসম্ভব হইয়া উঠে, ইহা আর বিচিত্র কি? উপাধ্যায় প্রথম যৌবনে কিয়ৎপরিমাণে এ জাতীয় সমাজ-সংস্কারক যে ছিলেন না, এমন বলা কঠিন। কিন্তু ক্রমে তিনি সে ভাবটাকে ছাড়াইয়া উঠেন। বাংলা দেশে তিনি যে

অভিনব দেশভক্তি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁর পরিণত বয়সের দীর্ঘ সাধনলব্ধ বস্তু; যৌবনের পরকীয়া প্রীতির মোহের মরীচিকা মাত্র নহে। তাঁরই জন্য এ বস্তু এতটা সাচ্চা ও সজীব হইয়াছিল।

উপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশের ভালটুকুকে, স্বদেশী সমাজের শ্রেয়টুকুকে, স্বাদেশিক রীতিনীতির শোভনতাটুকুকে ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁর উদার কোমল প্রাণ মজিয়া গিয়াছিল। তাই তিনি অমন করিয়া স্বদেশকে ও স্বদেশী সমাজকে, স্বদেশী সভ্যতা ও স্বদেশী সাধনাকে এতটা পরিমাণে প্রেম দিতে পারিয়াছিলেন। তাঁর চক্ষে আমাদের ভাল, আমাদের মন্দকে ছাপাইয়া উঠিত। আমাদের সৌন্দর্য্য, আমাদের কদর্য্যতাকে ঢাকিয়া ফেলিত। আমাদের অব্যক্ত শক্তি প্রকাশ্য দুর্ব্বলতার মায়িকতা মাত্র প্রমাণ করিত। তিনি আমাদের সিদ্ধিকে উপেক্ষা করিয়া সাধ্যের ধ্যান করিতেন। আমরা কি করিতেছি বা করিয়াছি তার বিচার না করিয়া আমরা কি করিতে পারি তারই সন্ধান করিতেন। আর এই জন্যই আমাদের ত্রুটি দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কিছুতে তাঁর প্রেমকে ব্যাহত করিতে পারিত না। এ বিষয়ে তিনি ভারতে সন্ত সমাজ সুলভ প্রখর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন।

আমাদের সাধুসন্তেরা মানুষ কি আছে তাহা তত দেখেন না, সে সত্য বস্তুটী যে কি ইহা জানেন বলিয়া, তাহার বর্ত্তমান দুর্গতি বা পাপকলুষ দর্শনে বিন্দু পরিমাণে বিচলিত হন না। এ দু'দিনের কর্ম্মভোগ দু'দিনে ফুরাইয়া যাইবে। পথের ধূলামাটী চিরদিন গায়ে লাগিয়া থাকিবে না। একদিন না একদিন এগুলি আপনা হইতে ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এ বিশ্বাস তাঁহাদের আছে বলিয়া কাহারও প্রতি তাঁহাদের প্রেমের আস্থার বা শ্রদ্ধার কোন অল্পতা হয় না। উপাধ্যায় মহাশয় সেইরূপ এই ভারতবর্ষ আজি কি

ভাবে পড়িয়া আছে, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিতেন না। ভারতবর্ষ সত্য বস্তুটী কি, ইহাই জানিয়াছিলেন ও ধরিয়াছিলেন বলিয়া তার বর্ত্তমান দুর্গতিতে বা হীনতায় বিন্দু পরিমাণে তাঁর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত না। এ মোহ যে দু'দিনের, এ মায়া যে ক্ষণস্থায়ী, এ দুর্দ্দশা যে শারদ প্রভাতের মেঘাড়ম্বরের ন্যায় আপনা হইতে দ্রুত কাটিয়া যাইবে;—এ বিশ্বাস উপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যে যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কাহারও মধ্যে দেখি নাই। আর উপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যে যে রক্ষণশীলতা দেখা যাইত, তাহা এই অটল বিশ্বাসের ফল। স্বদেশের সভ্যতার ও সাধনার, স্বদেশের সমাজ-প্রকৃতির ও লোক-প্রকৃতির উপরে উপাধ্যায় মহাশয়ের যেরূপ আস্থা ছিল, এমন আস্থা আমাদের মধ্যে আর কাহারও ছিল বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

আর এই খানেই আমাদের বর্ত্তমান স্বাদেশিকতার আদর্শ পূর্ব্বযুগের স্বাদেশিকতার আদর্শ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়ে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের ইংরেজিশিক্ষিত সমাজে যে প্যাট্রিয়টিজম্ জাগিয়া উঠিয়াছিল, তার মধ্যে স্বদেশের সভ্যতা ও সাধনার প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধা ও স্বদেশের শক্তিসাধ্যের উপরে এই অবিচলিত আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় নাই। এ বস্তু আমাদের সে'কালের সমাজ-সংস্কারকদিগের মধ্যেও ছিল না. রাষ্ট্রসংস্কারক দলেও পাওয়া যাইত না। আর এই জন্য প্রথম যুগের সমাজসংস্কার-প্রয়াস ও রাষ্ট্রীয়-কর্ম্মচেষ্টা, উভয়ই একান্ত বহির্ম্মুখীন ও বিদেশাভিমুখীন ছিল। সুতরাং সে সময়ে আমরা আমাদের সমাজ-জীবন, ধর্ম্মসাধন, কর্ম্মচেষ্টা, রাষ্ট্রীয়-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ,—স্বাদেশিকতার সকল উপকরণগুলিকে বিদেশীয় সভ্যতা ও সাধনার দাঁড়িপাল্লায় তুলিয়া তৌল করিতে যাইতাম।

আর পরের মাপে যে ব্যক্তি সর্ব্বদা এরূপভাবে আপনাকে ওজন করিতে যাইবে, তার আত্মজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি কদাপি সম্ভবে না। এই

কারণে আমাদের প্রথম যুগের সমাজসংস্কার ও রাষ্ট্রসংস্কার সকল প্রকারের স্বাদেশিক কর্ম্মচেষ্টাই আমাদিগের মধ্যে একটা গুরুতর আত্মবিস্মৃতি জন্মাইয়া দেয়। এবং এই সাংঘাতিক আত্মবিস্মৃতি হইতে একটা পরমুখাপেক্ষিতার অভ্যাস জন্মিয়া গিয়া, আমাদের সর্ব্ববিধ শক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা ও আস্ফালনকে আমাদের আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা-বৃদ্ধির একটা প্রবল ও নূতন কারণ করিয়া তুলে।

প্রচলিত সমাজসংস্কার-চেষ্টা এবং রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের এই বিষময় ফল প্রত্যক্ষ করিয়া, উপাধ্যায় মহাশয় এই উভয়বিধ কর্ম্ম-চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন। প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সর্ব্ব-বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া, দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে আত্মস্থ ও পরিপুষ্ট হইবার পথে অন্তরায় স্থাপন করিতেছিল। আবেদন-নিবেদনেই দেশের নবজাগ্রত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা আপনাকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছিল, জনশক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া এই সকল রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচেষ্টা সে শক্তিকে সংহত ও কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতে পারিতেছিল না। বরং প্রজা-সাধারণের নিজের হাতে আত্মচেষ্টাতে কোন স্বাদেশিক কর্ম্মসাধনের ইচ্ছা ও প্রয়াসকে নষ্ট করিয়া ফেলিতেছিল। এই জন্য উপাধ্যায় মহাশয় রাষ্ট্রীয় জীবনে আত্মনির্ভর ও আত্মচেষ্টার আদর্শটীকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। নিজের কোটে থাকিয়া, গবর্ণমেণ্টের দিকে একান্তভাবে মুখ ফিরাইয়া, শান্ত ও সমাহিত ভাবে আমরা জনশক্তির সংহতিতে সর্ব্ববিধ স্বাদেশিক কার্য্য সাধন করিব,— উপাধ্যায় মহাশয় সর্ব্বদা এই কথা বলিতেন। গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে বিরোধ বাধান প্রথমাবধি যে তাঁর রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচেষ্টার লক্ষ্য ছিল, এমন কথা বলা যায় না। ক্রমে ঘটনাচক্রে এরূপ একটা বিরোধের সূত্রপাত হয় সত্য; কিন্তু এই বিরোধকে উপাধ্যায় মহাশয় নিজে ইচ্ছা করিয়া জাগাইয়াছিলেন, এমন কথাও বলা যায় না। ফলতঃ

দেশের তদানীন্তন অবস্থাধীনে গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া স্বাদেশিক কর্ম্ম করা নীতিসম্মত না হইলেও, চিরদিনই যে জনমণ্ডলীর পক্ষে এরূপ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করা আবশ্যক বা বাঞ্ছনীয় বা সম্ভব, উপাধ্যায় এমনটা কখনও ভাবিতেন বলিয়া বোধ হয় না। সে সময়ে দেশ ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছিল বলিয়া তাহাকে একটা রাজসিক প্রেরণা প্রদান করা আবশ্যক হয়। এই জন্যই উপাধ্যায় জীবনের শেষ দশায় এই স্বাতন্ত্র্য নীতি অবলম্বন করেন। কিন্তু রাজসিকতা ভারতের সভ্যতা ও সাধনার চিরন্তন বা উচ্চতম লক্ষ্য যে নয়, উপাধ্যায় ইহা যেমন জানিতেন, এমন আর কেহ জানিতেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে যে সাত্ত্বিকতা চিরদিন আমাদের সভ্যতা ও সাধনার চরম লক্ষ্য হইয়া আছে, সেই সাত্ত্বিকতাকে জাগাইতে হইলে, সে অবস্থায় প্রথমে দেশব্যাপী তামসিকতাকে রাজসিকতার দ্বারা অভিভূত করা আবশ্যক, উপাধ্যায় এ সত্যটাকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন। রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রেই এই রাজসিকতাকে জাগাইয়া তোলা সহজ ও সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। তাহাতে ভবিষ্যতের সাত্ত্বিকতার পথ উন্মুক্ত হইবে, অথচ সমাজে কোন প্রকারের সাংঘাতিক অরাজকতা প্রতিষ্ঠার বিশেষ আশঙ্কা থাকে না। এই জন্য উপাধ্যায় রাষ্ট্রীয় জীবনে এই অভিনব স্বাতন্ত্র্যনীতি প্রচার করিয়াছিলেন। দেশের লোকের আত্মচৈতন্যকে জাগাইয়া তোলা, তাহাদিগের চক্ষুকে নিজেদের উপরে নিবদ্ধ করা, নিজের হাতে দেশের কাজ দশে মিলিয়া করিলে যে শিক্ষা, যে সংযম, যে শক্তি লাভ হয়, ইহাতে আপনাদের উপরে যে আস্থা জন্মে, ও এই আস্থার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে যে উৎসাহ, অন্তরে যে আশা, পেশিতে যে বল সঞ্চারিত হয়, এই সকল লাভের জন্যই উপাধ্যায় এই নীতি প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন, নতুবা গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে গায়ে পড়িয়া বিরোধ বাধানই যে তাঁর অভিপ্রায় ছিল, এমন কথা কিছুতে বলিতে পারি না।

চুইশ' নয়

উপাধ্যায়ের সমাজ-নীতি

কিন্তু উপাধ্যায় মহাশয়ের স্বাদেশিকতার সত্য আদর্শটীকে ধরিতে হইলে, বিশেষভাবে তাঁর সমাজ-নীতির আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ এখানেই তাঁর স্বাদেশিকতার নিজস্ব স্বরূপটী ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব মহাশয় স্বদেশেবস্তুকে কতটা যে ভালবাসিতেন, তাঁর ঐকান্তিক সমাজানুগত্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হিন্দু সাধনা পরিহার করিয়া, সাধনান্তর গ্রহণ করিয়াও তিনি এই সমাজানুগত্য বর্জ্জন করেন নাই। বরং এই বিদেশীয় ধর্ম্মসাধনকেই আপনার জীবনে সম্পূর্ণরূপে নিজের দেশের সমাজ-বিধানের সঙ্গে মিলাইয়া লইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ উপাধ্যায় মহাশয়ের এই সমাজানুগত্যের অন্তরালে একটা অর্থহীন ও অযৌক্তিক রক্ষণশীলতাই দেখিতেন। প্রথম বয়সে উপাধ্যায় না কি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। এই জন্য তাঁর পরিণত বয়সের এই সমাজানুগত্যকে কেহ কেহ, বিশেষতঃ তাঁর পূর্ব্বকার ধর্ম্মবন্ধুগণ, পুরাতন কুসংস্কারের দিকে পুনরাবর্ত্তন বা রি-অ্যাক্‌ষণ (re-action) বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু উপাধ্যায়কে এ জাতীয় রক্ষণশীল বা এই শ্রেণীর পুনরাবর্ত্তনকারী বা রি-অ্যাকষণারী (re actionary) বলা যাইতে পারে কি না সন্দেহ।

উপাধ্যায়ের মধ্যে একটা প্রকৃত শ্রদ্ধার ভাব ছিল, এ কথাটা সকলে জানেন না ও বোঝেন না। "সন্ধ্যা"-পত্রিকার সম্পাদক বলিয়াই বাঙ্গালী সমাজে উপাধ্যায় বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। আর "সন্ধ্যাতে" প্রায়ই সমাজের, বিশেষ নব্যশিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ের, কোন কোন শ্রেষ্ঠজন সম্বন্ধে এরূপ কঠোর, তীব্র কখনও বা গভীর

বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত যে এগুলি পড়িয়া অপরিচিত লোকে কোন প্রকারে সম্পাদককে এক জন শ্রদ্ধাশীল লোক বলিয়া কল্পনা করিতে পারিত না। কিন্তু উপাধ্যায়কে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন, তাঁহারা তাঁহার কথাবার্ত্তায় কখনও প্রকৃত শ্রদ্ধাশীলতার অভাব দেখিয়াছেন কি না সন্দেহ। পল্লীর স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, পল্লীবাসীর কাহাকেও না কাহাকেও তার আবর্জ্জনারাশি পরিষ্কার করা অত্যাবশ্যক হয়। এ অত্যাবশ্যকীয় কর্ম্ম যে করিতে যাইবে, তার হাতে ও গায়ে কিছু না কিছু ময়লাও লাগিবেই লাগিবে। কিন্তু দশের হিতের জন্য এ কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া সে ব্যক্তি যে স্বভাবতঃ আবর্জ্জনা ভালবাসে, এমন কথা যেমন বলা সঙ্গত হয় না, সেইরূপ সময়বিশেষে সমাজের নৈতিক বা রাষ্ট্রীয় আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা প্রয়োজন হইলে, সমাজের শ্রেষ্ঠজনকেও সর্ব্বসমক্ষে অপদস্থ করা আবশ্যক হইতে পারে। আর সে অবস্থায়, সে অপ্রীতিকর কর্ম্ম যদি কেহ করে, তাহাতে তাহাকে স্বল্পবিস্তর হীনতাও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাই বলিয়া সেই নির্ব্বিকার-চিত্ত দেশসেবককে হীনচরিত্রের লোক বলিয়া মনে করা কখনই সঙ্গত হয় না। উপাধ্যায় সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। "সন্ধ্যা" পত্রিকায় সমাজের কোন কোন শ্রেষ্ঠজনকে যখন তখন তীব্রভাবে আক্রমণ করা হইত বলিয়া সম্পাদকের প্রকৃতিতে যে একটা স্বাভাবিকী শ্রদ্ধাশীলতা ছিল না, সরাসরিভাবে এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

ফলতঃ উপাধ্যায় মহাশয় "সন্ধ্যা" পরিচালনা করিতে যাইয়া, আপনার অন্তরকে কতটা পরিমাণে যে নিপীড়িত করিতেন, বহুদিন কাছে থাকিয়া, এক সঙ্গে কাজকর্ম্ম করিয়া, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এ সকল আক্রমণ যে সর্ব্বদা তিনি নিজে লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহাও নহে। তবে অপর লেখকদিগের প্রবন্ধাদির উপরে তিনি প্রায়ই

হস্তক্ষেপ করিতেন না। আর সমাজের "মেকি" নেতৃত্ব ও স্বদেশ-সেবারর প্রভাব নষ্ট না হইলে, সত্য ও সজীব স্বাদেশিকতা কখন ফুটিয়া উঠিবে না, ইহা তিনি মনে করিতেন। এই জন্য আর কোনও কিছু বিচার না করিয়া উপাধ্যায় মহাশয় এ সকল লেখা পত্রস্থ করিয়া দিতেন। নতুবা, সত্য সত্যই যে লোকনিন্দায় তাঁর আনন্দ হইত, তাহা নয়। আর এ সকলে তাঁর প্রাণগত শ্রদ্ধাশীলতার অভাবও সূচিত হইত না।

প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা হইতে সর্ব্বত্রই এক প্রকারের রক্ষণশীলতা জন্মিয়া থাকে। এই জাতীয় রক্ষণশীলতা উপাধ্যায়ের মধ্যে বেশ ছিল! তার জন্য উপাধ্যায়ের হাত প্রাচীনের ও প্রতিষ্ঠিতের উপরে আঘাত করিতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইত। এই কারণে উপাধ্যায় মহাশয় প্রথম বয়সে আপনার কৌলিক ধর্ম্মে আস্থাহীন হইয়াও, একেবারে উৎকট ধর্ম্মসংস্কারক বা সমাজ-সংস্কারক হইয়া উঠেন নাই। ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ না দিয়া, কেশবচন্দ্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। কেশবচন্দ্রের নিজের চরিত্রে একটা রক্ষণশীলতা এবং তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে একটা শ্রদ্ধাশীলতা সর্ব্বদাই বিদ্যমান ছিল। এ বস্তু ব্রাহ্মসমাজের অপর শাখায় ততটা পাওয়া যায় নাই। উপাধ্যায়ের প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতা শাস্ত্রগুরু-বর্জিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মেতেও বেশি দিন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না। এই শ্রদ্ধাশীলতার প্রেরণাতেই, আমার মনে হয়, উপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া প্রথমে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও শেষে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টিয় সঙ্ঘের আশ্রয় লইয়াছিলেন। আর এইখানেই তাঁর প্রকৃতিগত শ্রদ্ধাশীলতার ও রক্ষণশীলতার প্রভাবে উপাধ্যায়ের শেষ বয়সের সমাজ-নীতির মূল ভিত্তিটী গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

সর্ব্বত্র ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শের সঙ্গে সমাজানুগত্যের একটা নিত্য বিরোধ জাগিয়া রহে। যেখানেই এই অনধীনতার ভাবটা

প্রবল হইয়া উঠে, সেইখানেই সমাজানুগত্যটা ধর্ম্মবিগর্হিত বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। প্রোটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টিয়ান্ সম্প্রদায়ে এই ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার ভাব খুবই প্রবল। এই জন্য ইহাদের মধ্যে সমাজানুগত্যও ক্রমশ কমিয়া গিয়াছে, এখন নাই বলিলেও চলে। অন্যদিকে রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টিয় সঙ্ঘে, শাস্ত্র ও গুরু উভয়ের প্রাধান্য-মর্য্যাদা সমভাবে ক্ষিত হইয়া, ধর্ম্মসাধনে ও সমাজ জীবনে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার ভাবকে অনেকটা সংযত করিয়া রাখিয়াছে। এই জন্য এখানে সমাজানুগত্য যে ধর্ম্মের একটা শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, এ ভাবটা এ পর্য্যন্ত একেবারে নষ্ট হইয়া যায় নাই। এই কারণেই রোমক-সঙ্ঘের আশ্রয় গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে উপাধ্যায়ের সমাজানুগত্যের ভাবটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

অতএব এই সমাজানুগত্যটা ভাল হউক মন্দ হউক ; যুক্তিসঙ্গত বা অযৌক্তিক আর যাহা কিছু হউক না কেন, ইহার অন্তরালে যে একটা বিরাট ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব বিদ্যমান ছিল, এ কথাটা অস্বীকার করা যায় না। একটা খেয়ালের চাপে উপাধ্যায় মহাশয় প্রাচীন সমাজ-শাসন পরিত্যাগ করেন নাই ; খেয়ালের চাপে তাহার পুনঃ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টাতেও প্রবৃত্ত হন নাই। এই জন্য তাঁহাকে পুনরাবর্ত্তনকারী বা রি-অ্যাকষণারী বলা যায় না।

ফলতঃ আমাদের সমাজের যাহা যেরূপ আছে, তাহা সেইরূপই থাকিবে বা থাকা বাঞ্ছনীয়, উপাধ্যায়কে কোনও দিন এমন কথা বলিতে শুনি নাই। "বন্দে মাতরম্" পত্র প্রতিষ্ঠার সময়ে এই সম্বন্ধে উপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়। নূতন কাগজ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করিবে, ইহাই আমাদের উভয়ের বিচার্য্য বিষয় ছিল। "বন্দে মাতরম্" সর্ব্ববিষয়ে উদার সংস্কারের সমর্থন করিবে, আমি এই কথা বলি। উপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে একটু আপত্তি করেন।

তাঁর মূল কথাটা আজিও আমার মনের মধ্যে জাগিয়া আছে। তিনি বলেন—"সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে আমি নই। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাধীনে সমাজ-সংস্কার বলিতে বিদেশীয় সভ্যতা-সাধনার প্রভাবে কতকগুলি বৈদেশিক আদর্শের স্বল্পবিস্তর অনুবর্ত্তন বুঝাইয়া থাকে। এই জাতীয় সমাজ-সংস্কারে আমাদের সমাজের বিশেষত্বটুকু ক্রমে লোপ পাইতেছে, আমরা ফিরিঙ্গীর একটা নকলের নকল হইয়া উঠিতেছি। এটা আমি চাই না। ইহাতে সমাজের স্বাদেশিকতা নষ্ট হইয়া, সমাজে ও লোক-চরিত্রে সাংঘাতিক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে। এই বিদেশীয় শক্তির প্রভাবকে প্রথমে আটকাইতে হইবে। স্বদেশের সমাজকে ও স্বদেশের জনগণকে সর্ব্বাদৌ আত্মস্থ করিতে হইবে। তারা আগে জাগুক। নিজেরা নিজেদের চিনিয়া লউক। তারপর, তারা নিজেরাই নিজেদের প্রকৃতি ও প্রয়োজনানুরূপ নিজেদের সমাজকে গড়িয়া পিটিয়া শুধরাইয়া লইবে।"

এই কথাগুলিতে উপাধ্যায়ের সমাজনীতির যেমন তেমনি তাঁর স্বাদেশিকতারও সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

বস্তুতঃ উপাধ্যায় মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন মানব-সমাজকে এক একটী স্বতন্ত্র বিশিষ্ট জীবের মতন মনে করিতেন বলিয়া বোধ হয়। Social organism বা সমাজ-জীব আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানের এই পরিচিত পরিভাষাটী তাঁর মুখে কখনও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর কথাবার্ত্তায় তিনি যে এই আধুনিক সমাজতত্ত্বটীকে দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছিলেন ইহা বুঝিয়াছিলাম। আর প্রত্যেক সমাজকে এইরূপ বিশিষ্ট জীবধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মনে করিতেন বলিয়া সকল সমাজের ভাল ও মন্দের মধ্যে যে একটা অতি নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ আছে, এ কথাও তিনি বলিতেন। এইজন্য বিলাতী সমাজের মন্দটাকে ছাড়িয়া শুদ্ধ ভালটীকে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে যেরূপ অসাধ্য, সেইরূপ

আমাদের নিজেদের সমাজের ভালটুকুকে নিখুঁতভাবে রক্ষা করিয়া, তার মন্দটুকুকে একান্তভাবে পরিহার করাও অসম্ভব। জীবদেহে যখন প্রাণশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখনই কেবল তাহার অন্তরস্থ রোগের বীজাণুসকল প্রবল হইয়া অশেষ উৎপাত ও অমঙ্গল ঘটাইতে আরম্ভ করে; প্রাণীর সুস্থ সবল অবস্থায়, তারা নির্জীব ও অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া পড়িয়া থাকে, এ যেমন সত্য; সমাজের ভালমন্দ সম্বন্ধেও ইহা সেইরূপই সত্য। সমাজ মধ্যে যখন প্রাণশক্তি সতেজ ও সবল থাকে তখন সমাজের রীতি-নীতি এবং শাসন-সংস্কারের ভালটুকুই প্রবল হইয়া রহে ও তাহার মন্দটুকু হতবল ও হীনতেজ হইয়া অপকার সাধনে অক্ষম হইয়া যায়। কিন্তু সমাজের প্রাণ-শক্তি হ্রাস হইতে আরম্ভ করিলে এ সকল অন্তর্নিহিত উৎপাত ও অমঙ্গলের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে থাকে। সুতরাং সমাজের প্রাণশক্তিকে জাগাইয়া তোলা, সেখানে বল সঞ্চার করা, এ সকলই সমাজ সংস্কার সাধনের প্রথম ও মুখ্য কর্ম্ম। এটী করিতে পারিলে, সমাজ একবার সজীব ও আত্মস্থ হইয়া উঠিলে, সামাজিক ব্যাধি সকলের বীজাণুগুলি আপনি মরিয়া যাইবে বা মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়া থাকিবে। উপাধ্যায় মহাশয় এই কারণে সর্ব্বাগ্রে ও সর্ব্ব প্রযত্নে স্বদেশী সমাজের প্রাণ মধ্যে এই শক্তি সঞ্চার করিবার জন্যই ব্যগ্র ছিলেন; বাহির হইতে উত্তেজক ঔসধ দিয়া, সমাজ-দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় উপদ্রবসকলকে প্রশমিত করিবার জন্য হাতুড়ে চিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। এ কথাটী না বুঝিলে, উপাধ্যায় মহাশয় কেন যে শেষ জীবনে সমাজ-সংস্কারের কথা তেমন বেশী বলিতেন না, ইহার প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা সহজ বা সম্ভব হইবে না।

উপাধ্যায়ের ভূয়োদর্শন এই ভাবটীকে বিশেষভাবে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে, করাচীতে যখন রোমক খৃষ্টিয়-

ধর্ম্মের অনুশীলন করিতেছিলেন, তখন, উপাধ্যায় মহাশয় যতটুকু পরিমাণে সমাজ-সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া ততটুকুও ছিলেন কি না, সন্দেহ। আমরা সমাজ-সংস্কার করিতে যাইয়া কোন্ পথে চলিতেছি, এই পথ ধরিয়া চলিলে পরিণামে কোন্ স্থানে যাইয়া পৌঁছাইতে হইবে,—বিলাতে যাইয়া ইংরেজ-সমাজের গতিবিধি ও রীতি-নীতি, মত ও আদর্শ এবং ভাবস্বভাব সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, উপাধ্যায় মহাশয় তাহা বেশ করিয়া ধরিতে পারিয়াছিলেন। আর ঐ পথ যে আমাদের পক্ষে ভয়াবহ পরধর্ম্মের পথ,—উপাধ্যায় ইহাও বিশ্বাস করিতেন। এই কারণেই বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি কতকটা পরিমাণে স্বদেশের সামাজিক জীবনের ও সামাজিক আচার-ব্যবহারের পক্ষপাতী হইয়া উঠেন। কামোপভোগপ্রবণ যৌবনকালে যাঁহারা বিলাত যান, তাঁহাদের কথা যাহাই হউক না কেন, বেশী বয়সে, বিশেষতঃ প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া, যাঁহারা বিলাতী সমাজের ভাবস্বভাব ও মতিগতি পরীক্ষা করিবার প্রত্যক্ষ অবসর প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের অনেকেই বোধ হয়, স্বদেশের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের সমধিক পক্ষপাতী হইয়া বিলাত হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। অন্ততঃ, উপাধ্যায় মহাশয় সম্বন্ধে এরূপই ঘটিয়াছিল। এই জন্যই উপাধ্যায় মহাশয় শেষ জীবনে সমাজ-সংস্কার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে এতটা শঙ্কিত হইতেন।

এরূপ শঙ্কা যে একান্ত অস্বাভাবিক বা নিতান্ত অযৌক্তিক, এমনই কি বলিতে পারা যায়? ইংরেজি শিখিয়া, য়ুরোপীয় ঝাঁঝের ব্যক্তিস্বাভিমানী অনধীনতার ও গণতন্ত্রতার আদর্শে মুগ্ধ হইয়া, আমরা এক সময়ে সমাজ-সংস্কার ব্যাপারটা যত সহজ মনে করিয়াছিলাম, বাস্তবিক যে তাহা তত সহজ নহে, এ জ্ঞান অনেকেরই অল্পে অল্পে জন্মিতেছে। বিশেষতঃ য়ুরোপীয় সমাজচিত্রের ধ্যানে এই জ্ঞান বাড়িয়া

উঠে বই হ্রাস হয় না। এক এক করিয়া আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারের মুখ্য প্রয়াসগুলির প্রতি ধীরভাবে তাকাইয়া দেখিলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। উপাধ্যায় এটী খুব ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন বলিয়া, এতটা সরাসরিভাবে সমাজ সংস্কারের চেষ্টায় আপনি প্রবৃত্ত হন নাই, অপরকেও এ কার্য্যে প্রোৎসাহিত করিতেন না।

প্রচলিত সংস্কার-প্রয়াসীগণ আমাদের জাতিভেদ-প্রথাটা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়াছেন। এ ব্যগ্রতা স্বাভাবিক। বর্ত্তমানে এই জাতিভেদ-প্রথা যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহতে সমাজের স্থবিরতা যে অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। আর পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগেও মহাজনেরা সময়ে সময়ে, এই বংশগত জাতিভেদ-প্রথার সংস্কার সাধন যে করেন নাই, তাহাও নহে। জাতিভেদের কঠোর শাসন সত্ত্বেও বহুকালাবধি হিন্দুসমাজে যে বীজ-মিশ্রণ ঘটিয়া আসিয়াছে, ইহা প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এইরূপ বীজ-মিশ্রণে কেবল বিবিধ বর্ণসংকরেরই উৎপত্তি হয় নাই, যাঁরা সমাজে সঙ্করবর্ণ বলিয়া পরিচিত নহেন, তাঁহাদের মধ্যেও যে একপ বীজমিশ্রণ ঘটিয়াছে, ইহারও প্রমাণ-প্রতিষ্ঠা অসাধ্য নহে। এতদ্ব্যতীত বৈষ্ণব ও শাক্ত উভয় মার্গের সাধক ও সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবেই এই জাতিভেদ প্রথাকে স্বল্পবিস্তর ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং বর্ত্তমানে যে এ প্রথার সংস্কার প্রয়োজন নয়, অথবা সংস্কার হইবে না, এমন কথা কে বলিবে? উপাধ্যায় মহাশয় কখনও এমন কথা বলেন নাই। তিনি জীবনের কোন বিভাগে এরূপ স্থবিরতা ও বদ্ধভাবের পক্ষপাতী ছিলেন না, এ কথা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারা যায়। কিন্তু তথাপি যে ভাবে আমাদের বর্ত্তমান সমাজ-সংস্কারকেরা জাতিভেদ প্রথাকে ভাঙ্গিতেছেন বা ভাঙ্গিতে চাহিতেছেন, উপাধ্যায় মহাশয় তাহার সমর্থন করেন নাই।

আর করেন নাই এই জন্য যে আমরা এই পথে আমাদের প্রাচীন জাতিভেদ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন করিয়া, বিদেশের আমদানী আর এক প্রকারের ঘৃণ্যতর ও সহস্রগুণে অধিক অমঙ্গলকর জাতি-ভেদের প্রতিষ্ঠা করিতে বসিয়াছি। বিদেশীয় সমাজে ইহাকে জাতিভেদ বলে না বটে। তাঁহারা ইহাকে শ্রেণী-ভেদ বলেন। কিন্তু যে নামেই নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন, বস্তু দুটী এক না হইলেও যে নিতান্ত স্ব-জাতীয় ইহা কি অস্বীকার করা যায়? আর এখানে প্রশ্ন এই যে সামাজিক স্থবিরতা-পোষক যে বংশগত জাতিভেদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, তাহার যতই দোষ থাকুক না কেন, ইহার বদলে আমরা সংস্কারের নামে সমাজের বিপ্লব-সাধক পদগত বা ধনগত যে বিলাতী শ্রেণীভেদকে, জ্ঞাতসারে হউক আর অজ্ঞাতসারে হউক, আমাদের সমাজে বরণ করিয়া লইতেছি, তাহার দোষ তদপেক্ষা বেশি কি না? এই বিষয়ে উপাধ্যায় মহাশয় এই প্রশ্নটাই তুলিতেন। আর এই প্রশ্নের সোজা উত্তর কেবল একটা—বিলাতী শ্রেণী-ভেদের দোষ আমাদের জাতি-ভেদের দোষ অপেক্ষা আকারে ভিন্ন হইলেও, ওজনে কম নহে। আমাদের জাতিভেদ মানুষের মনুষ্যত্ব-বস্তুকে হয় ত কোন কোন স্থলে চাপিয়া রাখে, বিলাতী শ্রেণীভেদ তাহাকে পিষিয়া মারে। সুতরাং যেরূপ করিয়াই হউক, এই পুরাগত জাতিভেদকে ভাঙ্গিয়া দিলেই যে আমাদের সমাজ উন্নতির পথে ও কল্যাণের পথে অগ্রসর হইবে, উপাধ্যায় এমনটা বিশ্বাস করিতেন না।

জাতিভেদের সংস্কার সম্বন্ধে যে কথা, অন্যান্য সমাজ সংস্কার সম্বন্ধেও সেই কথা। যেটাকে ভাঙ্গিয়া যাহা গড়িতে যাইতেছি, তাহা কি বেশি ভাল? যেমন প্রচলিত জাতিভেদ, সেইরূপ বর্ত্তমানে যে আকারে বাল্যবিবাহ প্রথা দেশে প্রবর্ত্তিত আছে, তাহাও সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের সহায় যে নয়,—এ কথা উপাধ্যায় মহাশয় জানিতেন এবং

মানিতেন। এ কু-প্রথা এক সময়ে আমাদের সমাজে ছিল না। কোন্ যুগে, কি কারণে, কোন্ বিশেষ অবস্থাধীনে ইহা প্রচলিত হয়, স্থির করা বহু বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম গবেষণা-সাপেক্ষ। কিন্তু যখন এবং যে কারণেই ইহা প্রথমে প্রবর্ত্তিত হউক না কেন, হিন্দুসমাজে যখন প্রাণশক্তি প্রবল ছিল, তখন সমাজ আপনা হইতেই ইহার আনুষঙ্গিক অমঙ্গল ফলগুলি, একান্তভাবে না হউক, অন্ততঃ বহুল পরিমাণে নিবারণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া লইয়াছিল। সমাজের সে প্রাণশক্তির হীনতা নিবন্ধন ক্রমে এসকলও ব্যর্থ বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আজ বাল্যবিবাহ প্রথা যতটা অনিষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, কিছুকাল পূর্ব্বেও তত অনিষ্টকর ছিল না; এ সকলই সত্য। সকলে না হউক, অতি নিষ্ঠাবান অথচ চিন্তাশীল হিন্দু যাঁহারা, তাঁহারা এ সকল স্বীকার করেন। কিন্তু এই প্রথাকে জোর করিয়া বন্ধ করিলে, আর তাহার বদলে বিলাতী ছাঁচের যৌবনবিবাহ ও যৌন-নির্ব্বাচন-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে, আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব, তাহাতে আমাদের সমাজের বেশি অমঙ্গল আশঙ্কা হইবে কি না, এ সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া, তাঁহারা সহসা এ সংস্কার-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন না।

এইরূপে আমাদের সমাজবিধানে যে সকল মন্দ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে জোর করিয়া উপড়াইয়া দিলে, তার ভাল যাহা আছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যাইবে কি না, এই ভয়ে উপাধ্যায় মহাশয় সমাজ-সংস্কার বিষয়ে এতটা শঙ্কিত হইয়া চলিতেন। নতুবা আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অনিষ্টকর প্রথা সম্বন্ধে তিনি যে অন্ধ ছিলেন, কিম্বা এ সকলেন পরিবর্ত্তন ও সংশোধন ইচ্ছা করিতেন না,—এমন কথা কিছুতে বলা যায় না।

অন্য প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলাম, উপাধ্যায় মহাশয়ের সমাজানুগত্য ও সমাজ-নীতি সম্বন্ধেও তাহাই বলিতে পারি। উপাধ্যায় মহাশয় স্বদেশী

সমাজকে, লোকে দেবতার মন্দিরকে যে চক্ষে দেখে, সেই চক্ষে দেখিতেন। ভক্ত লোকেও প্রয়োজন হইলে আপনার দেবতার মন্দির ভাঙ্গিয়া থাকেন, কিন্তু ভাঙ্গিবার জন্য তাহা ভাঙ্গেন না, অন্য দেবতার প্রতিষ্ঠার জন্যও তাহাকে নষ্ট করেন না। আপনার দেবতার সেবার সৌকর্য্যার্থে ভাঙ্গিয়া থাকেন এবং ভাঙ্গিবার সময়, শান্ত সমাহিত, শুদ্ধ-বুদ্ধ হইয়া ভক্তির সঙ্গেই ভাঙ্গেন। এরূপভাবে যদি কেহ হিন্দু-সমাজের সংস্কারে প্রবৃত্ত হন, উপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার সে চেষ্টাকে মাথায় করিয়া লইতেন, ইহা জানি। আর প্রচলিত সমাজ-সংস্কার চেষ্টার মধ্যে এই সংযম, এই শ্রদ্ধা ও এই ভক্তির প্রতিষ্ঠা দেখিতে পান নাই বলিয়াই তিনি ইহার সমর্থন করিতে পারেন নাই। তিনি স্বদেশ-বস্তুকে কেবল ভালবাসিতেন যে তাহা নয়, আন্তরিক ভক্তিও করিতেন। তাঁর সমাজানুগত্যের মধ্যে ও সমাজনীতির মূলে এই অপূর্ব্ব স্বদেশভক্তি সর্ব্বদা জাগিয়া থাকিয়া, তাঁহার চরিত্রের এই বিশিষ্টতাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

আধুনিক ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সাধনা ব্রাহ্মসমাজের নিকটে অশেষ-প্রকারে ঋণী। আমরা এ ঋণ অস্বীকার করিলেও, ইতিহাস কখনও তাহা ভুলিয়া থাকিবে না।

আমরা আজ যাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া জানি, দেশের লোকে তাহা এপর্য্যন্ত গ্রহণ করে নাই; কখনও যে করিবে, ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব। কিন্তু এই ধর্ম্মের হাওয়াটা দেশের সকল সম্প্রদায়ের উপরেই স্বল্পবিস্তর পড়িয়াছে এবং ইহার সাধারণ ভাবগুলি যে অনেকেই অজ্ঞাতসারে আত্মসাৎ করিয়াছেন ও করিতেছেন, এ কথা কি অস্বীকার করা সম্ভব? ব্রাহ্মসমাজ এ পর্য্যন্ত যে তত্ত্বসিদ্ধান্তের উপরে আপনার ধর্ম্মবিশ্বাসকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সে সিদ্ধান্ত দেশের ধর্ম্মচিন্তায় এখনও কোন স্থান পায় নাই; কখনও যে পাইবে, তারও কোনও সম্ভাবনা নাই। এ দেশে এবং অন্য দেশে এক সময়ে যাঁরা এই যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমে সে সিদ্ধান্তের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি দেখিয়া তাহাকে বর্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়া ব্রাহ্মসমাজ যে যুক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাহার প্রভাবে দেশের প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধন যে বহুল পরিমাণে যুক্তিপ্রতিষ্ঠ ও অর্থসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে, ইহাও সত্য। ব্রাহ্মসমাজ যে আদর্শে ও যে ভাবে আমাদের প্রাচীন সমাজের সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হন, দেশের লোকে সর্ব্বতোভাবে তাহা অঙ্গীকার করা দূরে থাকুক, বরং প্রত্যক্ষভাবে তাহাকে প্রত্যাখ্যানই করিয়াছেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সমাজ-সংস্কারচেষ্টার পরোক্ষ প্রভাবেই যে আজ ভারতের,

বিশেষতঃ বাঙ্গলা দেশের, হিন্দুসমাজ নানা দিকে উদার ও উন্নতিমুখী হইয়া উঠিতেছে, ইহা অস্বীকার করা যায় কি ?

আর ব্রাহ্মসমাজ আমাদের বর্ত্তমান সমাজ বিবর্ত্তনে একটা শূন্যতাকে পূর্ণ করিয়া, আপাততঃ এরূপ নিষ্ফলতা লাভ করিয়াও ফলতঃ দেশের ধর্ম্মকর্ম্মের উপরে একটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম যতই কেন বিদেশীয় ভাবাপন্ন হউক না, ইহা যে ভারতবর্ষের বিশাল হিন্দুসমাজের উপরে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই, কিন্তু তাহার বর্ত্তমান সামাজিক বিবর্ত্তনের ধারাটীকে আশ্রয় করিয়া ভিতর হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা মানিতেই হইবে।

সমাজ বিবর্ত্তনের ক্রম

এই সামাজিক বিবর্ত্তনের গতিটা সোজা নয়, কিন্তু বাঁকা। সে বাঁকাও একটু অদ্ভুত রকমের। ইংরেজিতে ইহাকে স্পাইর‍্যাল (spiral) বলে। আমাদের ভাষায় ইহার কোনও প্রতিশব্দ আছে বলিয়া মনে পড়ে না। কোনও সোজা খুঁটির গায়ে গোড়া হইতে আগা পর্য্যন্ত, খানিকটা করিয়া ব্যবধান রাখিয়া, যদি একখানা কাপড় বা একটা রজ্জু জড়াইয়া দেওয়া হয়, তবে এই কাপড়ের বা রজ্জুর গতি যেরূপ হইবে, সমাজ-বিবর্ত্তনের গতিও সেইরূপ। এইরূপ বক্রগতিকেই ইংরেজিতে স্পাইর‍্যাল-গতি বলে। এ গতি একটানা কেবল উপরের দিকে চলে না। একটু উপরে উঠিয়া আবার একটু নীচে নামিয়া আসে। কিন্তু এইরূপে নিম্নাভিমুখী হইয়াও, আগে যতটা নীচে ছিল, কদাপি ততটা নীচে আর যায় না। বরং নীচে নামিতে যাইয়াও সর্ব্বদাই আগে যতটা উচ্চে ছিল, প্রত্যক স্থানেই তার চাইতে উপরে থাকে। আর এরই জন্য মোটের উপরে এই গতি সর্ব্বদাই উর্দ্ধমুখী হইয়া পরিণামে চরম উন্নতি লাভ করে। সমাজবিবর্ত্তনের ধারা ঠিক এইরূপ।

সমাজ এই বক্রগতিতে চলিয়া, এক একবার নামিয়া আসিয়া আবার উপরে উঠিতে তিনটী অবস্থার ভিতর দিয়া যায়। আধুনিক সমাজতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা ইহার প্রথম অবস্থাকে ইংরেজিতে homogeneityর বা নির্ব্বিশেষ-একাকারত্বের অবস্থা বলেন। দ্বিতীয় অবস্থাকে differentiationএর বা বিশিষ্ট বহুত্বের ও পার্থক্যের অবস্থা বলেন। তৃতীয় অবস্থাকে integrationএর বা মিলনের, সামঞ্জস্যের, একত্বের অবস্থা বলিয়া থাকেন। এই কথা তিনটী জীবজগতের বিবর্ত্তনের ইতিহাস হইতেই মূলতঃ গৃহীত হইয়াছে। সামাজিক বিবর্ত্তনে এই অবস্থাগুলির অনুরূপ নাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আমাদের শাস্ত্রীয় পরিভাষা ব্যবহার করিলে, বিবর্ত্তনের প্রথম পাদ বা প্রথম অবস্থাকে তামসিক, মধ্যমপাদ বা মধ্যের অবস্থাকে রাজসিক এবং শেষের পাদকে বা অবস্থাকে সাত্ত্বিক বলাই সঙ্গত হইবে। আমাদের পৌরাণিকী কাহিনীর সৃষ্টিপ্রকরণে এই বিবর্ত্তন-ক্রমটীই ব্যক্ত হইয়াছে।

সৃষ্টির আদি অবস্থা নির্ব্বিশেষ একাকারত্বেরই অবস্থা। ইংরেজিতে ইহাকে স্বচ্ছন্দে homogeneityর অবস্থা বলা যাইতে পারে। আমাদের পৌরাণিকী কাহিনী নিখিল বিশ্বের বীজরূপী, অপঞ্চীকৃত-পঞ্চমহাভূতাত্মক অণ্ডমধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের বিবর্ত্তনশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অণ্ড-বস্তুর লক্ষণ নির্ব্বিশেষত্ব ও একাকারত্ব। কারণাব্ধি-মধ্যে এই অপঞ্চীকৃত-পঞ্চমহাভূতাত্মক অণ্ডের ভিতরে সৃষ্টির পূর্ব্বে, হিরণ্যগর্ভ বা মহাবিষ্ণু যোগনিদ্রাভূত হইয়া থাকেন। সাংখ্যদর্শন এই তত্ত্বকেই অব্যক্ত বা প্রকৃতি বলিয়াছেন। এই তত্ত্বে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় বিরাজ করে। ত্রিগুণের এই সাম্যাবস্থাই বিশ্ববিবর্ত্তনে, সৃষ্টিপ্রকরণে, homogeneityর অবস্থা। এই সাম্য ভাঙ্গিবা মাত্র মহাবিষ্ণুর যোগনিদ্রাও ভাঙ্গিয়া যায় এবং নির্ব্বিশেষ একাকারত্ব হইতে ক্রমে রজঃপ্রাধান্য হেতু সবিশেষ ও বহু-

আকারসম্পন্ন বিশাল ও বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ আরম্ভ হয়। ইহাই differentiationএর বা ভেদ-প্রতিষ্ঠার অবস্থা। ভেদমাত্রেই বিরোধাত্মক, আর বিরোধমাত্রেই উপায়পর্য্যায়ভুক্ত; তাহার নিজস্ব কোনও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নাই। বিরোধ আপনাকে বিনাশ করিয়াই আপনার সার্থকতা লাভ করে। সুতরাং এই বিরোধের ব differentiationএর অবস্থা কদাপি স্থায়ী হইতে পারে না। ভেদের ভিতর দিয়া অভেদের প্রতিষ্ঠা হইলেই তবে সে ভেদ আপনার স্যর্থকতা লাভ করে। এইজন্য differentiationএর পরে integration হইবেই হইবে। এই integration একত্বের, অভেদের, কিম্বা অচিন্ত্য-ভেদাভেদাত্মক মহান্ একের প্রতিষ্ঠা করে; এবং এই একত্বে বা integrationএ বিবর্ত্তনপ্রণালী পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। বিবর্ত্তন ক্রিয়ার এই তিন পাদের প্রথম পাদে তমোগুণের, দ্বিতীয় পাদে রজোগুণের, তৃতীয় পাদে সত্বগুণের প্রাধান্য হইয়া থাকে।

এই ত্রিপাদকে আশ্রয় করিয়া জনসমাজ নিয়ত বিবর্ত্তিত হইতেছে। কিন্তু সমাজ বিবর্ত্তনের এই ত্রিপাদচক্রে যে সমাজ-জীবনের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত, কেবল একবার মাত্র ঘুরিয়া আসে, তাহা নয়। সমাজ-বিবর্ত্তনের গতি কখনও কোথাও থামিয়া যায় না। সমাজ নিয়তই বিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং এই ত্রিপাদচক্রও নিয়ত ঘুরিতেছে। তমঃ রজঃ সত্ব এই তিনগুণ, প্রত্যেক সমাজের জীবনে, একের পর অন্যে, বারম্বার প্রবল হইয়া, এই ত্রিপাদ চক্রের গতিবেগ রক্ষা করিতেছে। যুগে যুগে একবার করিয়া এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া এই ত্রিপাদচক্র ঘুরিয়া আসিতেছে। প্রত্যেক যুগের আদিতে সমাজ ঘোরতর তামসিকতার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। পূর্ব্বতন যুগের শ্রেষ্ঠতম সাত্বিকতা কালবশে শাস্ত্রে ও সংস্কারে, আচারে ও অনুষ্ঠানে আবদ্ধ হইয়া ক্রমে গতানুগতিকতা প্রাপ্ত হয়। সমাজের ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই

তখন প্রতিষ্ঠানবদ্ধ হইয়া প্রাণহীন ও অর্থশূন্য হইয়া পড়ে। সমাজ তখন জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া, জড়গতি লাভ করে। এই জড়ত্ব তমের ধর্ম। এ অবস্থা তামসিক homogeneityর অবস্থা। ক্রমে তখন আবার সমাজমধ্যে রজোগুণ জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই রজঃপ্রাবল্য নিবন্ধন অসার সমাজদেহে ভেদবিরোধের সৃষ্টি হইয়া, নূতন শক্তির সঞ্চার হয়। ইহাই রাজসিক differentiationএর অবস্থা। সর্ব্বশেষে সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া এই ভেদবিরোধের উপশম ও শান্তি হইতে আরম্ভ করে। সমাজ তখন অভিনব সামঞ্জস্যের ও সঙ্গতির সাহায্যে পূর্ব্বতন যুগের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ও অবস্থাকে ছাড়াইয়া আরো উপরে উঠিয়া যায়। এইরূপে বক্র গতিতে সমাজ ক্রমে উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হয়।

আধুনিক ভারতের সামাজিক বিবর্ত্তনে ব্রাহ্মসমাজের স্থান

বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে, সমগ্র ভারতসমাজ অবসাদে নিমগ্ন ছিল। ধর্ম্ম প্রাণহীন, অনুষ্ঠান অর্থহীন, প্রকৃতিপুঞ্জ জ্ঞানহীন, সমাজ আত্মচৈতন্য-হীন হইয়া পড়িয়াছিল। ঘোরতর তামসিকতা শ্রেষ্ঠতম সাত্ত্বিকতার ভাণ করিয়া, ভীতিকে শম, নির্ব্বীর্য্যতাকে দম, নিদ্রালস্য-সম্ভূত নিশ্চেষ্টতাকে নির্ভর বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছিল। ভারত-সমাজের এই ঘোরতর তামসিকতাচ্ছন্ন অবস্থায় ইংরেজের শাসন, খৃষ্টিয়ানের ধর্ম্ম, য়ুরোপের সাধনা এক অভিনব আদর্শের প্রেরণা লইয়া আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই নূতন শক্তি-সংঘর্ষে এই তামসিকতা অল্পে অল্পে নষ্ট হইয়া অভিনব রাজসিকতা জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। এই বিচিত্র যুগসন্ধিকালে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। য়ুরোপীয় সাধনার এই প্রবল [illegible]কে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজ ধর্ম্মে ও কর্ম্মে, সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী সমাজ যে ঘোরতর তামসিকতায় ডুবিয়া

আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, প্রতিবাদী ধর্ম্মের প্রবল আঘাতে তাহাকে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিয়া, আধুনিক ভারতের বিবর্ত্তনগতিকে homogeneity বা thesisএর অবস্থা হইতে differentiation বা antithesisএর অবস্থায় লইয়া যান। আর তিন জন প্রতিভাশালী পুরুষকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজ আধুনিক ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে ঘোরতর তামসিকতা হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার মধ্যে অভিনব রাজসিকতার সঞ্চার করিয়াছেন। প্রথম মহর্ষি দবেন্দ্রনাথ ঠাকুর; দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন; তৃতীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী।

রাজর্ষি রামমোহন ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

রাজা রামমোহন রায়কেই লোকে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করে সত্য; কিন্তু তিনি যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, আর ব্রাহ্মসমাজে তাঁর পরবর্ত্তী নেতৃবর্গ যে ভাবে ইহাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। রাজা একান্তভাবে শাস্ত্রপ্রামাণ্য বর্জ্জন করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বেদকে প্রামাণ্য মর্য্যাদা ভ্রষ্ট করিয়া শুদ্ধ ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধির উপরে ঐকান্তিকভাবে সত্যাসত্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম মীমাংসার ভার অর্পণ করেন। রাজা ধর্ম্মসাধনে গুরুরও যে একটা বিশেষ স্থান আছে, ইহা অস্বীকার করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যেমন শাস্ত্র সেইরূপ গুরুকেও বর্জ্জন করিয়া, প্রত্যক্ষ আত্মশক্তি ও অপ্রত্যক্ষ ব্রহ্মকৃপার উপরে সাধনের যথাযোগ্য সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা কি তত্ত্বাঙ্গে কি সাধনাঙ্গে ধর্ম্মের কোনও অঙ্গেই, স্বদেশের সনাতন সাধনার সঙ্গে আপনার ধর্ম্ম সংস্কারের প্রাণগত যোগ নষ্ট করেন নাই। মহর্ষি একপ্রকারের স্বাদেশিকতার একান্ত অনুরাগী হইয়াও, প্রকৃতপক্ষে এই যোগ রক্ষা করেন নাই এবং করিতে চেষ্টা করেন নাই।

রাজা বেদান্তের উপরে আপনার তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি প্রকৃতপক্ষে অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরে তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্মকে গড়িয়া তুলেন। রাজা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন। মহর্ষি তাঁহার আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতি-প্রতিপাদ্য ধর্ম্মকে ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজা বৈদান্তিক হইলেও তাঁর পূর্ব্বতন কোনও বৈদান্তিক সিদ্ধান্তকে একান্তভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু শাস্ত্রাবলম্বনে যে সকল যুক্তিপ্রমাণাদিকে আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্বতন ঋষি ও মনীষিগণ আপন আপন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, রাজা রামমোহন সেই প্রাচীন ঋষিপন্থার অনুসরণ করিয়া আধুনিক সময়ের উপযোগী এক সমীচীন বেদান্ত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে স্বদেশের ধর্ম্মের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়, অথচ পুরাতনের উপরে, পুরাতনের সঙ্গে যুক্ত হইয়া, পুরাতনের শিক্ষা ও সাধনাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া দেশকালের উপযোগী নূতন সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়। মহর্ষিও পুরাতনকে কতকটা রক্ষা করিতে চাহিয়াছেন বটে, কিন্তু সে কেবল তাঁর অভিজাত প্রকৃতির বলবতী রক্ষণশীলতার অনুরোধে। তিনি যে সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহার সঙ্গে তাঁর এই চেষ্টার কোন অপরিহার্য্য সম্বন্ধ ছিল না। মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে কেবল উপনিষদের উপদেশ উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে সত্য; কিন্তু এ সকল উদ্ধৃত উপদেশের প্রামাণ্য মর্য্যাদা শ্রুতি-প্রতিষ্ঠিত নহে, মহর্ষির আপনার স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠিত মাত্র। উপনিষদের যে সকল শ্রুতি মহর্ষির নিকটে সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে, তিনি সেগুলিকেই বাছিয়া বাছিয়া আপনার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে নিবদ্ধ করেন;—ঋষিরা কি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন বা জানিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান তিনি করেন নাই। কোনও শ্রুতির উত্তরার্দ্ধ, কোনটীর বা অপরার্দ্ধ, যার যতটুকু তাঁর নিজের মনোমত পাইয়াছেন, তাহাই কাটিয়া ছাঁটিয়া আপনার ব্রাহ্মধর্ম্ম

গ্রন্থে গাঁথিয়া গিয়াছেন। অতএব মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে বিস্তর শ্রুতি উদ্ধৃত হইলেও, এ গ্রন্থ তাঁর নিজের। ইহার মতামত তাঁর, প্রাচীন ঋষিদিগের নহে। সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধার না করিয়া কেবল বাঙ্গলা ভাষায় এ সকল মতামত লিপিবদ্ধ করিলে তার যতটুকু মর্য্যাদা থাকিত, উপনিষদের উদ্ধৃতি দেওয়াতে ইহা তদপেক্ষা বেশী মর্য্যাদা লাভ করে নাই। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদীগণের অন্যতম উপদেষ্টা মন্‌কিওর ডি কন্‌ওয়ের সঙ্কলিত শাস্ত্র-সংগ্রহের বা Sacred Anthologyর যে পরিমাণ ও যে জাতীয় শাস্ত্রপ্রামাণ্য ও শাস্ত্রমর্য্যাদা থাকা সম্ভব, মহর্ষির সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থের সে পরিমাণ ও সেই জাতীয় শাস্ত্রপ্রামাণ্য এবং শাস্ত্রমর্য্যাদা আছে বা থাকিতে পারে; তার বেশী নয়।

কিন্তু রাজা রামমোহন যে সমীচীন মীমাংসার সাহায্যে স্বদেশের পুরাতন সাধনার উপরে নূতন যুগের সাধনাকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, সে মীমাংসা-প্রতিষ্ঠার অনুকূল কাল তখনও উপস্থিত হয় নাই। লোকের মন তখনও তাহা গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। ফলতঃ যে বিবেক জাগ্রত হইলে লোকের মনে পুরাতন ও প্রচলিতের প্রাণহীনতার জ্ঞান জন্মিয়া থাকে, এদেশে তখনও সে বিবেক জাগে নাই। শাস্ত্র, সন্দেহ, বিচার, সমন্বয়, সঙ্গতি—ইহাই মীমাংসার ক্রম। যতক্ষণ না শাস্ত্রে সন্দেহ জন্মে, ততক্ষণ বিচারের অবসর ও মীমাংসার প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। রামমোহনের অলোকসামান্য প্রতিভা প্রাচীন ও প্রচলিতের অসারতা ও ভ্রান্তি দেখিয়া তাহার প্রতি সন্দিহান হইয়াছিল। তাই সেই সন্দেহ হইতে বিচার, সেই বিচারের ফলে তিনি নূতন মীমাংসায় উপনীত হন। কিন্তু দেশের লোকের মনে তখনও এরূপ গভীর সন্দেহের উদয় হয় নাই; তাহাদের বিবেকও জাগে নাই। প্রাচীনকে লইয়াই তাহারা তখনও সন্তুষ্ট ছিলেন। শাস্ত্র ও স্বাভিমতের

মধ্যে তখনও কোনও প্রবল বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই। দেশের লোকে শাস্ত্র কি, তাহা জানিতেন না। জানিবার প্রয়োজন-বোধ পর্য্যন্ত তাহাদের জন্মায় নাই। সুতরাং রাজা যে মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, তাহা বুঝিবার ও ধরিবার বাসনা এবং শক্তি দু'য়েরই তখন একান্ত অভাব ছিল।

রাজার সময়ে যে সন্দেহ জাগে নাই, মহর্ষির সময়ে তাহা জাগিয়া উঠিয়াছিল। রাজার জীবদ্দশার শেষভাগে অষ্টাদশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিত্তকে অভিভূত করিতে আরম্ভ করে। প্রাচীন ও প্রচলিতের প্রতি রাজার মনে যে সন্দেহের উদয় হইয়াছিল, তাহা মোহাম্মদীয় যুক্তিবাদের ফল, খৃষ্টিয় যুক্তিবাদের ফল নহে। ফরাসী বিপ্লবের চিন্তানায়কগণের সঙ্গে রাজার তখন কোন পরিচয় হয় নাই। পাটনায় যাইয়া, পারসী ও আরবী পড়িয়া, মোহাম্মদীয় তন্ত্রের মোতাজোলা সম্প্রদায়ের যুক্তিবাদের শিক্ষা লাভ করিয়া রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বপ্রথমে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের তথাকথিত পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মহর্ষি যে এই পৌত্তলিকার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাহা ইংরেজি শিক্ষার ফল। তাঁহার সময়ে য়ুরোপীয় যুক্তিবাগের প্রভাবে আমাদের নব্য-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশের প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কারাদি সম্বন্ধে প্রবল সন্দেহের উদয় হইয়াছিল।

আর যে বিচার বা criticismকে অবলম্বন করিয়া দেশের ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে এই সন্দেহের উৎপত্তি হয়, সেই বিচারকে আশ্রয় করিয়াই মহর্ষির ধর্ম্মমীমাংসার এবং তত্ত্ব-সিদ্ধান্তেরও প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিচার বা criticismএর উপরেই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই যুক্তিবাদ আগমের বা আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করে না। এই যুক্তিবাদের

বিচারপদ্ধতি প্রাকৃত বুদ্ধির আশ্রয়ে, লৌকিক ন্যায়ের বা formal logic এর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং এই য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে, আমাদের তদানীন্তন ইংরেজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিচার বা criticism শাস্ত্রাশ্রয় বর্জ্জন এবং সদ্‌গুরুর শিক্ষা ও সাহায্যকে উপেক্ষা করিয়া, লৌকিক ন্যায়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি প্রমাণকে অবলম্বন করিয়া চলিতে আরম্ভ করে। এই বিচার একান্তই প্রত্যক্ষবাদী। আর প্রত্যক্ষ বলিতে ইহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষই বুঝিয়া থাকে। এই যুক্তিবাদের বা Rationalism এর সঙ্গে জড়বাদের বা Materialism এর সম্বন্ধ অতিশয় ঘনিষ্ঠ। এইজন্য য়ুরোপে যখন যেখানে যুক্তিবাদ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তখন সেখানে তার সঙ্গে সঙ্গে, এই জড়বাদ বা Materialismও প্রবল হইয়াছে। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও জড়বাদ উভয়ই "নাস্ত্যদস্তীতিবাদী।" এই যুক্তিবাদের উপরে ধর্ম্মবস্তুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, মানুষের প্রত্যক্ষ চক্ষু কর্ণাদির ন্যায়, অপ্রত্যক্ষ অথচ বুদ্ধিগম্য, একটা অতীন্দ্রিয় বৃত্তির অস্তিত্ব মানিয়া লইতে হয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় আস্তিক-মতাবলম্বী ধর্ম্মসংস্কারকেরা তাহাই করিয়াছেন। তাঁরা মানুষের মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধি বা religious sense বলিয়া একটা অতীন্দ্রিয় বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা করিয়া, তাহার উপরে ধর্ম্মের প্রামাণ্যকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই ধর্ম্মবুদ্ধি বা religious sense সভ্য অসভ্য সকল মানুষের মধ্যে আছে। ইহা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌমিক। সুতরাং কোন বাহ্য কারণের বা অবস্থার যোগাযোগে ইহার উৎপত্তি হয় না বলিয়া এই ধর্ম্মবুদ্ধিটা সত্য। আর ইহার একটা স্বতঃপ্রামাণ্যও আছে। এই ভাবেই য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। মহর্ষিও ব্রাহ্মধর্ম্মকে রক্ষা করিতে যাইয়া কতকটা এই পথ ধরিয়াই চলিয়াছিলেন। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদী আস্তিক-সম্প্রদায় যাহাকে ধর্ম্মবুদ্ধি বা religious sense

বলিয়াছেন, মহর্ষি আপনার ধর্ম্মমীমাংসায় তাহাকেই আত্মপ্রত্যয় নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আত্মপ্রত্যয় বস্তুতঃ আমোদের শাস্ত্রোক্ত স্বানুভূতির নামান্তর মাত্র; বেদান্ত যাহাকে আত্মপ্রত্যয় বলিয়াছেন, মহর্ষির আত্মপ্রত্যয় ঠিক সে বস্তু নয়। অন্ততঃ তাঁহার প্রথম জীবনের ধর্ম্মমীমাংসা যাহাকে আত্মপ্রত্যয় বলিয়া ধরিয়াছিল, তাহা যে বেদান্তোক্ত আত্মপ্রত্যয়, এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। আর শাস্ত্র-গুরু বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধ যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিলে এই তথাকথিত আত্মপ্রত্যয় বা স্বানুভূতিই সত্যের ও প্রামাণ্যের একমাত্র আশ্রয় হইয়া দাঁড়ায়। মহর্ষিও এই স্বানুভূতিকে অবলম্বন করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মকে পুনরায় জাগাইয়া তুলেন।

এদেশে তখন এরূপভাবে লোকের স্বানুভূতিকে জাগাইয়া তোলা অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। কেবল শাস্ত্রাবলম্বনে ধর্ম্মসাধন করিবে না, শাস্ত্রযুক্তি মিলাইয়া ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করিবে,—লোকে এই প্রাচীন ও সমীচীন উপদেশ তখন একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রজ্ঞানও একরূপ লোপ পাইয়াছিল। তাহা না হইলে মহর্ষি যেভাবে চারিজন ব্রাহ্মণকে কাশীতে বেদ পড়িবার জন্য পাঠাইয়া, তাঁহাদের সাক্ষ্যে বেদের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট করেন, তাহা আদৌ সম্ভব হইত না। ইহারা কেবল ব্যাকরণের সাহায্যে বেদার্থ নির্ণয় করিতে গিয়াছিলেন, প্রাচীন মীমাংসার পথ অবলম্বন করেন নাই। রাজা এই মীমাংসার পথ ধরিয়া শাস্ত্রার্থ নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মহর্ষির ন্যায় তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রাচীন শ্রুতি প্রামাণ্য পরিত্যাগ করিতে হয় নাই। প্রাকৃত জনে যে চক্ষে বেদকে দেখে, লোকসংগ্রহার্থে পণ্ডিতেরাও যে ভাবে বেদের অতিপ্রাকৃত মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন,—ভারতের প্রাচীন মীমাংসকগণ সেরূপ করেন নাই। রাজা এ সকল কথা জানিতেন। সুতরাং তাঁহাকে মহর্ষির ন্যায় শাস্ত্র-প্রামাণ্য বর্জ্জন করিতে হয় নাই। কিন্তু তখনও এ সকল প্রাচীন সিদ্ধান্তের পুনরুদ্ধারের ও পুনঃ প্রতিষ্ঠার সময় হয় নাই। দেশের লোক

তখনও এ সমীচীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার অধিকারী হয় নাই। সে সময়ে এ সকল সিদ্ধান্তের কথা বলিলেও, লোকে ভাল করিয়া তাহা বুঝিত না, অথচ না বুঝিয়া তাহার মধ্যে নিজেদের নিশ্চেষ্টতা ও তামসিকতা সমর্থন করিবার যুক্তির আভাস পাইয়া, সেই নির্জীব অবস্থাতে পড়িয়া থাকিত। তখনকার প্রধান কর্ম্ম ছিল, সত্য প্রতিষ্ঠা করা নয়, কিন্তু কুসংস্কার নাশ করা। সদ্-মীমাংসা মাত্রেই সম্যক্‌দর্শী। আর সম্যক্‌দর্শন নিম্নাধিকারী লোকের পক্ষে কর্ম্ম-চেষ্টার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার একান্ত অন্তরায় হইয়া থাকে। যে 'গো' এর ভিতর দিয়া রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া তমোগুণকে অভিভূত করিয়া থাকে, অসময়ে সম্যক্‌দৃষ্টি লাভ করিলে সে 'গো' জন্মাইতে পারে না; সুতরাং তামসিকতাও নষ্ট হয় না। আধুনিক ভারতের নূতন সাধনার প্রয়োজনে রাজার তত্ত্ব-সিদ্ধান্তে যে সম্যক্‌দর্শনের পরিচয় পাই, মহর্ষির প্রথম জীবনের ধর্ম্মমীমাংসায় সে সম্যক্‌দৃষ্টি ফুটিয়া উঠে নাই; উঠিলে তাঁহার দ্বারা বিধাতা যে কাজ করাইয়াছেন, তাহার গুরুতর ব্যাঘাত উৎপন্ন হইত।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র

রাজা রামমোহন প্রচলিত ক্রিয়াকাণ্ডের প্রতিবাদ করিয়াও, প্রকৃত পক্ষে একটা নূতন ধর্ম্মের বা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথই "ব্রহ্মসভার" ভজন-সাধনকে একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্মরূপে গড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে এই নূতন ধর্মের স্বাতন্ত্র্য ও সাম্প্রদায়িক লক্ষণ ততটা পরিস্ফুট হয় নাই, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে তদপেক্ষা অনেক বেশী ফুটিয়া উঠে।

দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্র-গুরু বর্জ্জন করিয়া, কেবলমাত্র স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া আপনার ধর্মসিদ্ধান্ত ও ধর্মসাধনের প্রতিষ্ঠা করেন বটে, কিন্তু এই স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে তিনি উপনিষদের শ্রুতির আশ্রয়ে

স্থাপন করিতে যাইয়া, এক প্রকারের শাস্ত্র-প্রামাণ্যও প্রদান করেন। এইজন্য তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্ম বস্তুটী যে একান্তই অভিনব ও স্বরচিত, ইহার যে কোন প্রাচীন ভিত্তি বা প্রামাণ্য-মর্যাদা নাই, লোকে ইহা সহজে ধরিতে পারে নাই। সে সময়ে দেশে শাস্ত্রজ্ঞান একরূপ লোপ পাইয়াছিল। সাধারণ লোকের তো কথাই নাই, দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরাও বেদবেদান্তাদির কোন ধার ধারিতেন না। সুতরাং আপনার ব্যক্তিগত বিচারবুদ্ধিসম্ভূত সিদ্ধান্তকে মহর্ষি যে অদ্ভুত শ্রুতিমর্য্যাদা প্রদান করিতে চেষ্টা করেন, তাহার কৃত্রিমতা ও অশাস্ত্রীয়তা, দেশের লোকে একেবারে বুঝিতে ও ধরিতে পারেন নাই। ফলতঃ প্রচলিত কর্ম্মকাণ্ড পরিহার করিয়া দেবেন্দ্রনাথ সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন; নতুবা তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্ম একান্ত অশাস্ত্রীয় ও অপ্রামাণ্য বলিয়া তাঁহার উপরে কোন নির্য্যাতন হয় নাই। বরঞ্চ তাঁর সিদ্ধান্ত ও সাধনাকে উচ্চতর অধিকারের হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াই অনেকে মনে করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিত্বাভিমানী য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তাঁর সাধনা ও চরিত্রগুণে, তাঁর উপদিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্মে এই ব্যক্তিত্বাভিমানী যুক্তিবাদের প্রভাব ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতির মধ্যে একটা প্রবল প্রভুত্বাভিমান বিদ্যমান ছিল। তিনি যে সমাজে, যে পরিবারে, যেরূপ বিভবগৌরবের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন ও যে সৌভাগ্যের অঙ্কে লালিত পালিত হন, তাহাতে এরূপ প্রভুত্বাভিমান যে তাঁর মধ্যে জন্মিবে, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। তার পর তিনি যে ভাবে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়া, তার মুমূর্ষু দেহে নবজীবনের সঞ্চার করেন এবং এক দিকে আপনার সাধনের ও অন্যদিকে আপনার অর্থের দ্বারা যেরূপে ইহাকে লোকসমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজে যে তাঁর একটা একতন্ত্রপ্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, ইহাও

কিছু আশ্চর্য্য নহে। আর এই কারণে মহর্ষি আদি ব্রাহ্মসমাজে যে ধর্ম্মের ও সাধনের প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা যে একান্ত শাস্ত্র গুরু-বর্জ্জিত, এ ভাবটা বহুদিন পর্য্যন্ত ধরা পড়ে নাই। প্রাচীন শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ আপনার সঙ্কলিত "ব্রাহ্মধর্ম" গ্রন্থকে প্রামাণ্য শাস্ত্রের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রাচীন গুরু-আনুগত্য বর্জ্জন করিয়া দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম শিষ্যমণ্ডলী তাঁহাকেই নূতন ধর্ম্মের গুরুরূপে বরণ করেন। সুতরাং প্রকৃত পক্ষে শাস্ত্র-গুরু-বর্জ্জিত, শুদ্ধ স্বানুভূতি-প্রতিষ্ঠিত হইয়াও, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মে বাহ্যতঃ ও লোকতঃ গুরু ও শাস্ত্র উভয়েরই প্রতিষ্ঠা হয়। আর এই জন্য স্বদেশের ধর্ম্মের সঙ্গে সাধন ও সংস্কারাদি বিষয়ে ইহার বিস্তর পার্থক্য দাঁড়াইলেও, ভাবগত কোনও প্রবল বিরোধ উৎপন্ন হয় নাই। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সর্ব্বদা আপনার তত্ত্বসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনকে উচ্চতর ও বিশুদ্ধতর হিন্দুধর্ম্ম বলিয়াই প্রচার করিয়াছেন। দেশের লোকেও তাঁহাদের এই দাবীর একান্ত প্রতিবাদ করেন নাই।

কিন্তু এইরূপে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ যে পথ ধরিয়া আপনাদের ধর্ম্মসাধনে গুরু ও শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন, সে পথে এদেশে কখনও এ বস্তু মিলে নাই। আমাদের সাধনায় শাস্ত্র-গুরু-আনুগত্যের একটা নিগূঢ় সঙ্কেত আছে; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ সে সঙ্কেতটী লাভ করেন নাই। গুরু স্বয়ং গুরু-আনুগত্য স্বীকার ও শাস্ত্র আপনি পুরাতন শাস্ত্রে আবদ্ধ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আমাদের গুরু ও শাস্ত্র কিম্বা গুরুর উপদেশ, দু'এর কেহই স্বয়ং-বৃত ও স্বপ্রতিষ্ঠ নহেন। পূর্ব্বতন গুরুপরম্পরা ও সনাতন শাস্ত্রধারার সঙ্গে ইহাদের একটা গভীর ও অঙ্গাঙ্গী যোগ সর্ব্বদাই রক্ষিত হয়। মহর্ষির ব্রাহ্মসমাজে এ যোগ থাকে নাই। আর এইরূপ স্বয়ংবৃত গুরুর বা মনগড়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা কদাপি কোথাও

স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। যেখানে এরূপ গুরু-শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই খানে ক্রমে বিদ্রোহীদলের উৎপত্তি হইয়া, সম্প্রদায়কে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। রোমক-খৃষ্টিয় সঙ্ঘের প্রামাণ্য একদিকে পুরাতন শাস্ত্রধারার ও অন্যদিকে পুরাগত গুরুপারম্পর্য্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সেখানে ধর্ম্মমত লইয়া দলাদলির প্রকোপ অত্যন্ত কম। প্রোটেষ্টাণ্ট্ খৃষ্টীর সঙ্ঘে শাস্ত্র আছে, কিন্তু গুরুপরম্পরার ব্যাখ্যাকে অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রধারার সৃষ্টি হয় নাই; এখানে প্রত্যেকে আপনার বিচার ও বুদ্ধি, খুসি ও খেয়াল মত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অন্যদিকে প্রোটেষ্টাণ্ট্ খৃষ্টীয়মণ্ডলী মধ্যে গুরুপরম্পরারও প্রতিষ্ঠা হয় নাই। আর এই দুই কারণে প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সঙ্ঘ এই পাঁচশত বৎসরের মধ্যে অসংখ্য বিরোধীদলে বিভক্ত হইয়াছে, আর প্রতিদিনই নূতন নূতন প্রতিবাদী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়া, ইহাকে আরো ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিতেছে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও, মূলতঃ এই একই কারণে, মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই পঞ্চাশৎ বৎসর যাইতে না যাইতে তিনটা দলের সৃষ্টি হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে পথ ধরিয়া প্রাচীন শাস্ত্র-গুরু বর্জ্জন করিয়া, আপনার ব্রাহ্মসমাজে নূতন গুরু ও শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিতে গেলেন, সে পথে এ বস্তু পাওয়া যায় না। তিনি আপনার বিচারবুদ্ধি বা তথাকথিত আত্মপ্রত্যয়কে যতটা প্রামাণ্য-মর্য্যাদা প্রদান করিতে লাগিলেন, অপর ব্রাহ্মদিগের বিচারবুদ্ধির প্রতি সেইরূপ মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। পারিলে, তাঁর নিজের গুরুপদ-গৌরব ও তাঁর সঙ্কলিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থের শাস্ত্রপ্রামাণ্য, তিনি দু'এর কিছুরই দাবী করিতে পারিতেন না। কিন্তু মহর্ষি যে ব্যক্তিস্বাভিমানী যুক্তিবাদের (Individualistic Rationalism) উপরে আপনার ব্রাহ্মধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তার অপরিহার্য্য পরিণামকে অকুতোভয়ে গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে তিনি আপনার অসঙ্গত একতন্ত্র-প্রভুত্ব রক্ষা করিতে যাইয়া আপনার শিষ্যগণের মধ্যে একটা প্রবল প্রতিবাদ জাগাইয়া তুলিলেন। যে ব্যক্তিত্বাভিমানী সজ্ঞান বা Conscienceকে আশ্রয় করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ প্রাচীন ও পুরাগত শাস্ত্র গুরু বর্জ্জন করিলেন, সেই ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞানের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্যই কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের যুবকদল, তাঁহার একতন্ত্র আধিপত্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, ব্রাহ্মসমাজে এক নূতন বিদ্রোহীদলের সৃষ্টি করেন। এ জগতে প্রত্যেক বস্তু তার অনুরূপ বস্তুকেই উৎপাদন করিয়া থাকে। স্বদেশের শাস্ত্রগুরুর বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথের দ্রোহিতা, আপনার কর্ম্মবশে তাঁহার নিজের সমাজে, আপনার শিষ্যগণের ভিতরে এই নূতন দ্রোহীদলের সৃষ্টি করিল। এই নূতন ব্রাহ্মসমাজ কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে এমন পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল, যাহাতে স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনার সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ যে বিরোধ জাগাইয়াছিলেন, সেই বিরোধই আরো বেশী ও তীব্র হইয়া উঠিল।

মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন। উভয়েই প্রকৃতপক্ষে সারসংগ্রহবাদী ছিলেন। এই শ্রেণীর দার্শনিকদিগকে ইংরেজীতে Eclectic বলে। কিন্তু মহর্ষির যুক্তিবাদ যতটা সংযত ও সারসংগ্রহবাদ যে পরিমাণ স্বাদেশিক ছিল, কেশবচন্দ্রের যুক্তিবাদ ততটা সংযত ও তাঁর সারসংগ্রহবাদ বা Eclecticism সে পরিমাণ স্বাদেশিক রহে নাই। মহর্ষি আপনার বিচারবুদ্ধিকে সত্যের একমাত্র ও অনন্যপ্রতিযোগী প্রামাণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সেই বিচারবুদ্ধির সাহায্যে স্বদেশের প্রাচীন শ্রুতি হইতে আপনার মনোমত সিদ্ধান্ত ও উপদেশাদি উদ্ধার করিয়া, তাহাকে ব্রাহ্মধর্ম্মের শাস্ত্র বলিয়া প্রচার করেন। কেশবচন্দ্র এই পথে যাইয়া জগতের সমুদায় ধর্ম্মসাহিত্য হইতে সার সংগ্রহ করিয়া, এই শ্লোকসংগ্রহকে

ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার ঐতিহাসিক ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের মধ্যে একটা উদার বিশ্বজনীন ভাব আছে। মহর্ষির ব্রাহ্ম-সিদ্ধান্তে বা ব্রহ্মসাধনে এই বিশ্বজনীনতা রক্ষিত হয় নাই। কেশবচন্দ্রের সিদ্ধান্তে ও সাধনায় ইহা খুব ফুটিয়া উঠে। এইজন্য যুক্তিবাদের নিক্তিতে ওজন করিলে, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের মত, সিদ্ধান্ত, সাধনাদি—সকলই মহর্ষির মত, সিদ্ধান্ত ও সাধন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইয়া উঠে। কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষির একতন্ত্র-প্রভুত্বের প্রতিবাদ করিতে যাইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয়। এইজন্য এই নূতন সমাজকে প্রথমে গণতন্ত্রতার আদর্শে গড়িয়া তুলিবার কতকটা চেষ্টাও হইয়াছিল। ইহার ফলে মহর্ষির সমাজে ব্রাহ্মসাধারণের ব্যক্তিস্বাভিমানী 'সহজবুদ্ধির' বা Intuitionএর যতটা প্রভাব ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় নাই, কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, প্রথম প্রথম তাহা তদপেক্ষা অনেক বেশি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। মহর্ষির উপদেশে ও সাধনে একটা হিন্দুভাব সর্ব্বদাই জাগিয়া ছিল। এই কারণে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মগণ মধ্যে একটা বিনয়, একটা শ্রদ্ধা ও একটা সংযমের প্রভাবও সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইত। এই বিনয়, শ্রদ্ধা ও সংযম হিন্দুর প্রকৃতিগত বস্তু। কিন্তু প্রোটেষ্ট্যান্ট্ খৃষ্টীয় সাধনা ব্যক্তিগত সংজ্ঞান বা Conscienceকে বাড়াইতে যাইয়া, ধর্ম্মের এই প্রাণগত বস্তুগুলিকে অনেকটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। কেশবচন্দ্র প্রথম যৌবনে এই খৃষ্টীয় ভাবের দ্বারা অত্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁর শিক্ষাদীক্ষাতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজেও ব্যক্তিগত সংজ্ঞান বা Conscienceএর ভাবটা নিরতিশয় প্রবল হইয়া এই বিনয়, সংযম ও শ্রদ্ধা বস্তুকে এক প্রকার নষ্ট করিয়া ফেলে। এই ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞানের প্রাধান্য আধুনিক য়ুরোপীয় যুক্তিবাদী ধর্ম্মসকলের প্রধান লক্ষণ। এই লক্ষণাক্রান্ত হইয়া, আমাদের

ব্রাহ্মসমাজেও, কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বাধীনে যুক্তিবাদী ধর্মের স্বরূপটী যতটা ফুটিয়া উঠে, মহর্ষির অধীনে, তাঁর কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে, ততটা ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্রের শিষ্যগণ জীবনের সকল বিভাগে, তত্ত্বসিদ্ধান্তে, ধর্ম্মসাধনে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে—সর্ব্বত্র, এই ব্যক্তিত্বাভিমানী সংজ্ঞানের অনন্যপ্রতিযোগী প্রাধান্য প্রতিফলিত করিতে যাইয়া, আধুনিক ভারত-সমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মমীমাংসায় ও ধর্ম্মসাধনে যে রাজসিক ভাব জাগাইয়াছিলেন, তাহাকে আরো প্রবল করিয়া তুলিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক বিবর্ত্তনে যে antithesisএর প্রতিষ্ঠা করেন, কেশবচন্দ্র তাহাকে আরো বিশদ ও তীব্র করিয়া তুলিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের যে স্থান ছিল; তার পরে, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ কেশবচন্দ্র যে স্থান অধিকার করেন; তৎপরবর্ত্তী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী সেই স্থানই প্রাপ্ত হ'ন। ইঁহারা তিন জনেই, একের পর অন্যে, ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে এবং ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া দেশের ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের চিন্তা ও ভাবকে স্বল্প বিস্তর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের অলৌকিক বাগ্মিপ্রতিভা গুণে তাঁহার প্রথম জীবনের উদার শিক্ষাদীক্ষার ভিতর দিয়া ব্রাহ্মসমাজের এ ভাব দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষভাবে ছড়াইয়া পড়ে। আধুনিক ভারতবর্ষের জ্ঞান ও কর্ম্মের বিকাশ সাধনে কেশবচন্দ্র যে পরিমাণে সাহায্য করিয়াছেন, দেবেন্দ্রনাথ বা শিবনাথ ইঁহাদের কেহ সে পরিমাণে সাহায্য করেন নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে যেরূপ মহর্ষির এবং কেশবচন্দ্রের, সেইরূপ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামও স্মরণীয়

হইয়া থাকিবে। শিবনাথ শাস্ত্রী কিছুতে মহর্ষির সাধননিষ্ঠা এবং কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভার দাবী করিতে পারেন না, সত্য। কিন্তু অন্য দিকে যে সকল বাহিরের অবস্থার ও ঘটনার শুভ যোগাযোগ ব্যতীত কি মহর্ষি কি কেশবচন্দ্র ইঁহাদের কেহই ব্রাহ্মসমাজে এবং ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া স্বদেশের বৃহত্তর কর্ম্মজীবনে ও ধর্ম্মজীবনে কখন কোন প্রভাব এবং প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিতেন না; শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনে সে সকল যোগাযোগও ঘটে নাই।

দেবেন্দ্রনাথ প্রিন্স্ দ্বারকানাথের পুত্র। পিতৃবিয়োগের পরে কিছু কাল দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত দারিদ্র্যের ভিতরে পড়িয়াছিলেন সত্য; কিন্তু তাঁহার সংযম ও সততাগুণে কালক্রমে পৈতৃক জমিদারী ঋণমুক্ত হইলে তিনি পুনরায় কলিকাতার ধনীসমাজের অগ্রণী দলভুক্ত হইয়া উঠেন এবং তখন হইতে তাঁহার অর্থেই ব্রাহ্মসমাজের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে আরম্ভ করে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সে সময়ে ব্রাহ্ম-সমাজের একমাত্র মুখপত্র ছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যেই ব্রাহ্মসমাজের তদানীন্তন মত ও আদর্শ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারিত হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের এবং আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের সাধনার ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা মহর্ষির অর্থে স্থাপিত ও পরিপুষ্ট হয়। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক প্রমুখ, ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য ও কর্ম্মচারীগণ সকলে তখন মহর্ষির অর্থানুকূল্যে ব্রাহ্মসমাজের বেতনভোগী বা বৃত্তিভোগী হইয়াছিলেন। আর এই ধনবল না থাকিলে শুদ্ধ আপনার চরিত্রের বা সাধনার বলে সে সময়ে মহর্ষি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজকে এতটা বাড়াইয়া তুলিতে পারিতেন না। আর ব্রাহ্মসমাজে কালক্রমে মহর্ষির যে একতন্ত্রপ্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁহার অর্থবলই ইহার একটা প্রধান কারণ ছিল, সন্দেহ নাই।

কেশবচন্দ্র মহর্ষির মত ধনী ছিলেন না বটে; কিন্তু রামকমল সেনের পৌত্র বলিয়া কলিকাতা-সমাজে তাঁহারও একটা বিশেষ আভিজাত্য-মর্য্যাদা ছিল। ফলতঃ সামাজিক হিসাবে, কলুটোলার সেনেরা বৈদ্য হইয়াও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদিগের অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলেন না। অন্য দিকে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিতে না করিতেই, কেশবচন্দ্রের দৈবী শক্তিশালিনী বাগ্মীপ্রতিভা দেশের উর্দ্ধতন ইংরেজ রাজপুরুষদিগের শুভদৃষ্টি লাভ করে। এখন যেমন, সেকালেও সেইরূপ, ইংরেজ রাজপুরুষগণ যাঁহাদিগকে বাড়াইয়া তুলিতেন, স্বদেশী সমাজেও আপনা হইতে তাঁহাদের প্রভাব বাড়িয়া যাইত। এই সকল বাহ্য যোগাযোগ ব্যতীত কেশবচন্দ্রের অলোকসামান্য প্রতিভাও এত সহজে ও এত অল্পকাল মধ্যে দেশের শিক্ষিত সমাজে এমন অনন্য-প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিত না।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর কেবল যে মহর্ষির সাধননিষ্ঠা বা কেশবচন্দ্রের দৈবীপ্রতিভা নাই তাহা নহে। যে সকল বাহ্য ঘটনা ও অবস্থার যোগাযোগের সাহায্যে মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র আপনাদিগের কর্ম্মজীবনকে গড়িয়া তুলেন, শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাগ্যে সেইরূপ কোনো যোগাযোগও ঘটে নাই। শিবনাথ দরিদ্রের সন্তান। দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ করেন। মহর্ষির ধন, কেশবচন্দ্রের বংশমর্য্যাদা—এ সকলের কিছু তাঁর ছিল না। আর এ সকল ছিল না বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিকাশ সাধনে মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র যে কাজটী করিতে পারেন নাই, শিবনাথ শাস্ত্রী তাহা করিয়াছেন।

ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজের শাসন, আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার প্রেরণা,—এ সকলে মিলিয়া আমাদের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাণে যে অভিনব অনধীনতা বা independence এর ভাব জাগাইয়া তুলে, তাহার ক্রমবিকাশের ইতিহাস আর ব্রাহ্মসমাজের বিগত পঞ্চাশ বৎসরের

ইতিহাস দুই এক বস্তু। এই অভিনব অনধীনতার আদর্শ ব্রাহ্মসমাজকে যতটা অধিকার করে, দেশের অপর কোন সম্প্রদায়কে ততটা অধিকার করিতে পারে নাই। অপরে আংশিকভাবে এই আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন। কেবল ব্রাহ্মসমাজই ইহাকে সম্পূর্ণভাবে জীবনের সকল বিভাগে গড়িয়া তুলিতে গিয়াছেন। আর ব্রাহ্মসমাজও যে প্রথমাবধি এই আদর্শকে একান্তভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন, এমন নহে। মহর্ষি ইহাকে যতটা অবলম্বন করেন, কেশবচন্দ্র তদপেক্ষা বেশী করিয়াছিলেন। আর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে এই অনধীনতার আদর্শ যতটা ফুটিয়া উঠে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তদপেক্ষা অধিক ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই অনধীনতা-মন্ত্রের সাধক এবং এই অনধীনতা-ধর্ম্মের বা 'Religion of Freedom'এর পুরোহিতরূপেই ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া, এ দেশের আধুনিক ধর্ম্মজীবনে ও কর্ম্মজীবনে, প্রথমে মহর্ষির, তার পরে কেশবচন্দ্রের এবং সর্ব্বশেষে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর শিক্ষার ও চরিত্রের যাহা কিছু প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজে প্রধানতঃ তত্ত্বমীমাংসায় ও ধর্ম্মসাধনে এই অনধীনতার আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কেশবচন্দ্র ইহাকে আরও একটু বিস্তৃততর ক্ষেত্রে,—পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে, প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু দেশের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের প্রাণে এই অনধীনতা-প্রবৃত্তি ক্রমে যতটা বলবতী ও বহুমুখী হইয়া উঠে, কেশবচন্দ্র বেশিদিন তাহার সঙ্গে আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ রক্ষা করিতে পারেন নাই এবং তাহার জন্য দেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরে তাঁহার পূর্ব্ব প্রভাব ক্রমশঃ নষ্ট হইতে আরম্ভ করে। এরূপ অবস্থায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম হয় এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই অনধীনতা আদর্শের সাধক ও প্রচারকরূপে নূতন সমাজের নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত হ'ন।

মহর্ষির প্রকৃতিগত রক্ষণশীলতা তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে এই নূতন অনধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিতে দেয় নাই। মহর্ষির এই রক্ষণশীলতার অন্তরালে, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, একটা সমাজানুগত্যের ভাব বিদ্যমান ছিল। আপনার তত্ত্বসিদ্ধান্তে মহর্ষি কতকটা য়ুরোপীয় আদর্শের যুক্তিবাদী ছিলেন, হয় ত এমনও বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ সামাজিক ব্যাপারে মহর্ষি সর্ব্বদাই স্বদেশের সমাজের সঙ্গে যথাসম্ভব যোগ রাখিয়া চলিতে চাহিয়াছিলেন। এইজন্য মহর্ষি অনেক সময় মর্য্যাদাহানির ভয়ে অযৌক্তিক সমাজবিধানও মানিয়া চলিতেন। মহর্ষির এই রক্ষণশীলতা কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার আভিজাত্যের আর কিয়ৎপরিমাণে তাঁহার প্রকৃতিগত স্বাদেশিকতার ফল ছিল।

কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীলতার মূলে হিন্দুর সমাজানুগত্য নহে, কিন্তু খৃষ্টীয় Non-Conformist Conscience এর নৈতিক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। এই Non-Conformist Conscience একটা অদ্ভুত বস্তু। আপনার ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের প্রতিষ্ঠায় ইহা সর্ব্বদাই অতি উদার হইয়া উঠে। কিন্তু অপরের স্বত্বস্বার্থের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হইলে, এই বস্তুই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অনুদার হইয়া পড়ে। ইহা ধর্ম্মের ও সত্যের দোহাই দিয়া একদিকে আপনাকে অপরের আনুগত্য হইতে মুক্ত করিতে চাহে। অন্যদিকে আপনার মতকে অপরের উপরে চাপাইয়া তাহাদের মুক্তি বিধানের জন্যই তাহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে হরণ করে। এইজন্য এই Non-Conformist Conscience যুগপৎ উদার ও রক্ষণশীল হয়। কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীলতা এই ধাতের ছিল। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে ব্রতী হন। কিন্তু মহর্ষির ভিতরকার ভাব ও আদর্শ সর্ব্বদা হিন্দু ছিল। কেশবচন্দ্রের ভিতরকার ভাব, বিশেষতঃ প্রথম জীবনে, বহুল পরিমাণে পিউরিটান খৃষ্টীয়ান

আদর্শের দ্বারা অভিভূত হইয়াছিল। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজকেও তিনি এইভাবেই গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে মহর্ষির হিন্দু ভাবাপন্ন কিংবা কেশবচন্দ্রের পিউরিট্যান ভাবাপন্ন রক্ষণশীলতা একেবারে ছিল না বলিলে চলে। খৃষ্টীয় জগতে পিউরিট্যান্‌গণ সংসারের সর্ব্ববিধ সম্বন্ধে একটা তীব্র পবিত্রতার আদর্শের অনুসরণ করেন। কেশবচন্দ্রও যৌবনাবধি এই আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মে ও সাধনায় যাহাকে শুদ্ধতা বলে, এই খৃষ্টীয়ানী পবিত্রতা ঠিক সে বস্তু নয়। আমাদের দেহশুদ্ধি বা ভূতশুদ্ধি এবং চিত্তশুদ্ধির কথা আধুনিক খৃষ্টীয় সাধনায় পাওয়া যায় না। কেশবচন্দ্র যে পবিত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তাহা ইংরেজি পিউরিটি, সংস্কৃত শুদ্ধতা নহে। এই পিউরিটি রক্ষা করিবার আত্যন্তিক আগ্রহ হইতে কেশবচন্দ্রের রক্ষণশীলতার উৎপত্তি হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনে ও চরিত্রে অতি কঠোর সংযমের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে মহর্ষির স্বাভাবিক সমাজানুগতা কিংবা কেবশচন্দ্রের পিউরিটি-প্রবণতা কখন ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়ের মধ্যেই একটা অতি প্রবল প্রকৃতি-গত আস্তিক্য-বুদ্ধি ছিল। আর নিজেদের প্রকৃতির এই আভ্যন্তরীণ ধর্ম্ম-প্রবণতার বা বিশ্বাস-প্রবণতার গুণে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ আশ্রয় করিয়াও ইঁহারা সংশয়বাদী হইয়া উঠেন নাই। ইঁহাদিগের অটল ঈশ্বর-বিশ্বাস আপন আপন প্রকৃতির অন্তঃস্থল হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যুক্তিতর্কের দ্বারা স্থাপিত হয় নাই। ফলতঃ এই প্রকৃতিগত ঈশ্বর-বিশ্বাসকেই মহর্ষি আত্মপ্রত্যয় বলিয়াছেন। আপনার ধর্ম্মসিদ্ধান্তে কেশবচন্দ্র এই প্রকৃতিগত আস্তিক্যবুদ্ধিকে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর খৃষ্টীয়ান দর্শনের পরিভাষায় ইন্‌টুইসন্ (intuition) নামে

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। মহর্ষির আত্মপ্রত্যয় কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তের ইন্‌টুইসন্। আর এ দু'ই মূলতঃ ও বস্তুতঃ তাঁহাদের নিজেদের প্রকৃতিগত আস্তিক্য-বুদ্ধির নামান্তর মাত্র। এই প্রকৃতিগত আস্তিক্য-বুদ্ধি ছিল বলিয়া মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র আত্মপ্রত্যয় বা ইন্‌টুইসন্ রূপ চঞ্চল ভিত্তির উপরেও আপনাদিগের এমন অটল ধর্ম্ম-বিশ্বাসকে গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

কিন্তু সংশয়-প্রবণ য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাবে যে সকল লোক ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পড়েন, তাঁহাদের অনেকের এই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সাধন-সম্পদ ছিল না। বিজয়কৃষ্ণ এবং অঘোরনাথ প্রমুখ দুই চারিজন ধর্ম্মপ্রাণ সাধুপুরুষ ভিন্ন ব্রাহ্মমাজের প্রচারক এবং উপাসকগণের মধ্যে প্রায় কাহারো প্রকৃতির ভিতরে মহর্ষির বা কেশবচন্দ্রের ন্যায় বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি ছিল না। সুতরাং ইঁহারা আত্ম-প্রতিষ্ঠ পরম-তত্ত্বকে লৌকিক তর্কযুক্তির উপরে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হন। ইঁহাদের প্রায় সকলেই কেশবচন্দ্রের বাগ্মীপ্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সকল যুক্তিবাদী ব্রাহ্মগণের মধ্যে কেহ কেহ কেশবচন্দ্রের অলোকসামান্য মনীষা প্রভাবে অভিভূত হইয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমান হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকে একমাত্র প্রত্যক্ষ গুরুরূপে বরণ করিয়া একান্তভাবে তাঁহার আনুগত্য গ্রহণ করেন। অতি-সংশয়বাদ এই ভাবে অনেক সময় অতি-বিশ্বাসে যাইয়া পড়ে। এই অতিসংশয়-বাদেরই ইংরেজি নাম Scepticism এবং ইংরেজিতে যাহাকে Credulity বলে বাংলায় তাহাকে অতি-বিশ্বাস বলা যাইতে পারে। কোন প্রকারের অতীন্দ্রিয় ও অপ্রত্যক্ষ তত্ত্বে যাঁহারা কোন মতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না, তাঁহারাই sceptic বা অতি-সংশয়বাদী। আর এই অতিসংশয়-বাদের তাড়নাতে এই সকল লোকে অনেক সময় এমন

সকল বিষয়ে আগ্রহাতিশয় সহকারে বিশ্বাস স্থাপন করেন, যাহা কোন যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না ও হইতে পারে না। মানবপ্রকৃতির অদ্ভুত জটিলতা নিবন্ধন অনেক সময় এইরূপে অতি-সংশয়বাদ বা scepticism হইতে অতি-বিশ্বাসের বা credulity-র উৎপত্তি হয়। কেশবচন্দ্রের অনুচরগণের মধ্যে মূলে যাঁহারা অতি-সংশয়বাদী ছিলেন তাঁহাদের একদল কেশবচন্দ্রের দৈবী প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া অতি-বিশ্বাসভরে তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষরূপে বরণ করেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক আনুগত্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার মত ও উপদেশানুসারে আপনাদিগের ধর্ম্ম-জীবন ও কর্ম্ম-জীবনকে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। আর একদল লোক এই অতি-বিশ্বাসকে বর্জ্জন এবং কেশবচন্দ্রের মহাপুরুষত্বের দাবীকে উপেক্ষা করিয়া, আপনাদিগের স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ তর্কযুক্তির সাহায্যে পরমতত্ত্বকে ও ধর্ম্মসাধনাকে নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হন। এইরূপে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পর হইতে তাহার ভিতরে দুইটি পরস্পর-বিরোধী ভাব ও আদর্শ ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে।

প্রথমে মহর্ষি এবং তারপরে কেশবচন্দ্র আপনার প্রথম যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে যে পথে পরিচালিত করেন, তাহাতে এরূপ বিরোধ একরূপ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। মহর্ষির সময় হইতে ব্রাহ্মসমাজ অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরে গড়িয়া উঠে। আর বস্তুতঃ সেই জন্য কেশবচন্দ্রকে শেষজীবনে "নববিধানের" প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। কারণ এই যুক্তিবাদ বা Rationalism, প্রাকৃত বুদ্ধির প্রেরণায়, লৌকিক ন্যায়ের প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া যে পরমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করে, তাহাকে স্বচ্ছন্দে ইংরেজিতে Deism বলা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে Theism বলা যায় কি না

সন্দেহ। Deism আর Theismএ পার্থক্য এই যে, একেতে ঈশ্বর-তত্ত্বকে বিশ্ব শক্তি বা বিশ্ববিধান রূপে এবং অপরে শক্তিমান পরমপুরুষ বা বিশ্ববিধাতা ভগবান রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। শিবনাথ শাস্ত্রীর কথায় Theismএর ঈশ্বর ব্যক্তি, Deismএর ঈশ্বর শক্তি। আর প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ঈশ্বরকে শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করে, ব্যক্তি বা বিধাতারূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। মহর্ষির ঈশ্বর কেবল শক্তি মাত্র ছিলেন না, সত্য। কিন্তু মহর্ষির ঈশ্বরানুভূতি প্রকৃতপক্ষে তাঁর ব্রাহ্মতত্ত্বের উপরে গড়িয়া উঠে নাই। ইহা তাঁর ভাবাঙ্গ-সাধনের ফল। এই ভাবাঙ্গ সাধনে মহর্ষি হাফেজ প্রভৃতি মোহম্মদীয় ভক্তগণের পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, লৌকিক ন্যায় ও য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ-প্রতিষ্ঠিত মামুলী ব্রাহ্মধর্ম্মের পন্থা অনুসরণ করেন নাই। এই গভীর ভাবাঙ্গসাধনের গুণেই মহর্ষির ব্রাহ্মধর্ম্ম Deism হয় নাই, কিন্তু অতি উচ্চদরের Theismরূপে তাঁর জীবনে ও চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের ঈশ্বরও শক্তি মাত্র ছিলেন না। কারণ কেশবচন্দ্রের প্রখর সংজ্ঞানের বা conscienceএর প্রেরণায় প্রথম হইতে তাঁর ঈশ্বরতত্ত্বে একটা উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। মহর্ষি ভাবাঙ্গ-সাধনের ভিতর দিয়া, মোহম্মদীয় ভক্তগণের দৃষ্টান্ত ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে, তাঁহার নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। কেশবচন্দ্র প্রথম যৌবনে, তাঁর গভীর পাপ-বোধের বা Ethical Consciousnessএর ভিতর দিয়া, খৃষ্টীয়ান সাধকগণের দৃষ্টান্তে ও শিক্ষায় আপনার প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মসমাজে ইঁহারা উভয়েই যে তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহার উপরে Deismএরই প্রতিষ্ঠা হয়; Theismএর প্রতিষ্ঠা হয় না। কিন্তু এ সত্ত্বেও মহর্ষির এবং কেশবচন্দ্রের নিজেদের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরতত্ত্ব যে Theism হইয়া উঠে, ইঁহাদের প্রকৃতির ও সাধনার বিশেষত্বই ইহার প্রধান বা একমাত্র কারণ।

ফলতঃ শুদ্ধ যুক্তিবাদের উপরে কোন প্রকারের গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনকে গড়িয়া তুলা যে অসম্ভব, মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই ইহা ক্রমে অনুভব করিয়াছিলেন। এইজন্য ইঁহারা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই যুক্তিবাদকে ধরিয়া থাকিতে পারেন নাই। ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া সাধক অনুকূল অবস্থাধীনে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন এবং ধর্ম্মবস্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রাকৃত-বিচার-বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় না, কিন্তু এই সকল ঈশ্বরানুপ্রাণিত সাধু মহাজনের সাক্ষ্যের উপরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে,—মহর্ষি ও কেশবচন্দ্র উভয়েই জীবনের শেষভাগে এই মত প্রচার করেন। কিন্তু যে ঈশ্বরানুপ্রাণনের উপরে মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র দুজনেই পরে আপনাদিগের উপদিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মসিদ্ধান্তের মূলগত যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিত্বাভিমান কিছুতে সে ঈশ্বরানুপ্রাণনের মতকে সমর্থন করে না।

যে আধুনিক য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপর ব্রাহ্ম সমাজের তত্ত্বসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাতে কোন প্রকারের অনন্য-সাধারণত্বের বা অপ্রাকৃতত্বের দাবী গ্রাহ্য হয় না। এই যুক্তিবাদ ধর্ম্মসাধনে শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে, কিন্তু সদ্‌গুরুর প্রতিষ্ঠা সহ্য করিতে পারে না। সমাজ গঠনে ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই যুক্তিবাদ কেবল গণতন্ত্র ব্যবস্থাকে একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ও ধর্ম্মসঙ্গত ব্যবস্থা বলিয়া গ্রহণ করে; কিন্তু সমাজপতি বা রাজা বা রাষ্ট্রনায়কের আধিপত্য গ্রাহ্য করে না। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ এই যুক্তিবাদের উপরে প্রতিষ্ঠিত। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মসিদ্ধান্ত প্রথমে এই যুক্তিবাদকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠীত হয়, সত্য; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তাঁর ধর্ম্মপ্রবণ বুদ্ধি প্রথমাবধি এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শকে অল্প-বিস্তর ভীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করে। এই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার

নামে য়ুরোপের ইতিহাসে যে পাশবলীলার অভিনয় হইয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া, যাহাতে এই আদর্শ ব্রাহ্মসমাজে একান্ত প্রতিষ্ঠালাভ না করে, কেশবচন্দ্র সর্ব্বদা প্রাণপণে তার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অতীত হইতে না হইতে য়ুরোপীয় মনীষীগণের মধ্যেও কেহ কেহ ফরাসী-বিপ্লবের সামাজিক সিদ্ধান্তের অসঙ্গতি ও অপূর্ণতা প্রত্যক্ষ করিতে আরম্ভ করেন। ফরাসী বিপ্লব যে সাম্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়াছিল, তাহাতে সমাজে ব্যক্তিগত স্বত্বস্বার্থের একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাই জাগাইয়া তুলে, কিন্তু এ সকলের চিরন্তন বিরোধ নিষ্পত্তির কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই। ফরাসী বিপ্লব স্বাধীনতার নামে একটা ঐকান্তিক অনধীনতার ভাবকে জাগাইয়া জনসমাজকে বিশৃঙ্খল ও বিচ্ছিন্ন করিতে থাকে, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে তার সমাজের ও সেই সমাজান্তর্গত অপরাপর ব্যক্তির যে নিগূঢ় অঙ্গাঙ্গী যোগ রহিয়াছে, তাহাকে ফুটাইয়া তুলিয়া সমাজের ঘন-নিবিষ্টতা সাধনের কোন পন্থা প্রতিষ্ঠা করিতে পারে নাই। আধুনিক যুগে প্রাচীনকে ভাঙ্গাই ফরাসী বিপ্লবের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম ছিল, এই বিপ্লব সেই কর্ম্ম সাধন করিয়া যায়; কিন্তু নবযুগের আদর্শের উপযোগী করিয়া জনসমাজকে নূতন প্রেমের ও বিশ্বজনীনতার উপরে গড়িয়া তোলা তার কাজ ছিল না, সে কাজ ফরাসী-বিপ্লব করিতেও পারে নাই। ফরাসী-বিপ্লবের নিকটে আধুনিক সভ্যতা ও সাধনা যে অশোধনীয় ঋণজালে আবদ্ধ তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াও, এইজন্য ইতালীয় মনীষী ম্যাজিনী (১৮৩৫) ফরাসী বিপ্লবের অধিনায়কগণের সাম্য মৈত্রী-স্বাধীনতার সিদ্ধান্তকে যথাযোগ্যভাবে সংশোধন করিয়া লইয়া, বিশুদ্ধতর আস্তিক্যবুদ্ধি-প্রতিষ্ঠিত হিউম্যানিটীর (Humanity) উপরে, আপনার স্বদেশচর্য্যা বা Nationalism কে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। এই উন্নত আদর্শের উপরেই ম্যাজিনী মাতৃভূমির উদ্ধারকল্পে যুন ইতালীয়

সমাজের বা Young Italy Associationএর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কিছুকাল পরে ইংরেজ মনীষী কার্লাইল (Carlyle) Hero Worship নামক প্রবন্ধে এক নূতন মহাপুরুষবাদের প্রতিষ্ঠা করিয়া ফরাসী বিপ্লবের সাম্যবাদের মূল ভিত্তিকে একেবারে ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করেন।

ব্রাহ্মসমাজকে এই বিপ্লবাত্মক যুক্তিবাদ ও সাম্যবাদের প্রভাব হইতে রক্ষা করিবার জন্য কেশবচন্দ্র আগ্রহাতিশয় সহকারে কার্লাইলের মহা-পুরুষবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু কার্লাইলের মহাপুরুষবাদেও প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হয় না দেখিয়া, তিনি ইহার সঙ্গে ইহুদীয় সাধনার ঈশ্বরতন্ত্রের বা Theocracyর মতকে যুক্ত করিয়া দিয়া এক নূতন প্রেরিত-মহাপুরুষবাদের প্রতিষ্ঠায় প্রবৃত্ত হ'ন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের জন্মের কিছুকাল পরেই কেশবচন্দ্র মহাপুরুষ বা Great Men সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতাতে তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই নূতন সিদ্ধান্ত অভিব্যক্ত করেন। এইখানেই প্রকৃতপক্ষে, ব্রাহ্মসমাজের কৃতবিদ্য যুক্তিবাদী যুবকদলের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের ও তাঁর অনুগত প্রচারকগণের বিরোধ আরম্ভ হয়।

শিবনাথের চরিত্র

এই বিরোধের সূত্রপাত অবধি শিবনাথ কেশবচন্দ্রের প্রতিপক্ষীয় দলের মুখপাত্র ও অগ্রণী হইয়া উঠিতে আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ না করিয়া, শিক্ষার্থী অবস্থাতেই, তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাঁর সমসাময়িক কৃতবিদ্য যুবকগণ যেরূপভাবে কেশব-চন্দ্রের অলৌকিক প্রতিভার দ্বারা মুগ্ধ হইয়া আত্যন্তিক শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিতেছিলেন, শিবনাথ সেরূপভাবে ব্রাহ্ম-সমাজে আসিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। ফলতঃ যৌবনাবধি শিবনাথের

মধ্যে এই আত্যন্তিক শ্রদ্ধার ভাব অল্প ছিল। শিবনাথের পিতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত হইয়াও অতিশয় বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। আর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধির সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার যোগ এ জগতে বিরল। বিশেষতঃ যেখানে এই তীক্ষ্ণবুদ্ধির সঙ্গে সুরসিকতা বিদ্যমান থাকে, সেখানে শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিবার অবসর প্রায় পায় না। যেমন তাঁর পিতৃচরিত্রে, সেইরূপ শিবনাথের নিজের প্রকৃতিতেও একদিকে প্রখর ধীশক্তি ও অন্যদিকে উচ্ছ্বসিত রসিকতা—এই দুইই পাওয়া যায়। সুতরাং প্রথম যৌবনে তাঁর বিচারশক্তি ও বিদ্রূপ-প্রবৃত্তি যতটা ফুটিয়াছিল, শ্রদ্ধাশীলতা যে ততটা ফুটিয়া উঠে নাই, ইহা বিচিত্র নহে। তাঁর সেকালের প্রবন্ধাদিও ইহার সাক্ষ্য দান করে। 'সোমপ্রকাশ'-সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শিবনাথের মাতুল ছিলেন। এই সূত্রে ছাত্রাবস্থা হইতে 'সোমপ্রকাশের' সঙ্গে তাঁরও একটা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। আর সে সময়ে 'সোমপ্রকাশে' শিবনাথের যে সকল রচনা প্রকাশিত হয়, তাহার মধ্যে তাঁর এই যুক্তিপ্রবণতার ও বিদ্রূপশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'—

"হইতাম যদি আমি যমুনার জল,

হে প্রাণবল্লভ"

প্রকাশিত হইলে, 'সোমপ্রকাশে' শিবনাথ তাহার অনুকরণে যে বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখেন, তাহাতে তাঁহার উজ্জ্বল কবিপ্রতিভা ও বিদ্রূপাশক্তির প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যরথীগণ তাহা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ফলতঃ তাঁর আপনার স্বরূপে শিবনাথ তত্ত্বজ্ঞানী নহেন, ভগবদ্‌ভক্ত নহেন, চিন্তাশীল দার্শনিক নহেন, মুমুক্ষু সাধকও নহেন, কিন্তু অসাধারণ শব্দসম্পদ্‌শালী সাহিত্যিক ও সুরসিক কবি। এক সময়ে শব্দযোজনার কুশলতায় শিবনাথ বাঙ্গালী সাহিত্যিকদিগের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান

অধিকার করিয়াছিলেন। কোন কোন দিক্ দিয়া বিচার করিলে এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ আর কেহ ছিলেন কি না সন্দেহ। প্রথমে শক্তিশালী লেখক ও সুরসিক কবিরূপেই বাঙ্গলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী সমাজে শিবনাথের প্রভাব ও প্রতিপত্তি হয়। এমন কি, পরে ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃপদ পাইয়া স্বদেশের ধর্মচিন্তায় ও কর্মজীবনে তিনি যা' কিছু প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, আপনার স্বাভাবিকী সাহিত্যশক্তি ও কবিপ্রতিভার সেবায় একান্তভাবে আত্মোৎসর্গ করিলে, বাঙ্গালার আধুনিক সাহিত্য ও সমাজ জীবনের ইতিহাসে তদপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্থান পাইতেন, সন্দেহ নাই। আর ব্রাহ্মসমাজেও তিনি যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে তাঁর বাগ্মিতাশক্তি ও সাহিত্য-সম্পদের উপরে গড়িয়া উঠিয়াছে, কোন প্রকারের অনন্য-সাধারণ সাধনসম্পত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

আর ইহার প্রধান কারণ এই যে, কুচবিহার বিবাহোপলক্ষে যাঁহারা কেশবচন্দ্রের অধিনেতৃত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া ব্রাহ্মসমাজে আবার একটা নূতন দল গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হ'ন, তাঁহাদের অনেকে তখন পর্য্যন্ত জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের উপরেই বিশেষভাবে আপনাদিগের নূতন ধর্ম্মজীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বিজয়কৃষ্ণও এই দলে যোগদান করেন, সত্য; কিন্তু একদিকে কেশবচন্দ্রের আপনার শিক্ষার সঙ্গে তাঁহার এই কার্য্যের একান্ত অসঙ্গতি এবং অন্যদিকে এই বিবাহ সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের অপর প্রচারকগণ কেশবচন্দ্রের পক্ষ-সমর্থনের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করেন, তাহার অন্তর্নিহিত ওকালতী-বুদ্ধিসুলভ সত্যগোপনের এবং অসত্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, এই দুই মিলিয়া বিজয়কৃষ্ণের ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা ও ধর্ম্মনিষ্ঠাতে গুরুতর আঘাত করিয়াছিল বলিয়াই তিনি কেশবচন্দ্রকে পরিত্যাগ করেন। আর ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মনিষ্ঠ, ভক্তিমান্ ও রক্ষণশীল সভ্যদিগকে আকৃষ্ট করিবার

জন্য নূতন সমাজের প্রতিষ্ঠাতাগণ বিজয়কৃষ্ণকে আচার্য্যপদে বরণ করেন, নতুবা প্রকৃতপক্ষে তিনি কখন ইঁহাদিগের ধর্ম্মজীবনের বা কর্ম্মজীবনের অধিনেতৃত্ব লাভ করেন নাই। ফলতঃ নূতন সমাজের কর্ত্তৃপক্ষেরা ভক্ত বিজয়কৃষ্ণের যশের সাহায্যে আপনাদিগের বিদ্রোহীদলের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে যতটা উৎসুক ছিলেন তাঁহার সাধু চরিত্রের এবং অলোকসামান্য আধ্যাত্মিক সম্পদের আশ্রয়ে নিজেদের ধর্ম্মজীবনকে গড়িয়া তুলিবার জন্য ততটা আগ্রহশীল ছিলেন না। এই কারণে বিজয়কৃষ্ণের সাধু চরিত্রের প্রভাব সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে বদ্ধমূল হইবার অবসর পায় নাই এবং তাহার ফলে সমাজের নেতৃবর্গ কিছুদিন পরে অত্যন্ত সরাসরিভাবে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে নিজেদের সমাজের সর্ব্বপ্রকারের যোগ ছেদন করিতে পারিয়াছিলেন। আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া বিশেষ সাধনসম্পদের অধিকারী না হইয়াও কেবল আপনার বিদ্যাবুদ্ধি ও বাগ্মিতাগুণে শিবনাথ তাহার অধিনায়কত্ব লাভ করেন।

ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়াও অনেকে এই যুক্তিবাদের অপূর্ণতা ও অসঙ্গতি উপলব্ধি করিয়া, আপনাদিগের তত্ত্বসিদ্ধান্তে ও ধর্ম্মসাধনে এই যুক্তিবাদকে স্বল্প-বিস্তর অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। কেশবচন্দ্র আপনিও তাহা করেন। তাঁহার অনুগত শিষ্যমণ্ডলীও এই যুক্তিমার্গ বর্জ্জন করিয়া এক প্রকারের ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু শিবনাথ প্রথম যৌবনে যে সকল সিদ্ধান্তকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন পরিবর্ত্তন বা সংশোধন করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্যে এমন একটা যুক্তিপ্রবণতা আছে, যাহাকে যতই ছাড়াইতে ইচ্ছা করুন না কেন, এ পর্য্যন্ত কিছুতে ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। এই যুক্তিপ্রবণতা মূলতঃ ইংরেজিতে

যাহাকে Scepticism বা অতি-সন্দেহবাদ বলে, তাহার রূপান্তর মাত্র। আর শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তৃতা ও উপদেশাদিতে সর্ব্বদাই যেন এই বস্তুটী লুকাইয়া থাকে। তিনি অনেক সময় আস্তিক্য-বিরোধী সিদ্ধান্ত সকল খণ্ডন করিবার চেষ্টা করেন, আর তখন প্রথমে যথারীতি সে সকল সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যাও করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁর এই সকল বক্তৃতায় ও উপদেশে এ সকল বিরোধী সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা যতটা বিশদ ও যুক্তিপ্রতিষ্ঠ হয়, তিনি যে ভাবে এ সকলের খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান, তাহা সেরূপ বিশদ এবং সদ্‌যুক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়া উঠে না। এই কারণে তাঁর ধর্ম্মোপদেশে যুক্তিবাদী শ্রোতা বা পাঠকের প্রাণে ধর্ম্মের মূল ভিত্তিগুলিকে যে পরিমাণে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দেয়, সে পরিমাণে আবার তাহাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে না। আর এই সাংঘাতিক অপূর্ণতা সত্ত্বেও তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশাদিতে যে কতকটা ধর্ম্মের প্রেরণা জাগাইয়া তুলে ইহা তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতাশক্তি এবং মায়াময়ী কবিকল্পনার ফল।

কিন্তু ইহাতে শাস্ত্রী মহাশয়ের কোন গৌরবের হানি হয় না। তত্ত্ব-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা কিম্বা ভক্তিপন্থা প্রদর্শন করিবার জন্য বিধাতাপুরুষ তাঁহাকে সৃষ্টি করেন নাই; করিলে তাঁর অন্তঃপ্রকৃতি অন্য ছাঁচে গঠিত হইত। প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের কতকগুলি পূর্ব্ববৃত্ত সাধন আছে। আর মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্রের প্রথম জীবনের সংস্কার-চেষ্টা কতকটা সঙ্কুচিত হইয়া আসিলে, শাস্ত্রী মহাশয়ই এই সকল পূর্ব্ববৃত্ত সাধনে ব্রাহ্মসমাজের এবং কিয়ৎপরিমাণে দেশের সাধারণ শিক্ষিত ও শিক্ষার্থী যুবকদলের গুরু হইয়া, তাহাদের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনকে ফুটাইয়া তুলিবার সাহায্য করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকারের সংস্কার বর্জ্জন করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলে, সেই শুদ্ধ চিত্তেই কেবল পরমতত্ত্বের সার্থক অনুশীলন সম্ভব হয়। প্রথমে সন্দেহ, পরে বিচারযুক্তি, তার পরে সর্ব্বশেষে, এই

বিচারযুক্তির ফলে সত্য প্রতিষ্ঠা হইলে, সন্দেহের একান্ত নিরসন হইয়া, প্রকৃত শ্রদ্ধা বা আস্তিক্য-বুদ্ধির সঞ্চার,—এই ভাবে প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের পূর্ব্ববৃত্ত সাধন সমাপ্ত হইয়া থাকে। এই সন্দেহ এজন্য ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপান ও মূল ভিত্তি। আর একালের অনেক বাঙ্গালী ও ভারতবাসী শিবনাথ শাস্ত্রীর শিক্ষাদীক্ষার প্রেরণায় নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সর্ব্ববিধ পূর্ব্বসংস্কার বর্জ্জিত হইয়া, সন্দেহ, বিচার, প্রভৃতির সাহায্যে ক্রমে গভীর আস্তিক্যবুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অনেকে তাঁর নায়কত্বে "না" এর পথ বাহিয়া গিয়া, পরে "হাঁ" এর রাজ্যে যাইয়া পৌঁছিয়াছেন। আর ইঁহারা ব্রাহ্মসমাজে থাকিয়া বা তাহার বাহিরে যাইয়া, নিজ নিজ সাধনশক্তির দ্বারা যে দিকে ও যে পরিমাণে দেশের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন বা তুলিতেছেন, তার জন্য এদেশের বর্ত্তমান সাধনা কিয়ৎপরিমাণে শিবনাথ শাস্ত্রীর নিকটে ঋণী রহিয়াছে, সন্দেহ নাই।

মহর্ষির সময়াবধি ব্রাহ্মসমাজ যে ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার বা 'Freedom'এর আদর্শকে ধরিয়া, আমাদিগের আধুনিক আধ্যাত্মিক জীবন ও সামাজিক-জীবনকে গড়িয়া তুলিবার সংকল্প করিয়া, দেশের বর্ত্তমান ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন স্রোতের মুখে যাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, মহর্ষি কিংবা তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজ, কেশবচন্দ্র কিংবা তাঁর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ, ইঁহাদের কেহই শেষ পর্য্যন্ত সেই সংকল্পের উপরে দৃঢ়ব্রত হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই; পারিলে, ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া, দেশের বর্ত্তমান ধর্ম্মমীমাংসায় ও কর্ম্মজীবনে, শিবনাথ শাস্ত্রী কিংবা তাঁহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কোন স্থান হইত না। কিন্তু মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই, প্রথমে যে যুক্তি ও বিচার অবলম্বন করিয়া দেশ-প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্মকে বর্জ্জন করেন, সেই যুক্তি ও বিচারের উপরে, সর্ব্ববিধ ফলাফল ভাবনা-বিরহিত হইয়া, বিশ্বাস বা সাহস ভরে, শেষ

পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন নাই। ইঁহারা দুইজনেই স্বদেশের ধর্ম্মের ও সমাজের সনাতন ভিত্তিকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতেই, তাহার ফলে নিজেদের নূতন সমাজে ধর্ম্মের নামে নাস্তিক্যবুদ্ধি ও স্বাধীনতার অজুহাতে স্বেচ্ছাতন্ত্র ও অরাজকতার অভ্যুদয় দেখিয়া, একান্ত ভীত হইয়া, অযৌক্তিক ও কতকটা অসঙ্গত উপায়ে স্বকৃতকর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামের প্রতিরোধ করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। মহর্ষির ভাঙার ভিতরে—তাঁর প্রকৃতিতে হিন্দু আস্তিক্যবুদ্ধি ও রক্ষণশীলতার গুণে, কিছুটা সংযম বিদ্যমান ছিল। সুতরাং ইনি যে উপায়ে আপনার কর্ম্মের মন্দ ফলকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করেন, তার মধ্যেও কতকটা সংযত ভাব ছিল। কেশবচন্দ্রের ভাঙার অন্তরালে হিন্দুর আস্তিক্যবুদ্ধি বা রক্ষণশীলতা ছিল না, কিন্তু খৃষ্টীয়ান নন্ কনফর্ম্মিষ্ট-স্বভাব সুলভ অহংবুদ্ধি ও উগ্র সংস্কার-চেষ্টা বিদ্যমান ছিল। সুতরাং তাঁর ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-চেষ্টার অন্তরালে সেরূপ কোন সংযত ও সশ্রদ্ধ ভাব ছিল না বলিয়া, তিনি যে উপায়ে স্বকৃতকর্ম্মের অপরিহার্য্য পরিণামের প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাও উগ্র ও অসংযত হইয়া উঠে। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই ক্রমে বিশেষ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী করিয়া, আপনাদিগের উপদিষ্ট ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটা বিশেষ ও অতিপ্রাকৃত প্রামাণ্য-মর্য্যাদা দান করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মহর্ষির এই দাবীর অন্তরালে একটা সংযত ও সশ্রদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নিতান্ত অন্তরঙ্গ ও অনুগত শিষ্যগণের নিকটেই প্রসঙ্গক্রমে তিনি এই দাবীর উল্লেখ করিয়াছেন, জনসাধারণের মধ্যে কখনও প্রকাশ্যভাবে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে যান নাই। কেশবচন্দ্র অন্যদিকে কেবল এদেশে নয়, সমগ্র জগতের সমক্ষে তাঁর অনন্যসাধারণ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী প্রকাশ করিয়াছেন এবং মানবেতিহাসের প্রথমাবধি যুগে যুগে ঈশ্বরপ্রেরিত মহাজনেরা এই ঈশ্বরানুপ্রাণতার সাহায্যে যেমন যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত

করিয়াছেন, তিনি ও তাঁহার "প্রেরিত-মণ্ডলী" সেইরূপ বর্ত্তমান যুগের "নববিধানকে" প্রতিষ্ঠিত করিতে আসিয়াছেন,—নানাদিকে ও নানাভাবে এই মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন শাস্ত্র ও পুরাগত গুরুপরম্পরাশ্রিত সাধনমার্গ সমূহ অভ্রান্ত নয় বলিয়া তাহাদের প্রামাণ্য-মর্য্যাদা নষ্ট করিয়া, নিজেদের উপদেশ ও সিদ্ধান্তের জন্য সেই মর্য্যাদার দাবী করিলে, লোকে তাহা শুনিবে কেন? মহর্ষির এবং কেশবচন্দ্রের এই অনন্যসাধারণ ঈশ্বরানুপ্রাণতার দাবী ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন সভ্য স্বীকার করিলেও সাধারণে এ পর্য্যন্ত স্বীকৃত হয় নাই; কখনও যে হইবে, তারও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং দেশের ধর্ম্মজীবনে ও কর্ম্মজীবনে ব্রাহ্মসমাজ যে জটিল সমস্যাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ তার কোন মীমাংসার পথ দেখাইতে পারেন নাই।

তবে শিবনাথ শাস্ত্রী এবং তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যে পরিমাণে এই সমস্যাকে মীমাংসার দিকে লইয়া গিয়াছেন, মহর্ষি কিংবা কেশবচন্দ্র যে তাহাও পারেন নাই—জনসমাজের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের প্রাচীন অভিজ্ঞতার দিক্ দিয়া বিচার করিলে, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব হইবে। ফল যেমন পরিপূর্ণ পক্কতা প্রাপ্ত হইলে, আপনিই গাছ হইতে পড়িয়া গিয়া, আবার নূতন ফসলের সূত্রপাত করে; সেইরূপ যে সকল চিন্তা, ভাব ও আদর্শের প্রেরণায় সমাজমধ্যে কোনও জটিল যুগসমস্যার উৎপত্তি হয়, সেই সকল চিন্তা, ভাব ও আদর্শ নিঃশেষরূপে ফুটিয়া উঠিয়া আপনারাই নিজেদের ভিতরকার সত্য ও অসত্য, যুক্তি ও যুক্ত্যাভাস, কল্যাণ ও অকল্যাণকে বিশদ করিয়া তুলে এবং তখনই প্রাচীন ও প্রচলিতের সঙ্গে নূতন ও অপ্রচলিতের একটা উচ্চতর সামঞ্জস্যের ভূমি প্রকাশিত হইয়া, সেই যুগ-সমস্যার প্রকৃত মীমাংসার পথটি দেখাইয়া দেয়। এই সকল চিন্তা, ভাব ও আদর্শ আপনাদের যথাযথ পরিণতি

লাভ করিবার পূর্ব্বে, কোনও কোনও দিকে তাহাদের অসঙ্গতি বা অমঙ্গল ফল দেখিয়া, যিনিই অকালে কোন দুরূহ সমস্যার মীমাংসা করিতে যাইবেন, তাঁহার সে মীমাংসা অপূর্ণ বা অযৌক্তিক হইবে, ইহা একরূপ অনিবার্য্য। প্রশ্নটা পরিষ্কাররূপে অভিব্যক্ত হইলেই তো তার সদুত্তর সম্ভব হয়। ইংরেজি শিক্ষা, ইংরেজের শাসন, য়ুরোপীয় সাধনার সংস্পর্শ, এই সকলে মিলিয়া আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মজীবনে ও সমাজজীবনে যে সকল প্রশ্ন জাগাইয়া তুলে, মহর্ষির বা কেশবচন্দ্রের কর্ম্মচেষ্টা সাঙ্গ হইবার পূর্ব্বে, তার সম্যক্ ও সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি হয় নাই। সুতরাং মহর্ষি বা কেশবচন্দ্র যে এই জটিল প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেন নাই, ইহা কিছু বিচিত্র নহে। ফলতঃ কেবল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণই যে ইহার সদুত্তর দিবার নিষ্ফল চেষ্টা করেন, তাহা নহে। একদিকে যেমন কেশবচন্দ্র, অন্যদিকে সেরূপ দয়ানন্দ স্বামীর আর্য্যসমাজ, অল্‌কট্—ব্লাভাট্‌স্কীর থিওসফী সমাজ, এবং পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি-প্রমুখ তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থান-কারীগণ,—ইঁহারা সকলেই আধুনিক য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ-প্রতিষ্ঠিত সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শে আমাদের নব্যশিক্ষিত সমাজে এবং তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষায় ও আচার আচরণে কিয়ৎপরিমাণে সাধারণ জনগণের ভিতরেও যে যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা আনিয়া ফেলিতেছিল, তাহা দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং আপন আপন সিদ্ধান্ত ও শক্তি অনুসারে এই অভিনব বিপ্লবস্রোতের প্রতিরোধ করিতে প্রবৃত্ত হন। আর বিগত পঁয়ত্রিশ বৎসরের ইতিহাস এই সমুদায় চেষ্টার নিষ্ফলতার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

আর এই নিষ্ফলতার প্রধান কারণ এই যে, একদিকে আধুনিক য়ুরোপীয় সাধনার এবং অন্যদিকে আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মের ও প্রাচীন সমাজের মূল প্রকৃতি যে কি, এ জ্ঞান ইঁহাদের কাহারো ভাল করিয়া

পরিস্ফুট হয় নাই। কি কেশবচন্দ্র, কি অল্‌কট্‌-ব্লাভাট্‌স্কী, কি শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি,—ইঁহাদের কেহই দেশের লোক-প্রকৃতি, সমাজ-প্রকৃতি কিংবা পুরাগত সভ্যতা ও সাধনার প্রকৃতির উপরে, অথবা আমাদের প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন-প্রণালীর সঙ্গে মিলাইয়া, নিজেদের মীমাংসার প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ফলতঃ তাঁহারা যে পথে আমাদের বর্ত্তমান যুগসমস্যার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাকে মীমাংসা বলা যায় কি না, সন্দেহ। মীমাংসার প্রথমে কতকগুলি প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত মত, সিদ্ধান্ত বা সংস্কার বা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান থাকে। কোনও কারণে এ সকলের সত্য বা কল্যাণকারিতা সম্বন্ধে লোকের মনে সন্দেহের উদয় হয়। কোনও নূতন মত বা সিদ্ধান্ত, ভাব বা আদর্শকে আশ্রয় করিয়া, তারই প্রেরণায় এ সন্দেহের উৎপত্তি হয়। এই সন্দেহ নিরসনের জন্য বিচারের বা যথাযোগ্য প্রমাণ প্রতিষ্ঠা সমালোচনার বা criticismএর আবশ্যক হয়। এই বিচার ক্রমে নূতন সিদ্ধান্তের সাহায্যে প্রাচীনের সঙ্গে নূতনের বিরোধ-নিষ্পত্তির পথ দেখাইয়া দেয়। এই পথে যাইয়া পরিণামে চূড়ান্ত মীমাংসার প্রতিষ্ঠা হয়। এরূপ মীমাংসার জন্য বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই সম্যক্‌ জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্যক। কিন্তু কি কেশবচন্দ্র, কি থিওসফী সমাজের নেতৃবর্গ, কি তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি তথাকথিত হিন্দু পুনরুত্থানকারীগণ, ইঁহাদের কেহই এ জ্ঞান লাভ করেন নাই। স্বদেশের মূল প্রকৃতির এবং বিশেষতঃ স্বজাতির ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের কোন বিশেষ জ্ঞান কেশবচন্দ্রের ছিল না। থাকিলে তিনি খৃষ্টিয়ানী সিদ্ধান্ত ও য়ুরোপীয় ইতিহাসের দৃষ্টান্ত আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান যুগসমস্যার মীমাংসা করিতে যাইতেন না। হিন্দু যুগে যুগে, স্বানুভূতি ও শাস্ত্রের মধ্যে যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাজের গতিশক্তি ও স্থিতিশক্তির নিত্য বিরোধকে মিটাইয়াছে এবং এইরূপে বেদের ক্রিয়াকাণ্ড ও দেববাদ হইতে ক্রমে

উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড ও ব্রহ্মতত্ত্ব; উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড হইতে আধ্যাত্মিক কল্পনাভূষিত পৌরাণিকী ভক্তিপন্থার ভিতর দিয়া, ধর্ম্মতত্ত্ব ও ধর্ম্মসাধনকে অপূর্ব্বভাবে ফুটাইয়া তুলিয়া, পন্থাবিভাগ ও অধিকারি-ভেদের সাহায্যে, আপন ধর্ম্মের অদ্ভুত বৈচিত্র্য ও বিশেষত্বের মধ্যে সনাতন বিশ্বধর্ম্ম ক্রমে ক্রমে গড়িয়া তুলিতেছে,—কেশবচন্দ্র স্বদেশের সাধনার এই ঐতিহাসিক তত্ত্বটী ভাল করিয়া ধরিতে পারেন নাই। তাঁর অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিক কল্পনাবলে তিনি যে ত্রিবিধ যোগপ্রণালীর বর্ণনা করেন,* তাহাতে মানবসমাজের ধর্ম্মের ও সাধনার ইতিহাসের সাধারণ বিবর্ত্তন-তত্ত্বটী অতি পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হইয়াছে, সত্য; কিন্তু স্বদেশের সাধনার ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনপ্রণালীর বিচার করিবার সময়, কেশবচন্দ্র সম্যক্‌রূপে এই তত্ত্বটী প্রয়োগ করেন নাই বা অকালে দেহত্যাগ করায়, করিবার অবসর প্রাপ্ত হন নাই। ফলতঃ একরূপ অন্তিমদশায় আসিয়াই তিনি এই যোগ-তত্ত্বটী লাভ করেন। তাঁর "নববিধান" ইহার অনেক পূর্ব্বেই আমাদের বর্ত্তমান যুগসমস্যার একটা মীমাংসা করিয়া বসিয়াছিল। আর সে মীমাংসার প্রতিষ্ঠায়, কেশবচন্দ্র স্বদেশের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তন-পন্থাকে উপেক্ষা করিয়া, খৃষ্টিয়ানী সিদ্ধান্ত ও খৃষ্টিয়ানী অভিজ্ঞতাকেই আশ্রয় করেন। তাঁর প্রেরিত মহাপুরুষ-বাদ ঈশ্বরানুপ্রাণতা-বাদ ও শ্রীদরবার, এই সকলই ইহুদীয় ও খৃষ্টিয় শাস্ত্র এবং ইতিহাস হইতে সংগৃহীত। স্বদেশের শাস্ত্র ও সাধনার সঙ্গে এ সকলের কোন সম্পর্ক নাই। আর ইহাই কেশবচন্দ্রের মীমাংসা-চেষ্টার নিষ্ফলতার কারণ। কেশবচন্দ্রের মীমাংসার চেষ্টা যেমন খৃষ্টিয় শাস্ত্রে ও য়ুরোপীয় ইতিহাসের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাকে যেমন প্রচ্ছন্ন খৃষ্টিয়বাদ বলা যাইতে পারে; †

* Yoga : Objective, Subjective and Universal.

† কেশবচন্দ্রের "নববিধানের" একটা হিন্দু দিকও আছে, এখানে তার কথা বলিতেছি না।

সেইরূপ দয়ানন্দ স্বামীর আর্য্যসমাজের, অল্‌কট্-ব্লাভ্যাট্স্কীয় থিওসফীর এবং শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি হিন্দুগণের মীমাংসাও বস্তুতঃ য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও জড়বাদের প্রভাবেই একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। অল্‌কট্-ব্লাভ্যাট্স্কীর তো কথাই নাই, দয়ানন্দ স্বামী বা তর্কচূড়ামণি মহাশয়ও স্বদেশের ঋষিপন্থা অবলম্বন করিয়া আধুনিক যুগসমস্যার মীমাংসা করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই সকল মীমাংসা প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপীয় যুক্তিবাদ ও লৌকিক ন্যায়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এই সকল অকাল-চেষ্টিত মীমাংসার নিষ্ফলতার প্রধান কারণ এই যে, এ সকলে যে সমস্যা-ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন পর্য্যন্ত সে সমস্যাটী নিঃশেষ-ভাবে ফুটীয়া উঠে নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী এবং তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এই সমস্যাটীকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়া, তার মীমাংসার পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন।

মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র শাস্ত্র-গুরু-বর্জ্জিত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিতে যাইয়াও, নিজেদের পূর্ব্বার্জ্জিত সাধন-সম্পদ্-প্রভাবে, আপনাদের ধর্ম্মতত্ত্বে বা ধর্ম্মসাধনে শুদ্ধ স্বানুভূতি ও যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের সত্য স্বরূপটী ভাল করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে পারেন নাই। মহর্ষি এবং কেশবচন্দ্র উভয়েই যুক্তিবাদের উপরে ধর্ম্মস্থাপন অসম্ভব দেখিয়া, পরে নিজেরাই শাস্ত্র-প্রণেতার ও ঈশ্বরানুপ্রাণিত গুরুর অধিকার গ্রহণ করেন। মহর্ষির জীবদ্দশায় তাঁর আদি ব্রাহ্মসমাজ সকল বিষয়েই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিয়াছেন। কেশবচন্দ্রের লোকান্তর গমনের পরেও নববিধান সমাজ তাঁরই বিধান মানিয়া চলিয়াছেন। এই সমাজে গুরুকরণের প্রয়োজন স্বীকৃত না হইলেও, একটা প্রবল পৌরোহিত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া কিয়ৎপরিমাণে সমাজের ধর্ম্মকে ব্যক্তিস্বাভিমানী অনধীনতার আতিশয্য হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইয়াছে, ইহা

অস্বীকার করা যায় না। আর কেশবচন্দ্রের শেষ জীবনের শিক্ষার গুণে এই দলের ব্রাহ্মগণ এক প্রকারের শাস্ত্রানুগত্য এবং সাধুভক্তির অনুশীলন করিয়া তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মকে এমন একটা সংযম ও শ্রদ্ধাশীলতার দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়াছেন, যাহা শাস্ত্রী মহাশয়ের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে কচিৎ কোন কোন ব্যক্তির মধ্যে দেখা গেলেও, সাধারণ সভ্যদিগের মধ্যে দেখা যায় না। একদিকে শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে কোন প্রকৃতিগত বলবতী আস্তিক্যবুদ্ধি নাই; অন্যদিকে নববিধান-সমাজের 'প্রেরিত-মণ্ডলী'র ও 'শ্রীদরবারে'র মত কোন পৌরোহিত্যের প্রতিষ্ঠাও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে হয় নাই। নববিধান মণ্ডলীর শাস্ত্রানুগত্য ও সাধুভক্তিকে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্যেরা সর্ব্বদা অল্পবিস্তর ভীতির চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছেন।

শিবনাথ শাস্ত্রীর ধর্ম্মানুরাগ

শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে কোন স্বাভাবিকী ও বলবতী আস্তিক্য-বুদ্ধি না থাকিলেও, সর্ব্বদা একপ্রকারের ধর্ম্মানুরাগ বিদ্যমান ছিল। আমাদের দেশে মুমুক্ষুত্ব হইতেই ধর্ম্মানুরাগের উৎপত্তি হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্ম্মানুরাগ এই জাতীয় কি না, সন্দেহ। ইহাকে বিলাতী ছাঁচের ধর্ম্মানুরাগ বলিয়া মনে হয়। ইংরেজীতে ইহাকে Religious Enthusiasm বলে। এই ধর্ম্মানুরাগ দুই দিক দিয়া প্রকাশিত হয়। একদিকে ইহাতে ব্যক্তিগত চরিত্রের শুদ্ধতা রক্ষার জন্য একটা গভীর আগ্রহ থাকে, এবং এই কারণে মিথ্যা কথন, প্রবঞ্চনা, পরদ্রব্যহরণ, পরদারগ্রহণ, প্রভৃতি দুষ্কর্ম্ম হইতে নির্ম্মুক্ত থাকিবার বাসনার ও প্রয়াসের ভিতর দিয়া ইহা ফুটিয়া উঠে। অন্যদিকে লোকহিতেচ্ছা এবং লোক-সেবার চেষ্টাতেও ইহা প্রকাশিত হয়। এই জাতীয় ধর্ম্মানুরাগের সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসের বা ভগবদ্ভক্তির অপরিহার্য্য সম্বন্ধ নাই। শিবনাথ

শাস্ত্রীর ধর্ম্মানুরাগ অনেকটা এই জাতীয়। অন্যদিকে স্বদেশের এবং সমগ্র মানবজাতির সুখ ও উন্নতি-কামনা-প্রসূত একটা প্রবল কর্ম্মানুরাগও তাঁর জীবনে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। জগতের সর্ব্বত্র এই সকল উপকরণেই যুক্তিবাদী ধর্ম্ম বা Rational Religion গড়িয়া উঠে।

ফলতঃ যে ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার আদর্শে আমাদের সেকালের ইংরেজি-শিক্ষা-প্রাপ্ত যুবকমণ্ডলীর চিত্ত একেবারে মাতিয়া উঠে, তাহারই উপরে শিবনাথ শাস্ত্রীর এই ধর্ম্মানুরাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম যৌবনাবধিই—কতকটা বৈজিক-নিয়মাধীনে আর কতকটা ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে--শিবনাথ শাস্ত্রীর ভিতরে একটা অদম্য অনধীনতার ভাব জাগিয়াছিল। ইহার সঙ্গে য়ুরোপীয় ঝাঁঝের একটা বলবতী মানবহিতৈষাও মিশিয়াছিল। তাঁর প্রকৃতির ভিতরে বাল্যাবধি এমন একটা নিঃস্বার্থতা এবং মহাপ্রাণতা ছিল, যাহা এই মানবহিতৈষাকে বাড়াইয়া তুলে। এই অনধীনতার ও মানবহিতৈষার প্রেরণাতে তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন বলিয়া মনে হয়। লোকসেবাই তাঁর ধর্ম্মের মূল মন্ত্র ছিল। অনধীনতার ভাব হইতে দেশপ্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের কর্ম্মবহুল অনুষ্ঠানাদি ও প্রাচীন শাস্ত্রগুরুর শাসনকে তিনি বর্জ্জন করেন। মানবহিতৈষা হইতে স্বদেশের জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। য়ুরোপীয় সাম্যভাবের প্রেরণায়, স্বদেশের ও মানবসমাজের হিতকল্পে ধর্ম্মের ও সমাজের সর্ব্বপ্রকারের শাসন হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া, তার মনুষ্যত্ব বস্তুকে অবাধে ফুটিয়া উঠিবার সম্পূর্ণ অবসর দিবার জন্য, শাস্ত্রী মহাশয়ের যে আত্যন্তিক আগ্রহ ও উৎসাহ দেখা গিয়াছে, মহর্ষির কিম্বা কেশবচন্দ্রের মধ্যে তাহা দেখা যায় নাই। তথাকথিত সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার উপরে পরিবারের ও সমাজের সর্ব্ববিধ সম্বন্ধকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, সমাজের সংস্কার সাধনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রজাস্বত্বের সম্প্রসারণে, এক সময়ে শিবনাথ শাস্ত্রী ফরাসী বিপ্লবের অধিনায়কগণের

শিষ্য ছিলেন। কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার প্রভাব, ভলটেয়ার, রুশো প্রভৃতি ফরাসীয় চিন্তানায়কগণের শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া সাক্ষাৎভাবে শিবনাথ শাস্ত্রী বা তাঁর সহযোগী ব্রাহ্মগণের উপরে আসিয়া পড়ে নাই। ইংলণ্ডের ও আমেরিকার যুক্তিবাদী খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের শিক্ষা-দীক্ষা হইতে আমাদের ব্রাহ্মসমাজ য়ুরোপীয় সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার উদ্দীপনা লাভ করেন। আর ইঁহাদের মধ্যে ইংলণ্ডের ফ্রান্সেস নিউম্যান্ এবং আমেরিকার থিওডোর পার্কারের সঙ্গেই ব্রাহ্মসমাজের সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রথম যৌবনকালে পার্কারই ব্রাহ্মসমাজের যুক্তিবাদী যুবকদলের প্রধান শিক্ষাগুরু হইয়াছিলেন। কিন্তু যে দার্শনিক ভিত্তির উপরে পার্কারের ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা হয়, তাঁর ভারতবাসী শিষ্যগণ সে তত্ত্বকে ভাল করিয়া ধরিয়াছিলেন কি না সন্দেহের কথা। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি পার্কারের দুর্দ্দমনীয় অনধীনতা প্রবৃত্তি এবং উদার ও বিশ্বজনীন মানব-প্রেমের উদ্দীপনাই কতকটা লাভ করেন, কিন্তু পার্কারের তত্ত্বজ্ঞান বা ভক্তিভাব লাভ করিয়াছিলেন কি না, বলা সহজ নয়।

ফলতঃ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃপদে বৃত হইবার পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয়ের ধর্ম্মজীবন অপেক্ষা কর্ম্মোৎসাহই বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছিল। উপাসনাদি অন্তরঙ্গ ধর্ম্মকর্ম্মে তাঁর যতটা উৎসাহ ও নিষ্ঠা ছিল, সমাজ-সংস্কারে তখন যে তদপেক্ষা অনেক বেশী আগ্রহ ছিল, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। এ সময়ে তিনি উপাসনা-প্রার্থনাদি ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনকেও যে লৌকিক ন্যায়ের বিশুদ্ধ তর্কবুদ্ধির কষ্টিপাথরে কষিতেছিলেন, তাঁর সম্পাদিত "সমদর্শী"ই ইহার সাক্ষী। ক্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পদে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হইলে, শিবনাথ শাস্ত্রী বিবেক বৈরাগ্যাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন বটে, কিন্তু এ সকল কতটা যে তাঁর ভিতরকার

সাধনাভিজ্ঞতা হইতে ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর কতটা যে ব্রাহ্মসমাজের বাহিরের অবস্থার পরিবর্ত্তনের ফল, ইহাও বলা সহজ নয়। আর এ সকল সত্ত্বেও শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনে ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনের প্রয়াস অপেক্ষা বাহিরের সমাজ-সংস্কারাদি সাধনের প্রয়াস যে সর্ব্বদা বলবত্তর হইয়া আছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব।

ফলতঃ শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম বস্তুগুলি তাঁর ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকার্য্যের ভিতর দিয়া আজি পর্য্যন্ত ভাল করিয়া ফুটিয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। শিবনাথ শাস্ত্রী কবি। রসানুভূতি কবিপ্রকৃতির সাধারণ লক্ষণ। রাসগ্রাহিতা ও ভোগলিপ্সা শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এই দুই বস্তু তাঁর প্রচারক-জীবনের বন্ধনে পড়িয়া বহুল পরিমাণে সঙ্কুচিত ও বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে শিবনাথের চরিত্রের যে দিকটা ফুটিয়া উঠিতেছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব ভার পাইয়া, তাহা ক্রমে শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করে। সত্য-সন্ধিৎসাই সে সময়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের চরিত্রের বিশিষ্ট গুণ ছিল। এই সত্য-সন্ধিৎসা যুক্তিবাদের সাধারণ লক্ষণ। প্রাচীন কি নূতন কোন প্রকারের বন্ধন যুক্তিবাদ সহ্য করিতে পারে না। যুক্তিবাদ সত্যের সন্ধানে যাইয়া ভুল ভ্রান্তি যাই করুক না কেন, কখনও লোকানুবর্ত্তিতার আশ্রয় গ্রহণ করে না। গার্য়ডিণো ব্রুণো প্রভৃতি য়ুরোপীয় যুক্তিবাদিগণ সত্যের সন্ধানে বা প্রচারে প্রাচীন শাস্ত্র বা প্রচলিত পৌরোহিত্য কোনও কিছুর মুখাপেক্ষা করেন নাই বলিয়া, সেখানে যুক্তিবাদ এতটা প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। শিবনাথও এক সময় সত্যের সন্ধানে যাইয়া আপনার বিচারবুদ্ধি ও অন্তঃপ্রকৃতিরই অনুসরণ করিয়া চলিতেন। প্রাচীন সমাজের আনুগত্য পরিহার করিয়া তিনি কিছুতে নূতন সমাজের প্রচার-মণ্ডলীর বা আচার্য্যের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই। আর এইজন্য

নূতন সমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের হাতে শিবনাথকে অশেষপ্রকারের নির্য্যাতন এবং লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই নিগ্রহ-নির্য্যাতনে শিবনাথ শাস্ত্রীর চরিত্রের শক্তি ও সৌরভ যতটা ফুটিয়াছিল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নেতৃপদে বৃত হইয়া তাহা হয় নাই। বরং এই অভিনব দায়িত্বভার তাঁহার আপনার অন্তঃপ্রকৃতির প্রেরণাকে নানা দিকে চাপিয়া রাখিয়া, তাঁহার মূল চরিত্র সম্যকরূপে ফুটিয়া উঠিবার ব্যাঘাতই জন্মাইয়াছে।

যোগ, ভক্তি প্রভৃতি ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ সাধনের শক্তি ও সরঞ্জাম শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে কখনই বেশী ছিল না, এখনও নাই। ফলাফল-বিচার-বিরহিত সত্যসন্ধিৎসা, দুর্দ্দমনীয় অনধীনতা প্রবৃত্তি, অকৃত্রিম লোক-হিতৈষা এবং প্রগাঢ় স্বদেশানুরাগ,—এ সকলই শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রকৃতির নিজস্ব সম্পত্তি ছিল। এই সকলের জন্য তিনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম-সমাজের ও দেশের সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদারমতি যুবকদলের উপরে এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন। ব্রাহ্মমাজের ধর্ম্মসিদ্ধান্ত ও ধর্ম্মসাধনকে সর্ব্বপ্রকারের অতিপ্রাকৃতত্ব ও অতিলৌকিকত্ব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর সম্পাদিত "সমদর্শী" যতটা চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর কোথাও সেরূপ চেষ্টা হয় নাই। কেশবচন্দ্র যখন ক্রমে একটা কল্পিত যোগ-বৈরাগ্যের আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল ও সোজা ভাবগুলিকে স্বল্পবিস্তর জটিল ও কৃত্রিম করিয়া তুলিতেছিলেন, তাঁহার নূতন শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে ব্রাহ্ম-সমাজে যখন সংসার-ধর্ম্মের সহজ ভাবগুলি একটা কৃত্রিম পার-লৌকিকতার প্রভাবে ম্রিয়মাণ হইতে আরম্ভ করে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মসমাজ প্রথমে যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রসার-বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছিলেন, কেশবচন্দ্র যখন আপনিই কেবল সে আদর্শ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন না, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে তাহাকে হীন বলিয়া প্রচার

করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন শিবনাথই ব্রাহ্মসমাজের সে আদি কালের অনধীনতা-ধর্ম্মের পুরোহিত ও রক্ষক হইয়া, তাহাকে প্রাণপণে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজে অবরোধপ্রথা তুলিবার চেষ্টায় রক্ষণশীল ও উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণের মধ্যে যখন বিরোধ বাধিয়া উঠিল, তখন শিবনাথই এই উন্নতিশীলদের অগ্রণী হইয়াছিলেন। বাল্যবিবাহ-নিবারণ, বিধবাবিবাহ-প্রচলন, জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ সাধন, এ সকল বিষয়ে শিবনাথই তখন বাংলার সমাজ-সংস্কার প্রয়াসী যুবকদলের নেতা হইয়া উঠিতেছিলেন। আর সর্ব্বোপরি তিনিই, রাজা রামমোহন রায়ের পরে, ব্রাহ্মধর্ম্মে একটা উদার ও প্রবল স্বদেশপ্রেমেরও সঞ্চার করিতে চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজ একরূপ প্রথমাবধি যে সার্ব্বজনীন অনধীনতার আদর্শের অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন, শিবনাথ শাস্ত্রী যে ভাবে ও যে পরিমাণে সেই আদর্শটীকে এক সময়ে ধরিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ কি কেশবচন্দ্র ইঁহাদের কেহই তাহা করেন নাই বা পারেন নাই।

শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বদেশহিতৈষা

দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্মসাধনে এবং কেশবচন্দ্র পারিবারিক জীবনে মুখ্যভাবে সার্বজনীন অনধীনতার আদর্শকে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ই সর্ব্বপ্রথমে ইহাকে রাষ্ট্রীয় জীবনেও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য লালায়িত হন। এই জন্য শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রাহ্মধর্ম্মে একটা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রেরণাও জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। মহর্ষির বা ব্রহ্মানন্দের মধ্যে এ বস্তু এতটা পরিস্ফুটভাবে কখনও প্রকাশ পায় নাই। এই জন্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম জীবনে তাঁর ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্ম-জীবনের মধ্যে একটা সঙ্গতি ও শক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের অলৌকিক বাগ্মিপ্রতিভার ফলে, তাঁর ধর্মজীবনে ও কর্মজীবনে, এমন কি তাঁর দৈনন্দিন চালচলনেও একটা নটস্বভাবসুলভ কৃত্রিমতা বিদ্যমান

ছিল। এই 'নাটুকে' ভাবটা শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে এক সময়ে একেবারে ছিল না বলিয়া, গভীরতর আধ্যাত্মিক জীবনলাভ না করিয়াও, তিনি অনেক সরল ধর্মপিপাসু লোকেরও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র উভয়েই অভিজাত বংশের ছিলেন। জীবনব্যাপী ধর্মসাধন এবং ধর্মচর্চ্চা ইঁহাদের এই আভিজাত্য-অভিমান নষ্ট করিতে পারে নাই। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীর আভিজাত্যের কোন দাবীও ছিল না; আর তাঁর প্রকৃতির ভিতরে এক সময়ে একটা ঐকান্তিক নিরহঙ্কারের ভাব বিদ্যমান ছিল বলিয়া, তিনি বাঙ্গলা সমাজে নানাদিকে বিশেষ খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠিতে আরম্ভ করিলেও, কখনও কোনরূপ শ্রেষ্ঠত্বাভিমানে স্ফীত হইয়া উঠেন নাই। আযৌবন তাঁহাকে সাধারণের পূজারী রূপেই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। আর এই গণতন্ত্রতার আদর্শ তাঁহার ধর্মজীবনের ও কর্মজীবনের সকল বিভাগ অধিকার করিয়াছিল বলিয়া, যে স্বদেশ-প্রীতি মহর্ষির বা ব্রহ্মানন্দের ধর্মজীবনে প্রকাশিত হয় নাই,--শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে তাহা বিশদরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কেশবচন্দ্র ব্রহ্মোপাসনা কালে সমুদায় জগতের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেন। আর এই রীতিটি তিনি কিয়ৎপরিমাণে সম্ভবতঃ ইংলণ্ডের খৃষ্টীয় সঙ্ঘের (Church of England) উপাসনা-পদ্ধতি হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রীই সর্ব্বপ্রথম স্বদেশের কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিবার রীতি ব্রহ্মোপাসনাতে প্রবর্ত্তিত করেন। মহর্ষির আদি ব্রাহ্মসমাজের কিম্বা কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত পুস্তকে স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কোন সঙ্গীত দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। শিবনাথ শাস্ত্রীই প্রথমে—

তব পদে লই শরণ।

আর্য্যদের প্রিয়ভূমি, সাধের ভারতভূমি,

অবসন্ন আছে, অচেতন হে।

একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,
দুর্দ্দশা আঁধার তার কর হে মোচন।
কোটী কোটী নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি,
অন্তর্যামি জানিছ সে সব হে ;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে,
অসাড় শরীরে পুনঃ দেও হে চেতন।
কত জাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন,
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে ;
সেই কৃপাগুণে, দেখি শুভক্ষণে,
সাধের ভারতে পুনঃ আন হে জীবন।

এই স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক গান ব্রহ্মসঙ্গীত ভুক্ত করিয়া দেন।

কুচবিহার বিবাহের কিছুকাল পূর্ব্বে শিবনাথ শাস্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষার্থী যুবককে লইয়া একটি নূতন কর্ম্মীদল গড়িবার চেষ্টা করেন। এই দলটীকে তিনি যে আদর্শে গঠন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্তরের সত্যভাব ও আদর্শ পরিষ্কাররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। স্বদেশপ্রীতিই এই দলগঠনের মূল প্রেরণা ছিল। এই স্বদেশপ্রীতির ভিতর দিয়াই শিবনাথ শাস্ত্রীর সে সময়ের ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিতেছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সামাজিক স্বাধীনতা, পারিবারিক স্বাধীনতা—যুক্তিবাদী ধর্ম্মের সর্বাঙ্গীন অনধীনতার আদর্শটীকে ফুটাইয়া তোলাই শিবনাথ শাস্ত্রীর এই কর্ম্মীদল গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল। কি দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজে, কি কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে, কোথাও এইরূপ সর্ব্বাঙ্গীনভাবে এই অনধীনতার আদর্শটীকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা হয় নাই। ফলতঃ শিবনাথ শাস্ত্রী ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের আর কোন লোকপ্রসিদ্ধ চিন্তনায়ক বা কর্ম্মনায়ক ব্রাহ্মধর্ম্মের এই নিজস্ব আদর্শটীকে

এমনভাবে ধরিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অতএব এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, শিবনাথ শাস্ত্রীর মধ্যে এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল ভাব ও আদর্শগুলি যতটা পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, মহর্ষি কিম্বা কেশব-চন্দ্রের মধ্যে তাহা করে নাই। মহর্ষি এই ধর্ম্মের বীজমাত্র বপন করেন। কেশবচন্দ্র এই বীজকে কতকটা ফুটাইয়া তুলিয়া, আবার আপনার হাতেই তাহাকে চাপিয়া নষ্ট করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীই এক সময়ে ইহাকে পরিস্ফুট ও পরিপক্কভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহাই তাঁর জীবনের ও কর্ম্মের বিশেষত্ব।

কিন্তু আত্যন্তিকভাবে এই আদর্শটীকে লোকচরিত্রে ও সমাজ-জীবনে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে একান্তরূপে তার নিজের প্রকৃতির উপরে ছাড়িয়া দিতে হয়। অনধীনতার আদর্শের চরম পরিণতি দার্শনিক অরাজকতায়। য়ুরোপে এই ব্যক্তিত্বাভিমানী অনধীনতার বা Individualistic Freedomএর আদর্শ ক্রমে এইরূপে এই দার্শনিক অরাজকতাতে বা Philosophical Anarchismএতে যাইয়া পৌছাইয়াছে। আপনার যুক্তির সূত্রটী ধরিয়া চলিলে, শিবনাথ শাস্ত্রীকে এবং তাঁর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে পরিণামে এইখানেই যাইয়া উপস্থিত হইতে হইত। আর ইঁহারা যে এতটা দূর পর্য্যন্ত যাইতে পারেন নাই, তাহাতে ইহাদের কাহারই যে একান্ত কল্যাণ হইয়াছে, এমনও বলা যায় না।

কারণ, এ জগতে মানুষ বিশ্বাসভরে, অনন্যচিত্ত হইয়া, ফলাফল-বিচার পরিহার-পূর্ব্বক, যে কোন সিদ্ধান্ত বা পন্থাকে ধরিয়াই চলিতে আরম্ভ করুক না কেন, সেই সিদ্ধান্ত বা সেই পন্থাকে আশ্রয় করিয়াই, ক্রমে পরমতত্ত্বে ও চরম-গতিতে যাইয়া পৌছাইতে পারে। যুক্তিবাদী ধর্ম্মও এইজন্য, আপনার প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলে, পরিণামে যাইয়া পরমবস্তু লাভ করিয়া থাকে। আর সাধনের বদ্ধ-পথের

আকস্মিক ও মায়িক ভয়বিভীষিকার দ্বারা বিক্ষিপ্ত না হইয়া, ব্রাহ্মসমাজ একান্ত নির্ভর ও নিষ্ঠা সহকারে, নিজের সিদ্ধান্তকে আঁকড়িয়া ধরিতে পারে নাই বলিয়াই, এমন ভাবে নিস্ফলতা লাভ করিতেছে।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের পূর্ব্বে শিবনাথ শাস্ত্রী যে বিশ্বস্ততা সহকারে আপনার নিজস্ব প্রকৃতির অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন, এই নূতন সমাজের নেতৃপদের গুরু দায়িত্ব-ভার গ্রহণ করিয়া ক্রমে সে পথ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আর এই জন্যই, ভয়াবহ পরধর্ম্মের চাপে, আপনার অন্তঃপ্রকৃতিকে অযথা নিপীড়িত করিবার চেষ্টা করিয়া শিবনাথ শাস্ত্রী নিজের জীবনেরও সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারেন নাই, আর তাঁহার সমাজকেও আত্ম-চরিতার্থতা লাভে সাহায্য করিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা—একদিক

রবীন্দ্রনাথের সম্বর্দ্ধনা করিয়া, বাঙ্গালী আজ আপনাকেই লোক সমক্ষে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। কোনো জাতির যখন আত্মচৈতন্যের উদয় হয়, তখন তারা এইরূপ করিয়া আপনাদের সমাজের মহৎ লোকদিগের মহত্বের সমাদর করিয়া, পরোক্ষভাবে আপনাদিগকে বাড়াইয়া তুলে। যে গুণের আদর জানে না, সে আপনিও গুণহীন হইয়া পড়িয়া থাকে। যে যোগ্য ব্যক্তির উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিতে কুণ্ঠিত হয়, সে আপনিও যোগ্যতা-ভ্রষ্ট হইয়া রহে। বাঙ্গালী একদিন গুণীর আদর ভুলিয়া গিয়াছিল। যোগ্যের সম্বর্দ্ধনা যে সমাজের একটা প্রধান কর্ত্তব্য, বাঙ্গলার সমাজ একদিন এ বিধানকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের অন্ত্যলীলা তার সাক্ষী। কিন্তু বাঙ্গলার সে আত্ম-বিস্মৃতি ক্রমে ঘুচিয়া যাইতেছে। এই কয় বৎসরে তা'র অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই সম্বর্দ্ধনাও তারই প্রমাণ।

রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনা—আর একদিক

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুদ্ধ আপনার প্রতিভা-বলেই এইরূপ সমৃদ্ধ রাজসিক সম্বর্দ্ধনা পাইয়াছেন, একেবারে এত বড় কথাটা বলিতেও সঙ্কোচ হয়। সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াও, রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্মীর কোমল অঙ্কেই ভূমিষ্ঠ হন। আজীবন তিনি সেই সম্পদের মধ্যেই লালিত-পালিত, সেবিত-বর্দ্ধিত হইয়া আসিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল কবি বা মনীষী নহেন। তিনি

"প্রিন্স্" দ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ঠাকুর বংশের কুল-প্রদীপ। বাঙ্গলার বুনিয়াদী ও ইংরেজের বানানো রাজ-রাজড়ার সঙ্গে তাঁর পরিবার-পরিজনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাঁর কুলের গৌরব ও ধনের গৌরব, রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবি-প্রতিভার সঙ্গে মিলিত হইয়া স্বর্ণ-সোহাগা যোগ সম্পাদন করিয়াছে। এরূপ যোগাযোগ সংসারে বিরল। এই শুভযোগ না হইলে আজ রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালার দ্বারা যে সমারোহ সহকারে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন, সেরূপ ভাবে সম্বর্দ্ধিত হইতেন কি না সন্দেহের কথা।

ইহাতে রবীন্দ্রনাথের অগৌরবের কথা কিছু নাই। যেখানেই নানা ভাবের, নানা চরিত্রের, নানাবিধ শিক্ষাদীক্ষাপ্রাপ্ত নানা লোকে সমবেত হইয়া একসঙ্গে কোনো পূজা-অর্চ্চনার আয়োজন করে, সেখানে এরূপ ভাবের খিচুড়ী পাকিয়া যাইবেই যাইবে। এ ক্ষেত্রে কখনো সকলে এক ভাবাপন্ন হইয়া আসে না। কেহ বা অর্চ্চিতের রূপে মুগ্ধ হইয়া আসে, কেহ বা তাঁর গুণে বশ হইয়া আসে, কেহ বা স্বার্থের সন্ধানে, কেহ বা পরমার্থের অন্বেষণে আসে। আর কেহ বা সম্পূর্ণরূপেই উদাসীন ও উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে, শুধু যজ্ঞের জনতা বৃদ্ধি করিবার জন্য পূজাস্থানে আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু এই সকলের দ্বারা উপাসকের অধিকারই জ্ঞাপিত হয়। উপাসকের ক্ষুদ্রতার দ্বারা কুত্রাপি উপাস্যের যোগ্যতার কোনো হানি হয় না। যিনি যে ভাবেই রবীন্দ্র-সম্বর্দ্ধনায় যোগ দিন না কেন, তাঁর ভাব তাঁহাকেই কেবল ক্ষুদ্র বা মহৎ করিয়াছে, তদ্দ্বারা রবীন্দ্রনাথের যোগ্যতার কিছুই হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। এ যোগ্যতা রবীন্দ্রনাথের কুলের নহে। এ যোগ্যতা তাঁর কৌলিক ধনমর্য্যাদার নহে। এ যোগ্যতা তাঁর অলৌকিক কবি-প্রতিভার। তাঁর পৈত্রিক কুল ও ধনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই কবি-প্রতিভার এরূপ মণিকাঞ্চন যোগ না থাকিলে, বাঙ্গালী হয় ত আজ এইভাবে তাঁর সে শুদ্ধ সাত্ত্বিকী

যোগ্যতার সম্বর্দ্ধনা করিত না। কিন্তু তাহাতে কেবল আমাদের হীনতা প্রকাশিত হইত, রবীন্দ্র-প্রতিভার অযোগ্যতা প্রমাণিত হইত না।

বাংলা সাহিত্যে ও বাঙ্গালী জীবনে রবীন্দ্রনাথ

বাংলা-ভাষা ও বাংলা-সাহিত্যকে যাঁহারা এই কালে অভূতপূর্ব্ব শ্রীসম্পদে বিভূষিত করিয়াছেন; বাঙ্গালীর জ্ঞান ও বাঙ্গালীর ভক্তিকে, বাঙ্গালীর আদর্শ ও বাঙ্গালীর আশাকে, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও বাঙ্গালীর কর্ম্মকে যাঁহারা ইদানীন্তনকালে নানা প্রকারে ফুটাইয়া ও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন; রবীন্দ্রনাথ যে তাঁহাদের অগ্রণীদলভুক্ত এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না। ডাক্তার যেমন শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া শারীরতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন, সাহিত্য-সমালোচক যদি সেই প্রণালীতে রবীন্দ্রনাথের চিত্তের ও চরিত্রের বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করেন, তবে এদিক ওদিক দিয়া অপূর্ণতা খুঁজিয়া পাইবেন, জানি। বাংলার অপরাপর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের তুলনায় রবীন্দ্রের প্রতিভার সমালোচনা করিলে, তিনি তাঁহাদের চাইতে কোথায় বড় বা কোথায় ছোট, এ সকল কথা লইয়া তর্ক-বিতর্ক উঠিতে পারে, ইহাও মানি। বাংলা গদ্যে রবীন্দ্রনাথের দান কতটা ও স্থান কোথায়, এ প্রশ্ন লইয়াও মতভেদ হইতে পারে, স্বীকার করি। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মের সাধনা ও সমাজের আদর্শ সর্ব্ববাদীসম্মত হওয়া সম্ভব নহে; এ সকল মতান্তর অনিবার্য্য। কিন্তু এ সকল খণ্ডতা দ্বারা কোনো মহিয়সী প্রতিভার বিচার-বিবেচনা হয় না, হইতে পারে না। কোনো কিছুর সত্যকে তার আংশিকতার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রূপের যাচাই করিতে হইলে তাহাকে সমগ্রভাবে দেখিতে হয়, ভাগ ভাগ করিয়া দেখিলে সত্য দেখা হয় না। রূপ বস্তুটা সমগ্রেই থাকে, একত্বেই বিরাজ করে, খণ্ডে খণ্ডে পৃথক ভাবে তাহাকে পাওয়া যায় না; নাক, কাণ, চোক, হাত, পা, কটি, চুল,

ছুইশ' তিয়াত্তর

বং এ সকল খুঁটিনাটি ধরিলে প্রকৃত রূপের পরিচয় পাওয়া যায় না, তার ঠিক মূল্য নির্দ্ধারণও সম্ভব হয় না। অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মনীষীদিগের অলৌকিক প্রতিভার বিচারও সেইরূপ সমগ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই করিতে হয়। টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ওজন করিতে গেলে, সত্যিকার বস্তুটা যে কি ও কত বড়, তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয় না। যাঁহারা খুঁটিনাটি ধরিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার বিচার-আলোচনা করিতে যাইবেন, তাঁহারা কদাপি সে প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাইতে পারিবেন না। রবীন্দ্রনাথ কবি। রবীন্দ্রনাথ শক্তিশালী লেখক। রবীন্দ্রনাথ জনপ্রিয় লোকনায়ক। জাতীয় জীবনের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ধর্ম্মপ্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক। এই ত্রিশ বৎসর কাল, তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন বিভাগে আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছে। ঋজু কুটিল ভাবে, তির্য্যক গতিতে, তাঁহার জীবন ও কর্ম্মস্রোত এই পঞ্চাশ বৎসর কাল এক নিত্য লক্ষ্যাভিমুখে ছুটিয়াছে। তিনি নানা সময়ে নানা কথা কহিয়াছেন; নানা মত প্রচার করিয়াছেন; নানা আদর্শের অনুসরণ করিয়াছেন; অথচ তাঁর জীবনে ও চিন্তায়, ভাবে ও কর্ম্মে, এই সকল বিভিন্ন আদর্শ ও অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া যাহা সর্ব্বদা আত্মপ্রকাশের প্রয়াস পাইয়াছে, সে বস্তু এক, বহু নহে। সে বস্তুর রূপ অনেক, কিন্তু স্বরূপ এক। সেই স্বরূপেই রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে বুঝিতে হইলে, সর্ব্বাদৌ তার এই ভিতরকার স্বরূপটিকে ধরিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ

আর আপনার স্বরূপে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানীও নহেন, কর্ম্মীও নহেন, কিন্তু কবি। এই কবি বস্তু যে কি, তাহা দেখিলে চেনা যায়, কিন্তু মুখে বলিয়া বোঝান সহজ নহে। রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলা যাইতেও বা

পারে, কিন্তু রসাত্মক বাক্যরচনায় নিপুণতা থাকিলেও, কেহ সত্য সত্য কবি নাও হইতে পারেন। চোখে যাহা দেখা যায় না, তাহাই দেখা; কাণে যাহা শোনা যায় না, তাহাই শোনা: যাহা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ নহে, তাহারই প্রত্যক্ষ লাভ করা, আর এ সকল অতীন্দ্রিয় বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিয়া ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ রূপরসের সঙ্গে তাহাদিগকে মিলাইয়া দিয়া, এক অভূত অদ্ভুত ভাবজগতের সৃষ্টি করা, ইহাই কবির সত্যধর্ম্ম। প্রকৃত কবি তর্ক করেন না, যুক্তি করেন না, বিচার করেন না, আলোচনা করেন না, কেবল আপনার অন্তশ্চক্ষুতে সত্য ও সৌন্দর্য্য দেখেন, আর এই রূপে যাহা দেখেন, তাহাই ভাষার তুলিকায় আঁকিয়া লোকসমক্ষে ধারণ করেন। এই অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি কবির প্রাণ। এই জন্য ঋষিদিগের ন্যায় কবিও দ্রষ্টা কিন্তু দার্শনিক নহেন, জ্ঞাতা কিন্তু বৈজ্ঞানিক নহেন। দার্শনিক সম্যক বিচারের উপরে আপনার সিদ্ধান্তকে স্থাপন করেন। কবি শুদ্ধ আত্মানুভূতির উপরে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেন। বিচারের জন্য চারিদিক দেখা আবশ্যক। শুদ্ধ অনুভূতির জন্য এইরূপ সম্যক দর্শন নিষ্প্রয়োজন।

আমরা আজিকালি যাহাকে বিজ্ঞান বলি—যাহা প্রকৃতপক্ষে কেবল জড়বিজ্ঞান মাত্র—এই বিজ্ঞানও বিষয়ীকে পশ্চাতে রাখিয়া বিষয়কেই সর্ব্বদা আগাইয়া দেয়। জ্ঞাতার নহে, কিন্তু জ্ঞেয়ের প্রকৃতি ও গুণাদির পরীক্ষা করাই এই বিজ্ঞানের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং এই বিজ্ঞান জ্ঞেয় বিষয়ের বিশ্লেষণ করিয়া তাহার গুণ ও ক্রিয়াদি আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত। এই পথে যে ভাবে যতটুকু সত্য পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক তারই অন্বেষণ করেন। কিন্তু কবির পথ এ নহে। কবি বস্তুর ভিতরকার গুণাগুণের প্রতি লক্ষ্য করেন না, কিন্তু বস্তু-সাক্ষাৎকারে তাঁর আপনার অন্তরে কোন রসের কতটা উদ্রেক হইল, তাহাই দেখেন ও আস্বাদন করেন। বৈজ্ঞানিক যেরূপ বস্তু-তন্ত্রতা চাহেন, কবির সেরূপ বাহ্

বস্তু-তন্ত্রতার একান্তই প্রয়োজনাভাব। বৈজ্ঞানিকের অধিকার বাহিরে, বিষয়-জগতে। কবির অধিকার ভিতরে, অন্তর্জগতে। বৈজ্ঞানিক বহির্মুখীন ও বিষয়াভিমুখী। কবি অন্তর্মুখীন ও আত্মাভিমুখীন। বৈজ্ঞানিক বাহিরের প্রামাণ্য না পাইলে, সত্যের প্রতিষ্ঠা হইল বলিয়া বিশ্বাস করেন না। কবি ভিতরের ভাবের, রসের, আত্মানুভূতির প্রামাণ্যকেই সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট মনে করিয়া বাহিরের প্রামাণ্যের প্রতি উদাসীন হইয়া থাকেন। কবিতে ও বৈজ্ঞানিকে এই প্রভেদ। অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মানুভূতি, এই সকলই কবি-প্রতিভার স্বরূপ। এই স্বরূপ লক্ষণ যে কবির কবিত্বে যতটা বেশী প্রকাশিত হয়, তাঁর কবি-প্রতিভাকে সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ বলিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা

এই কষ্টিপাথর দিয়া পরীক্ষা করিলে, রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভাকে কেবল বাংলার নহে, সমগ্র সভ্যজগতের কবিসমাজে অতি উচ্চ আসন দিতেই হইবে। শব্দ-সম্পদে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কবি আরও আছেন। চিত্রাঙ্কনের চাতুর্য্যেও তাঁর সমকক্ষ কিম্বা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিল্পীও পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু রসানুভূতির তীক্ষ্ণতা ও অধ্যাত্ম দৃষ্টির প্রসার ও গভীরতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পরে, বাংলায় জন্মিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর কালধর্ম্ম বশতঃ বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যেও যতটা প্রসার ঘটিবার অবসর হয় নাই, যুগপ্রভাবে রবীন্দ্রনাথের সে প্রসার ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তবে রবীন্দ্রনাথ অনুভূতির বিস্তৃতিতে ও অনুভাব্য বিষয়ের বিচিত্রতাতে যতটা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, অন্য দিকে সেই পরিমাণে তাঁর রসানুভূতির গভীরতা ও বাস্তবতা বৈষ্ণব কবিদিগের অপেক্ষা হীন বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব কবিগণ কেবল কবি ছিলেন না, অতি উচ্চ অধিকারের সাধকও

ছিলেন। রবীন্দ্রনাথেরও ধর্ম্মপিপাসা প্রবল। সাধনের আকাঙ্ক্ষাও বহুদিন হইতেই জন্মিয়াছে। আপনার অলৌকিক কবি-প্রতিভার স্ফুরণেই তিনি জীবনের সার্থকতা লাভ হইল মনে করেন না। ধর্ম্মকে এবং ব্রহ্মকে না পাইলে, তাঁহার সকলি বিফল ও ব্যর্থ হইয়া গেল,—রবীন্দ্রনাথের এ ভাবটা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছিল। তাঁহার আপনার সম্প্রদায় মধ্যে যে সাধন প্রচলিত আছে, সে সাধনেও রবীন্দ্রনাথ এখন আর উদাসীন নহেন। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিদিগের সাধনায় এমন একটা বস্তুতন্ত্রতা ছিল, আমাদের এই নবীন-যুগের প্রমুক্ত সাধনায় সে বস্তুতন্ত্রতা নাই।

প্রাচীন ধর্ম সকলেই গুরুমুখী। সকলেই অবতাররূপে বা গুরুরূপে ভগবানের একটা বহিঃপ্রকাশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণ ভগবানের দ্বিবিধ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এক অন্তরে—চৈত্ত্যগুরুরূপে; অপর বাহিরে—মোহান্ত-গুরুরূপে। এই জন্য তাঁদের সাধনা যুগপৎ অন্তর্ম্মুখীন ও বস্তুতন্ত্র হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তে ও সাধনায় কেবল চৈত্ত্যগুরুর স্থান আছে, বৈষ্ণবেরা যাঁহাকে মোহান্ত-গুরু বলেন, তার স্থান নাই। ভগবান চৈত্ত্যগুরুরূপে জীবের অন্তরে, তার ভিতরকার জ্ঞানভাবাদির ভিতর দিয়া, তার স্বানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হন। চৈত্ত্যগুরুকে অগ্রাহ্য করিলে চলে না। কিন্তু এই চৈত্ত্যপ্রকাশ আংশিক, পূর্ণ নহে। এই প্রকাশে জীবের অহংবুদ্ধি ভগবানকে ওতপ্রোতভাবে ঘেরিয়া থাকে। এখানে জীব অনেক সময় আপনার প্রাকৃত বুদ্ধির সিদ্ধান্ত ও অসংস্কৃত প্রবৃত্তির খেয়ালকে ইন্দ্রিয়বিকার প্রসূত বিবিধ রসরাগে রঞ্জিত করিয়া, ভগবৎপ্রকাশ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকে। মোহান্তগুরু এই ভ্রম নিরস্ত করিয়া থাকেন। চিত্তে যে ভগবৎপ্রকাশ হয়, তাহা যখন মোহান্তগুরু বা সদ্‌গুরুতে তাঁর যে অধিষ্ঠান হয়, তার সঙ্গে মিলিয়া যায়,—চৈত্ত্য-

প্রকাশ ও মোহান্ত-প্রকাশ যখন একে অন্যের সমর্থক ও পরস্পরকে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন ভিতরকার আদর্শ ও ভাব সত্যোপেত ও বস্তুতন্ত্র হয়। বৈষ্ণব সাধনাতে ভিতর-বাহিরের এই অপূর্ব্ব সমাবেশ আছে বলিয়া, বৈষ্ণব কবিগণ একান্ত অন্তর্ম্মুখীন হইয়াও অন্যান্য অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কদাপি বস্তুতন্ত্রতা-ভ্রষ্ট হন নাই। রবীন্দ্রনাথের সাধনার সঙ্গে তুলনায় বৈষ্ণব কবিদিগের সাধনার ইহাই বিশেষত্ব। আর এই বস্তুতন্ত্র সাধন গুণেই তাঁহারা রবীন্দ্রনাথকে কোনো কোনো দিকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, নতুবা তাঁদের প্রতিভা ও রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাতে জাতিগত শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট ভেদে কোনো বিশেষ তারতম্য আছে কি না সন্দেহ।

রবীন্দ্রনাথের অন্তর্ম্মুখীনতা

যে ঐকান্তিকী অন্তর্ম্মুখীনতা ও রসানুভূতি রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করে, তাহাই আবার তাঁর দুর্ব্বলতারও মূল কারণ হইয়া আছে। একদিক দিয়া একান্ত অন্তর্ম্মুখীন প্রতিভা যেমন আপনার ভিতরকার ভাব গ্রহণ করিয়া থাকে ও তাহাতে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে, অন্যদিকে সেইরূপ সর্ব্বদা একান্তভাবে বাহিরের প্রেরণারও অধীন হইয়া রহে। একান্ত অন্তর্ম্মুখীন প্রতিভা সত্যের একদেশ মাত্র প্রত্যক্ষ করে। সত্য কেবল বাহির লইয়া নহে, কেবল ভিতর লইয়াও নহে। বাহির ও ভিতর, সত্যের এই দুই অঙ্গ। এই দুই অঙ্গে সত্য পূর্ণতা লাভ করে। বাহিরের সঙ্গে ভিতরের যে সম্বন্ধ তাহা আকস্মিক নহে, অঙ্গাঙ্গী। একটীকে ছাড়িয়া, অপরটীকে ধরা সম্ভব নহে। "যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে," এ কথা যেমন সত্য; যাহা পাই না ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা জাগে না ভাণ্ডে, এ কথাও তেমনি সত্য। ভাণ্ডকে ছাড়িয়া ব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার। ব্রহ্মাণ্ডকে ছাড়িয়া ভাণ্ড শূন্য, নিরাকার।

আর অন্ধকার ও নিরাকার উভয়ই জ্ঞানসীমার বহির্ভূত। দুইএর কোনোটাকেই জ্ঞানগোচর করা সম্ভব নহে। একান্ত অন্তর্মুখীন বুদ্ধি ও প্রতিভা কেবল ভাগেতেই, কেবল ভিতরকার অনুভূতির মধ্যেই, সত্যের প্রামাণ্য অন্বেষণ ও প্রতিষ্ঠা করিতে চায়; ব্রহ্মাণ্ডের বা বহির্বিষয়ের প্রামাণের প্রতি দৃক্‌পাত করে না। ইহার ফলে মতে ও সত্যে, কল্পনাতে ও বস্তুতে মূলতঃ কোনো প্রভেদ আর থাকে না। এ অবস্থায় পরিণামে কেবল ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই বস্তুর প্রামাণ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং একমাত্র অনুভূতিই সত্যের আসন অধিকার করিয়া বসে। সত্যের সার্ব্বজনীনতা রাখা তখন একান্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। যে তত্ত্বে এই সার্ব্বজনীনতা রক্ষা পায়, রবীন্দ্রনাথ এখনো সে তত্ত্বকে ভাল করিয়া ধরিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আর তাঁর অলৌকিক প্রতিভার ঐকান্তিকী অন্তর্ম্মুখীনতাই এ পথে সিদ্ধির অন্তরায় হইয়া আছে।

বাহ্যপ্রেরণার অধীনতা

কিন্তু মানুষ যতই কেন অন্তর্ম্মুখীন হউক না, কিছুতেই সহজে বাহিরের প্রেরণার হাত এড়াইতে পারে না। বৈদান্তিক সাধনে বাহিরের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারের সম্বন্ধ ছেদনের পন্থা ও প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু সে পথ সন্ন্যাসীর পক্ষে প্রশস্ত, গৃহীর সাধ্যায়ত্ত নহে। সে পথে চলিতে গেলে, যথাসম্ভব বিষয়ের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারের সম্পর্ক ছেদন করা আবশ্যক হয়। রবীন্দ্রনাথ সে পথের পথিক নন। "ভিক্ষাশনঞ্চ জীবিতম্"—তাঁর জীবনের ধর্ম্ম বা আদর্শ নহে। রবীন্দ্রনাথ গৃহী। রবীন্দ্রনাথ সংযমী, কিন্তু কখনো সন্ন্যাসী ছিলেন না। সুতরাং বাহিরের সম্পর্ক ও প্রেরণা হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন নাই। আর এই জন্য ক্ষণে ক্ষণে বহির্বিষয়ের

তাড়নায়, বাহিরের অভিনব অবস্থার বা অভিজ্ঞতার আঘাতে, এক একবার রবীন্দ্রনাথের মনগড়া জগৎ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায় ও তাঁহাকে আবার নূতন করিয়া জীবনের সমস্যাভেদে নিযুক্ত হইতে হয়।

পিতার চরিত্রের ও সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের প্রভাব

এই ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা রবীন্দ্রনাথের পৈত্রিক বস্তু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেও ইহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। আধুনিক যুগের ধর্ম্মসংস্কারকদিগের ইহা একরূপ সাধারণ ধর্ম্ম বলিলেও হয়। যে ব্যক্তিস্বাভিমান আমাদের দেশে ও অন্যত্র শাস্ত্রগুরুর প্রয়োজন ও প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া, আপনার ধর্ম্মের প্রামাণ্যকে একান্ত ভাবে প্রাকৃত বুদ্ধিবিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হয়, তাহা এই ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতার ফল। এই অন্তর্মুখীনতার আতিশয্য হইতে, ইংরেজীতে যাহাকে subjective individualism বলে, তাহার উৎপত্তি হয়। এই নিঃসঙ্গ স্বানুভূতির উপরে বহুদিন হইতে আমাদের ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে। যাঁরা শাস্ত্র-গুরু বর্জ্জন করিয়া ধর্ম্মসাধনে প্রয়াসী হইবেন, তাঁদের পক্ষে এই subjective individualism বা ব্যক্তিগত অনুভূতির হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব ও অসাধ্য। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক রাজর্ষি রামমোহন শাস্ত্র মানিতেন, গুরু-গ্রহণও করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার নিজের ধর্ম্মের প্রামাণ্য শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাকৃত জনে যে শাস্ত্র-প্রামাণ্যে বিশ্বাস করে, রামমোহন সে শাস্ত্র-প্রামাণ্য মানিতেন না, সত্য। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ঋষি-সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তেও এইরূপ অতিপ্রাকৃত শাস্ত্র-প্রামাণ্য গৃহীত হয় নাই। রামমোহন এই বিষয়ে প্রাচীন ঋষি-পন্থা অবলম্বন করিয়া, যোগবাশিষ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে, সুশাস্ত্র, সদ্‌গুরু ও স্বানুভূতি এই তিনের একবাক্যতার উপরে সত্যের

ও ধর্ম্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজার পরবর্ত্তী ব্রাহ্ম আচার্য্যগণ ঠিক এই পথ ধরিয়া চলেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র উভয়েই শাস্ত্রের প্রামাণ্য ও সদ্‌গুরুর প্রয়োজন অস্বীকার করিয়া, প্রথমে শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। আর শুদ্ধ স্বানুভূতির উপরে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করিলে, ব্যক্তিগত মতামতে ও সার্ব্বভৌমিক সত্যে, প্রবৃত্তির প্ররোচনাতে ও ধর্ম্মের প্রেরণাতে যে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়, মহর্ষি ও ব্রহ্মানন্দ উভয়েই ক্রমে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহারা উভয়েই পরে আপনাদের সম্প্রদায়কে নিঃসঙ্গ ও নিরঙ্কুশ স্বানুভূতির অরাজকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আপনারাই শাস্ত্রপ্রবর্ত্তক হইয়া পড়েন। মহর্ষি প্রথম বয়সে বেদের প্রামাণ্য অগ্রাহ্য করিয়া, শেষ জীবনে আপনার সঙ্কলিত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থকেই ব্রাহ্মসম্প্রদায় মধ্যে শাস্ত্রের আসনে বসাইয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ ভগবৎ প্রেরণাতেই সংকলিত হয়, ও এই গ্রন্থে সঙ্কলিত শ্রুতিসকলের যে ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাও যে তাঁর নিজের কল্পিত নয়, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরানুপ্রাণিত, মহর্ষি ইদানীং বহুবার এই কথা বলিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায়, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রও এক সময়ে প্রাচীন শাস্ত্র-সংহিতাকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার শিষ্যমণ্ডলীর স্বানুভূতির অনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্বে সমাজে অরাজকতার ও যথেচ্ছাচারের প্রতিষ্ঠার আশঙ্কা করিয়া, শেষে আপনিই "নবসংহিতা" প্রণয়ন করেন। কেশবচন্দ্রের নববিধানমণ্ডলী মধ্যে এই "নবসংহিতা" হিন্দুর মনুসংহিতার ন্যায় স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়া আছে। কিন্তু এ সকল চেষ্টা সত্ত্বেও ব্রাহ্মসম্প্রদায় মধ্যে নিঃসঙ্গ স্বানুভূতি বা subjective individualism এর প্রভাব এখনো অপ্রতিহত রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের পরিবার

রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিকী অন্তর্মুখীনতা এই নিঃসঙ্গ স্বানুভূতির বা subjective individualismএর রূপান্তর মাত্র। এ বস্তু তাঁর পৈতৃক ও সাম্প্রদায়িক। যে শিক্ষা ও সাধনাতে এই অন্তর্মুখীনতাকে বস্তুসংস্পর্শে সংযত ও শোধিত করিতে পারিত, রবীন্দ্রনাথ সে সুযোগ ও শিক্ষা প্রাপ্ত হ'ন নাই। কলিকাতার আধুনিক আভিজাত সমাজ একটা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাস করেন। শহরের সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে প্রমুক্ত মেশামেশির অবসর ও প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। সকলেই আপন আপন সংসার ও স্বার্থের সন্ধানেই ফেরে, একে অন্যের সঙ্গে আলাপ-আত্মীয়তা করিবার অবসর পায় না। যাঁদের অন্নচিন্তা নাই, সঞ্চিত ধন যাঁহাদিগকে দৈনন্দিন জীবিকা-উপার্জ্জনের শ্রম ও ব্যস্ততা হইতে মুক্তি দিয়াছে, তাঁহারাও কেবল আপনাদের সমশ্রেণীর ধনীজনের সঙ্গে আলাপ-আত্মীয়তা করেন, জনসাধারণের সঙ্গে কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা তাঁহাদেরও জন্মিতে পারে না। পল্লীসমাজে ধনী-নির্ধনের মধ্যে, বিজ্ঞ ও অজ্ঞের মধ্যে, লোকে যাহাদিগকে ভদ্র বলে ও যাদের ইতর বলে, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ হইয়া থাকে, এবং এই জন্য যেরূপ একটা মেশামেশি খোলাখুলি ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, বড় শহরে, বিশেষ আজিকালিকার দিনে, তাহার একান্ত অভাব হয়। এই মেশামেশির অভাবে কলিকাতার বড়লোকদের পক্ষে দেশের সাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কোনো যোগাযোগ স্থাপন করা একরূপ অসম্ভব ও অসাধ্য। ইহাদের জীবনের অন্তঃপুরে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার নাই; জনসাধারণের জীবনের অন্তঃপুরেও ইঁহাদের কোনো প্রবেশ পথ নাই। চারিদিকের দীনদরিদ্রেরা কিরূপে দিনপাত করে, তাহাদের সংসারের সমস্যা, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের আবেগ, জীবনের সংগ্রাম, কোন দিক

দিয়া, কি ভাবে যে উঠে পড়ে, প্রতিবেশী ধনীসম্প্রদায় তাহার কিছু জানিতে পারেন না। তাঁহারা আপনাদের প্রাসাদ হইতে গরীবের খোলার চালা ও মাটীর দেওয়াল মাত্র দেখেন। ঐ চালার নীচে, ঐ দেয়ালের মাঝখানে, ঐ ক্ষুদ্র, জঞ্জালময় কুটীর-প্রাঙ্গণে কত আশা, কত ভয়, কত অনুরাগ, কত বিরাগ, কত লোভ ও কত ত্যাগ যে দিনরাত্রি কি ছুটাছুটি করিতেছে, সেখানে জীবে ও শিবে কি যে মাখামাখি, কি যে লীলাখেলা, কি যে হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি লাগিয়া আছে, এ সকল দেখিবার অবসর ও বুঝিবার অধিকার তাঁহাদের হয় না। তাঁহাদের নিজেদের জ্ঞানের, ভাবের, ভোগের, বিলাসের, সখের ও সৌখীনতার জগৎটাই তাঁহাদের কাছে প্রত্যক্ষ ও সত্য এবং ইহার বাহিরে যে বিশাল সমাজ পড়িয়া আছে, সেটা তাঁহাদের অপ্রত্যক্ষ ও অজ্ঞাত।

রবীন্দ্রনাথ এই ধনী সমাজে জন্মিয়া, তাহারই মধ্যে বাড়িয়া উঠেন। তাহার উপরে মহর্ষি আপনার ধর্ম্মমতের জন্য সমাজচ্যুত হওয়াতে তাঁহার পরিবারবর্গের জীবন কলিকাতার সাধারণ ধনী সম্প্রদায়ের জীবন অপেক্ষাও সঙ্কীর্ণতর হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথের উদার প্রাণ এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আপনার স্বাভাবিক মুক্তভাব আস্বাদন করিবার জন্য, আশৈশব এক সুবিশাল কল্পিত জগৎ রচনা করিয়া, তাহার মধ্যে বিচরণ করিয়াছে। তাঁহার আপনার পরিবারের দুচারটী মানুষের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের প্রাণের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। এই গুটিকয়েক আধারেই রবীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎভাবে লোকচরিত্র অধ্যয়ন ও পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হন। স্নেহের, প্রেমের, ভক্তির এই গুটিকয়েক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের উপরে রবীন্দ্রনাথ আপনার বিচিত্র রসজগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এর বাহিরে তিনি যাহা গড়িতে গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক প্রভাবই প্রকাশিত হইয়াছে।

অলৌকিক কবিপ্রতিভার এ 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী' মায়িক প্রভাব সর্ব্বত্র থাকে। আর এইরূপ মায়িক সৃষ্টির একটা মোহিনী শক্তিও থাকে, যাহাতে মানুষকে এমন করিয়া মাতাইয়া তুলিতে পারে যে, সত্যিকার সুখদুঃখের সাক্ষাৎ সংস্পর্শ সর্ব্বদা সকলকে সেরূপভাবে মাতাইয়া তুলিতে পারে না। কল্পনার তুলিকায় দারিদ্র্যদুঃখ অঙ্কিত করিয়া, সেই চিত্র সহায়ে দারিদ্র্যের মধুটুকু আমরা আস্বাদন করিয়া থাকি, তার তীক্ষ্ণ হুলটা আমাদের গায়ে বিঁধে না। উৎকৃষ্টতম তৈল-চিত্র যেমন কতকটা দূরে দাঁড়াইয়াই দেখিতে হয়, একান্ত নিকটে গেলে, বর্ণের বন্ধুরতা চক্ষুগোচর হইয়া চিত্রের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া ফেলে, জন-চিত্র সম্বন্ধেও তাহাই সত্য। এ সংসারে ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সকলের মধ্যে ছায়াতপের ন্যায় ভালমন্দ মিশিয়া আছে। দূর হইতে ভালটুকু আমরা অনেক সময় দেখি, মন্দটুকু চক্ষে পড়ে না। এইজন্য দরিদ্র ধনীকে ঈর্ষা করেন, আর কখনো কখনো ধনীও যে আপনার বিষয়ের দুর্ভাবনার ও প্রতিদিনের জীবনের অসার কৃত্রিমতা দ্বারা একান্ত পীড়িত হইয়া, পর্ণকুটীরের সরল, সহজ জীবনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি প্রেরণ করেন না, এমনো নহে। কিন্তু কল্পনার দূরবীক্ষণ সহায়ে, দূরস্থিত পর্ণকুটীরের অনাবিল প্রেমলীলা প্রত্যক্ষ করাতে যে আনন্দ জাগিয়া উঠে, সেই পর্ণকুটীরের জীর্ণকন্থার কীটাণু-লীলা ও শীর্ণদেহ, দীর্ণপ্রাণ কুটীরবাসীদিগের কলহ কোলাহল প্রত্যক্ষ করিলে আর সে আনন্দটুকু থাকে না। বস্তু সংস্পর্শে এই কল্পিত জগৎ মায়াপুরীর ন্যায় শূন্যে মিলাইয়া যায়।

আমি এ কথা ভুলি নাই যে, তাঁর পৈত্রিক জমিদারী তত্ত্বাবধানের ভার কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া রবীন্দ্রনাথের উপরেই ন্যস্ত ছিল এবং এই উপলক্ষে তিনি বহুকাল শিলাইদহ ও অন্যান্য স্থানে থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে বাংলার পল্লীজীবন পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসর পাইয়াছিলেন। কিন্তু

এই বাহ্য যোগ নিবন্ধন যে সে জীবনের অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিলেন, একেবারে এ মীমাংসা করা যায় না। বড় বড় জমিদারীর "বাবুদের" সঙ্গে তাঁহাদের প্রজাসাধারণের কোনো প্রকারের ঘনিষ্ঠ ও প্রমুক্ত মেশামেশি কুত্রাপি সম্ভব হয় না। রবীন্দ্রনাথের উদার অন্তরে এইরূপ যোগাযোগ স্থাপনের বলবতী আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সাংসারিক ধনপদাদির অবস্থার আকস্মিক তারতম্যকে অগ্রাহ্য করিয়া, মানুষ বলিয়াই মানুষকে শ্রদ্ধা ও প্রীতিভরে প্রাণে টানিয়া লইবার জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে যে সময় সময় আকুল করিয়া তুলিয়াছে, ইহাও সত্য। সাংসারিক অবস্থার তারতম্য মানুষে মানুষে যে ব্যবধানের সৃষ্টি করে, আপনার আচারব্যবহারে ও সন্তানগণের শিক্ষাদীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ সে ব্যবধানটাকে ঘুচাইবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন, ইহাও জানি। কিন্তু এ সকল চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের প্রাণের উদারতাই প্রকাশিত হয়, সে সকল চেষ্টার সফলতা প্রমাণ হয় না। বড় ছোট উভয় পক্ষের সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতির উপরেই এ সকল চেষ্টার সফলতা নির্ভর করে। আর এ আত্মবিস্মৃতি লাভ কোনো পক্ষেরই সহজ নহে। এ আত্মবিস্মৃতি লাভ করিতে গেলে, ধনীকে ধনের মূল্যটা ভুলিতে হয়, জ্ঞানীকে জ্ঞানের প্রাধান্যটা ভুলিতে হয়, ললিতকলার উপাসককে ললিত লালিত্যের সুকুমার অনুভূতিটা ভুলিতে হয়, আর ধার্ম্মিককে অপরের ধর্ম্ম হইতে আপনার ধর্ম্মটা যে শ্রেষ্ঠ, এই ভাবটা পর্য্যন্ত একেবারে বিস্মৃত হইতে হয়। যেখানে সমাজের সাধারণ বিধিব্যবস্থা আপনা হইতে ধনী ও নির্ধনের, বিজ্ঞ ও অজ্ঞের, ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের মধ্যে কোনো প্রকারের আত্যন্তিক ব্যবধান প্রতিষ্ঠায় ব্যাঘাত না জন্মায়; যেখানে সামাজিক জীবনে ধনী দরিদ্রের সঙ্গে দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের মধ্যে নিঃসঙ্কোচে ও নিরভিমান সহকারে মেশামিশি করেন না; যেখানে বিজ্ঞেরা আপনাদের বিজ্ঞতার

উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে খৃষ্টীয় কথাপ্রসিদ্ধ সেণ্ট্ সাইমনের মত দিবানিশি বসিয়া রহেন, অন্যের ন্যায় অন্যের সঙ্গে প্রমুক্তভাবে মিশিবার প্রবৃত্তি ও অবসর লাভ করেন না; যেখানে ধার্ম্মিক একচক্ষে আপনার সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্ত ও সংস্কারাদির শ্রেষ্ঠতা ধ্যান করেন, আর অপর চক্ষে অন্য সম্প্রদায় সকলের সিদ্ধান্ত ও সংস্কারাদির হীনতা দেখিয়া সেগুলিকে উন্নত ও বিশুদ্ধ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন;—সেখানে এ ব্যবধান নষ্ট করা অসাধ্য যে তাহা নহে, চেষ্টামাত্রেই যে ব্যবধানকে নষ্ট করিতে যাওয়া হয়, তাহাকে আরো বাড়াইয়া তোলে। এই জন্য এই শতাধিক বৎসরের অশেষ চেষ্টাতেও মার্কিণ সমাজে শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গের সামাজিক ব্যবধানটা নষ্ট তো হয়ই নাই, বরং এই সাধুচেষ্টার ফলে শ্বেতকৃষ্ণে বাহিরের আইন কানুনের বৈষম্য যে পরিমাণে কমিতেছে, ভিতরকার মনের ব্যবধানটা যেন সেই পরিমাণে আরো বাড়িয়া যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথ কলিকাতার আধুনিক আভিজাত সমাজে জন্মিয়া তাহার অঙ্কে, তাহার দোষগুণের ভাগী হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছেন। এই সমাজে এই ব্যবধানটা চিরদিন আছে। কলিকাতার বড় বড় জমিদারদের জমিদারীতে এ ব্যবধানটা স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। সেখানে না আছে প্রজার কুলের আদর, না আছে তার বিদ্যার গৌরব, না আছে তার চরিত্রের মর্য্যাদা। মহর্ষির জমিদারীতেও এ সকলের কোন বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে বলিয়া শোনা যায় নাই। আর বহুকাল হইতে তাঁহাদের জমিদারীতে যে সকল জমিদারী আচার নিয়ম প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, তাহার কিম্বদন্তী পর্য্যন্ত যতদিন প্রজাবর্গের স্মৃতিতে জাগরূক থাকিবে, ততদিন তাহাদের পক্ষে আপনাদের প্রজাত্বের অগৌরব বিস্মৃত হইয়া, একান্ত প্রমুক্তভাবে জমিদার বাবুদের সঙ্গে মেশামেশি করা সম্ভব নয়। আর প্রজারা যতদিন না এ অকুণ্ঠা লাভ করিয়াছে, ততদিন কেবল জমিদারের উদারতায় পরস্পরের মধ্যকার পুরুষানুক্রমিক

ব্যবধানটা কিছুতে ঘুচিবারও নহে। আর এই ব্যবধান নষ্ট হয় নাই বলিয়া আপনার জমিদারীর পল্লীসমাজের মাঝখানে বহুদিন বাস করিয়াও, ঔদার্য্য সাধনের আন্তরিক আগ্রহ চেষ্টা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ সে সমাজের প্রাণের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করেন নাই। অতি নিকটে থাকিয়াও, বাংলার পল্লীজীবন ও বাঙ্গালীর সাচ্চা প্রাণটা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের মায়িক সৃষ্টি ও মায়াশক্তি

রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টি এইরূপ মায়িক। ঊর্ণনাভ যেমন আপনার ভিতর হইতে তন্তু বাহির করিয়া অদ্ভুত জাল বিস্তার করে, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ আপনার অন্তর হইতে অনেক সময় ভাবের ও রসের তন্তু সকল বাহির করিয়া, আপনার অদ্ভুত কাব্য সকল রচনা করিয়াছেন। তাঁর কাব্যে যেমন, তাঁর চিত্রিত লোকচরিত্রেও তেমন অনেক সময় এই বস্তুতন্ত্রতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনেক ক্ষুদ্র গল্প লিখিয়াছেন, দুচারখানি বৃহদাকারের উপন্যাসও রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁর চিত্রিত চরিত্রের প্রতিরূপ বাস্তব জীবনে কচ্চিৎ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কেবল রবীন্দ্রনাথ যেখানে আধুনিক ইঙ্গবঙ্গের বা তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের চরিত্র চিত্রিত করিতে গিয়াছেন, সেখানে তাঁর চিত্রগুলি অসাধারণ বস্তুতন্ত্রতা লাভ করিয়াছে। এ বিষয়ে "গোরা"র হারাণবাবুটী অপূর্ব্ব বস্তু হইয়াছে। কিন্তু এরূপ গুটিকতক চিত্র ব্যতীত রবীন্দ্রনাথের অনেক সৃষ্টি মায়িক। আর যেমন তাঁর কাব্যে ও গল্পে এই মায়ার প্রভাব বেশী, সেইরূপ তাঁর সমাজসংস্কারের প্রয়াস ও ধর্ম্মের শিক্ষাও বহুলপরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়াছে। তিনি একটা কল্পিত স্বদেশ রচনা করিয়া, তাহার উপরে একটা সত্য স্বদেশী সমাজ গড়িয়া তুলিতে গিয়াছিলেন। সে মায়ার

সৃষ্টি কিছুদিন পরে আপনাতে আপনি মিলাইয়া গিয়াছে। আশৈশব রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মের রচনায় ও উপদেশে এই মায়ার প্রভাব বিদ্যমান ছিল। তাঁর স্বাদেশিকতা কেবল শৈশবে নয়, আজি পর্য্যন্ত বহুল পরিমাণে বস্তুতন্ত্রতাহীন হইয়া আছে। আর আজ তিনি যে এক বিশাল বিশ্বমানব কল্পনা করিতেছেন—তাহারও প্রতিষ্ঠা তাঁহার অলৌকিক কবিপ্রতিভার অঘটনঘটনপটীয়সী মায়াশক্তিতে।

আর মায়ার মোহিনী শক্তিই আছে, তৃপ্তিদানের অধিকার নাই। এ সংসারে মায়াধীন জীব নিত্য পাই পাই পাই না; ধরি ধরি ধরিতে পারি না;—এরূপ অপূর্ণ চেষ্টা ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষায় চঞ্চল হইয়া রহে। রবীন্দ্রাথের অলৌকিক সৃষ্টিও পাঠকের প্রাণে এই নিত্য অতৃপ্ত ভাবের সঞ্চার করে। রবীন্দ্রনাথ একবার "ততঃ কিম্?" নামে একটী উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিজের লেখাতেও প্রায় সর্ব্বদা ঐ দুর্দ্দমনীয় প্রশ্নটা জাগিয়া রহে। রবীন্দ্রনাথের রচনা সর্ব্বদা বড় মিষ্টি লাগে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা অপূর্ণতা ও অতৃপ্তিবোধ জাগিয়া উঠে। ইহাও মায়ার ধর্ম্ম।

রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব ও ঋষিত্ব—ভাব ও অভাব

কিন্তু রবীন্দ্রের কবিপ্রতিভার অলৌকিক শক্তিকে মায়িক বলিলে তার কোনই গৌরবের হানি হয় না। কবিত্বের শক্তি সর্ব্বদাই মায়িক। অশরীরীকে শারীরধর্ম্মে বিভূষিত করা, অজ্ঞাত, অজ্ঞেয়কে নামরূপ দিয়া জ্ঞানাধিকারে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত করা, ইহাই কবি-প্রতিভার সাধারণ ধর্ম্ম। ইহাকেই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াধর্ম্ম বলে। কবি-প্রতিভা যে কদাপি এই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে না, তাহা নয়। সেখানে কবি শুধু কবি নহেন, কিন্তু সাধকও; সাধনা বলে কবি যেখানে আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সেই নিগূঢ় তত্ত্বের উপরে আপনার

কবিকল্পনাকে গড়িয়া তুলেন, সেখানে তাঁর প্রতিভা এই মায়াকে অতিক্রম করিয়া যায়। সেখানে কবি ঋষিত্ব লাভ করেন। রবীন্দ্রনাথের এই পরমপদ লাভের অনেক যোগাড়াই আছে, অভাব কেবল এক বস্তুর। যে বস্তুর অভাব পূরণ করিবার জন্য যিশু যোহনের সম্মুখীন হইয়া তাঁহার নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যাহার জন্য শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরপুরীর শরণাগত হন, যে সঙ্কারের অভাবে অধ্যাত্মজীবনের উপকরণ প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকিলেও তাহা কদাপি ফলপ্রসূ হয় না, রবীন্দ্রনাথের অভাব সে বস্তুর। এই সঙ্কারের অভাবে রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক কবি-প্রতিভা এখনো মায়াতীত সত্যলোক ও ব্রহ্মলোক অধিকার করিতে পারিতেছে না। কিন্তু আজ না হউক, এক দিন এ অভাব তাঁর পূর্ণ হইবেই হইবে।